আবৃত্তি মাধুকরী

আবৃত্তির জন্য কবিতা

আবৃত্তি মাধুকরী

(আবৃত্তির জন্য কবিতা)

দ্বিতীয় সংস্করণ

সংকলক

প্রণব সাহা

অনুভা প্রকাশনী

আগরতলা, ত্রিপুরা

আবৃত্তি মাধুকরী
ABRITTI MADHUKARI
(Poetry for Recitation)
a collection of bengali poems
প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ২০০৪
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ মার্চ, ২০০৮
গ্রন্থস্বত্ব ঃ দক্ষিণী
অক্ষর বিন্যাস ঃ প্রদীপা, ধলেশ্বর, আগরতলা
প্রচ্ছদ ঃ পুষ্পল দেব
অনুভা প্রকাশনীর পক্ষে প্রকাশ করেছেন বীণাপাণি সাহা , ধলেশ্বর ১১
মুদ্রণ ঃ ভবানী অফ্‌সেট, গুয়াহাটি
মূল্য ঃ ১৬০ টাকা

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু শ্রী আশিস মোদক

ও

প্রিয় কবি বিমলেন্দ্র চক্রবর্তীকে

কিছু কথা

আবৃত্তি এখন যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, পেয়েছে শিল্পের মর্যাদা। সাধারণ মানুষের কাছেও আবৃত্তি আজ সমাদৃত, জনপ্রিয়। অনেকে হয়তো কবিতা নাও পড়তে পারেন কিন্তু আবৃত্তি শুনতে যান। তাঁদের কথা মনে রেখে, আবৃত্তি শিল্পীগণ কলাকৌশল ও নিয়মনীতি মেনে আন্তরিক হয়ে উপস্থাপনা করে থাকেন, আর তখনই প্রয়োজন হয় আবৃত্তি-উপযোগী কবিতার। এই কথা মনে রেখেই 'আবৃত্তি মাধুকরী' কে পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ও যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি।
কবিদের আন্তরিক সহযোগিতা আর আশীর্বাদই আমার এই প্রয়াসের মূলধন। তাই কবিদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রথম প্রকাশে সাহায্য করেছিলেন কবি শীতলদাস জোয়ারদার, সন্দীপ দত্ত (কলকাতা), কবি মাধব বণিক ও কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়। তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

'আবৃত্তি মাধুকরী'র প্রথম প্রকাশক 'ভাষা' প্রকাশন-এর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। আমার এই কাজে আন্তরিকভাবে উৎসাহ ও সাহায্য সহযোগিতার জন্য আমার শিক্ষাগুরু শ্রী আশিস মোদক এবং প্রিয় কবি বিমলেন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

প্রণব সাহা

সূ ▮ চী ▮ প ▮ ত্র

জ্ঞান দাস

হতাশের আক্ষেপ

(আক্ষেপানুরাগ)

।। ধানশী ।।

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু[১]
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।।
সখি কি মোর করলে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু[২]
ভানুর কিরণ দেখি।।
উচল বলিয়া অচল চড়িতে[৩]
পড়িনু অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দ্রারিদ্র বেঢ়ল[৪]
মানিক হারনু হেলে।।
নগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম
মানিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মানিক লুকাল
অভাগীর করম-দোষে।।
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল।।

হরিবিনা
বিদ্যাপতি

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর[১] ।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।
ঝম্পি[২] ঘন গর — জন্তি সন্ততি[৩]
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া[৪]।
কান্ত পাহুন[৫] কাম দারুন
সঘনে খরশর হন্তিয়া[৬]।।
কুলিশ[৭] শত শত পাত-মোদিত[৮]
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী[৯] ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।।
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি[১০]
হরি বিনে দিন রাতিয়া।।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত
বঙ্গভূমির প্রতি

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ — আকাশ হতে, — নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায়রে জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে,

নাহি, মা, ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে নাগো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে!
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন; —
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে!
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে!

আত্ম-বিলাপ

১.

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন, —
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায়!

২.

রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবি রে কবে?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কত দিন রবে?
নীর-বিন্দু দূর্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলমলে?
কেন না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি?

৩.

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার?
জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁদিতে।
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে —
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু আশার

৪.

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাদে;
কি ফল লভিলি?
জ্বলন্ত পাবক-শিখা-লোভে তুই কাল ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি।
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়!
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে!

৫.

বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কন্টকগণে
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী।
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে।

৬.

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে?
সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে, —
মাৎসর্য্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ!
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায়?

৭.

মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু জলতলে
ফেলিস্, পামর!
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একটি মাত্র

গিরিনদী বালির মধ্যে
যাচ্ছে বেঁকে বেঁকে
একটি ধারে স্বচ্ছ ধারায়
শীর্ণ রেখা এঁকে।
মরু-পাহাড়-দেশে
শুষ্ক বনের শেষে
ফিরেছিলাম দুই প্রহরে
দগ্ধ চরণতল —
বনের মধ্যে পেয়েছিলেম
একটি আঙুর ফল।

রৌদ্র তখন মাথার 'পরে,
পায়ের তলায় মাটি
জলের তরে কেঁদে মরে
তৃষায় ফাটি ফাটি।
পাছে ক্ষুধার ভরে
তুলি মুখের 'পরে
আকুল ঘ্রাণে নিই নি তাহার
শীতল পরিমল।
রেখেছিলেম লুকিয়ে আমার
একটি আঙুর ফল।

বেলা যখন পড়ে এল,
রৌদ্র হল রাঙা,
নিশ্বাসিয়া উঠল হুহু
ধূ ধূ বালুর ডাঙা।
থাকতে দিনের আলো
ঘরে ফেরাই ভালো
তখন খুলে দেখনু চেয়ে
চক্ষে লয়ে জল
মুঠির মাঝে শুকিয়ে আছে
একটি আঙুর ফল।

কুয়ার ধারে

তোমার কাছে চাইনি কিছু,
জানাই নি মোর নাম,
তুমি যখন বিদায় নিলে
নীরব রহিলাম।
একলা ছিলেম কুয়ার ধারে
নিমের ছায়াতলে,
কলস নিয়ে সবাই তখন
পাড়ায় গেছে চলে।
আমায় তারা ডেকে গেল,
'আয় গো বেলা যায়।'
কোন্ আলসে রইনু বসে
কিসের ভাবনায়।।

পদধ্বনি শুনি নাইকো
কখন তুমি এলে।
কইলে কথা ক্লান্ত কণ্ঠে
করুণ চক্ষু মেলে
'তৃষাকাতর পান্থ আমি' —
শুনে চমকে উঠে
জলের ধারা দিলেম ঢেলে
তোমার করপুটে।
মর্মরিয়া কাঁপে পাতা,
কোকিল কোথা ডাকে,
বাবলা ফুলের গন্ধ ওঠে
পল্লীপথের বাঁকে।

যখন তুমি শুধালে নাম
পেলেম বড়ো লাজ —
তোমার মনে থাকার মতো
করেছি কোন কাজ!
তোমায় দিতে পেরেছিলেম
একটু তৃষার জল,
এই কথাটি আমার মনে

রহিল সম্বল।
কুয়ার ধারে দুপুরবেলা
তেমনি ডাকে পাখি,
তেমনি কাঁপে নিমের পাতা —
আমি বসেই থাকি।

বাঁশি

কিনু গোয়ালার গলি।
দোতলা বাড়ির
লোহার-গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই।
লোনা ধরা দেয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি,
মাঝে মাঝে স্যাঁতাপড়া দাগ।
মার্কিন থানের মার্কা একখানা ছবি
সিদ্ধিদাতা গণেশের
দরজার 'পরে আঁটা।
আমি ছাড়া ঘরে থাকে আরেকটা জীব
এক ভাড়াতেই,
সেটা টিকটিকি।
তফাত আমার সঙ্গে এই শুধু,
নেই তার অন্নের অভাব।।

বেতন পঁচিশ টাকা,
সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি।
খেতে পাই দত্তদের বাড়ি
ছেলেকে পড়িয়ে।
শেয়ালদা ইস্‌টিশনে যাই,
সন্ধেটা কাটিয়ে আসি,
আলো জ্বালাবার দায় বাঁচে।
এঞ্জিনের ধস্‌ ধস্‌,
বাঁশির আওয়াজ,
যাত্রীর ব্যস্ততা,

কুলি-হাঁকাহাকি।
সাড়ে-দশ বেজে যায়
তারপরে ঘরে এসে নিরালা নিঃঝুম অন্ধকার।।

ধলেশ্বরী নদীরতীরে পিসিদের গ্রাম—
তাঁর দেওরের মেয়ে,
অভাগার সাথে তার বিবাহের ছিল ঠিকঠাক।
লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমান পাওয়া গেল—
সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে।
মেয়েটা তো রক্ষে পেলে,
আমি তথৈবচ।
ঘরে তে এলো না সে তো, মনে তার নিত্য আসা যাওয়া—
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।।

বর্ষা ঘনঘোর।
ট্রামের খরচা বাড়ে,
মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায়।
গলিটার কোনে কোনে
জমে ওঠে পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁঠি, কাঠালের ভুতি,
মাছের কান্‌কা,
মরা বেড়ালের ছানা—
ছাইপাঁশ আরো কত কি যে।

ছাতার অবস্থাখানা জরিমানা-দেওয়া
মাইনের মতো,
বহু ছিদ্র তার।
আপিসের সাজ
গোপীকান্ত গোসাইয়ের মনটা যেমন,
সর্বদাই রসসিক্ত থাকে।
বাদলের কালে ছায়া
স্যাঁৎসেঁতে ঘরটাতে ঢুকে
কলে-পড়া জন্তুর মতন
মূর্ছায় অসাড়।

দিনরাত মনে হয় কোন্ আধমরা
জগতের সঙ্গে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছি।।

গলির মোড়েই থাকে কান্ত বাবু—
যত্নে-পাট-করা লম্বা চুল,
বড়ো বড়ো চোখ,
শৌখিন মেজাজ।
কর্নেট বাজানো তার শখ।

মাঝে মাঝে সুর জেগে ওঠে
এ গলির বীভৎস বাতাসে —
কখনো গভীর রাতে,
ভোরবেলা আধো-অন্ধকারে,
কখনো বৈকালে
ঝিকিমিকি আলোয়-ছায়ায়।
হঠাৎ সন্ধ্যায়
সিন্ধুবারোয়াঁয় লাগে তান,
সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদি কালের বিরহবেদনা।
তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে
এ গলিটা ঘোর মিছে
দুর্বিষহ মাতালের প্রলাপের মতো।
হঠাৎ খবর পাই মনে,
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।
বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।
এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলি লগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী,
তীরে তমালের ঘন ছায়া—
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা ক'রে, তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।।

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে

পাকুড় তলির মাঠে
বামুন-মারা দিঘির ঘাটে
আদিবিশ্ব-ঠাকুরমায়ের আসমনি এক চেলা
ঠিক দুক্ষুর বেলা
বেগ্‌নি-সোনা দিক্ আঙিনার কোনে
বসে বসে ভুঁইজোড়া এক চাটাই বোনে
হলদে রঙের শুকনো ঘাসে।
সেখান থেকে ঝাপসা স্মৃতির কানে আসে
ঘুম-লাগা রোদ্‌দুরে
ঝিম্‌ঝিমিনি সুরে
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে,
সুন্দরীকে বিয়ে দিলেম ডাকাত-দলের মেলে।'

সুদূর কালের দারুণ ছড়াটিকে
স্পষ্ট করে দেখি নে আজ, ছবিটা তার ফিকে।
মনের মধ্যে বেঁধে না তার ছুরি,
সময় তাহার ব্যথার মূল্য সব করেছে চুরি।
বিয়ের পথে ডাকাত এসে হরন করলে মেয়ে,
এই বারতা ধুলোয়-পড়া শুকনো পাতার চেয়ে
উত্তাপহীন, ঝেঁটিয়ে-ফেলা আর্বজনার মতো।
দুঃসহ দিন দুঃখেতে বিক্ষত,
এই কটা তার শব্দমাত্র দৈবে রইল বাকি
আগুন নেভা ছাইয়ের মতন ফাঁকি।
সেই মরা দিন কোন খবরের টানে
পরল এসে সজীব বর্তমানে।
তপ্ত হাওয়ার বাজপাখি আজ বারে বারে
ছোঁ মেরে যায় ছড়াটারে,
এলোমেলো ভাবনাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে
টুকরো করে ওড়ায় ধ্বনিটাকে।
জাগা মনের কোন্ কুয়াশা স্বপ্নেতে যায় ব্যেপে,
ধোঁওয়াটে এক কম্বলেতে ঘুমকে ধরে চেপে
রক্তে নাচে ছড়ার ছন্দে মিলে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।।'

জমিদারের বুড়ো হাতি হেলে দুলে চলছে বাঁশতলায়,
ঢঙঢঙিয়ে ঘন্টা দোলে গলায়।।

বিকেলবেলার চিকন আলোর আভাস লেগে
ঘোলা রঙের আলস ভেঙে উঠি জেগে।
হঠাৎ দেখি বুকে বাজে টন্‌টনানি
পাঁজরগুলোর তলায় তলায় ব্যাথা হানি।
চটকা ভাঙে যেন খোঁচা খেয়ে,
কই আমাদের পাড়ার কালো মেয়ে—
ঝুড়ি ভরে মুড়ি আনত, আনত পাকা জাম,
সামান্য তার দাম;
ঘরের গাছের আম আনত কাঁচামিঠা,
আনির স্থলে দিতেম তাকে চার-আনিটা।
ওই-যে অন্ধ কলু বুড়ির কান্না শুনি—
ক'দিন হলো জানি নে কোন গোঁয়ার খুনি
সমত্থ তার নাতনিটিকে
কেড়ে নিয়ে ভেগেছে কোন্ দিকে।
আজ সকালে শোনা গেল চৌকিদারের মুখে,
যৌবন তার দ'লে গেছে, জীবন গেছে চুকে।
বুক ফাটানো এমন খবর জড়ায়
সেই সেকালের সামান্য এক ছড়ায়।
শাস্ত্রমানা আস্তিকতা ধুলোতে যায় উড়ে—
'উপায় নাই রে নাই প্রতিকার' বাজে আকাশ জুড়ে।
অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ার ছন্দে মিলে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালেবিলে,

জমিদারের বুড়ো হাতি হেলে দুলে চলছে বাঁশতলায়,
ঢঙ্‌ঢঙিয়ে ঘন্টা দোলে গলায়।।

ভূল স্বর্গ

লোকটি নেহাত বেকার ছিল।

তার কোন কাজ ছিল না, কেবল শখ ছিল নানারকমের।

ছোটো ছোটো কাঠের চৌকোয় মাটি ঢেলে তার উপরে সে ছোটো ছোটো ঝিনুক সাজাত। দূর থেকে দেখে মনে হত — যেন একটা এলোমেলো ছবি, তার মধ্যে পাখির ঝাঁক; কিম্বা এবড়ো-খেবড়ো মাঠ, সেখানে গোরু চরছে; কিম্বা উঁচু নিচু পাহাড়, তার গা দিয়ে ওটা বুঝি ঝর্ণা হবে কিম্বা পায়ে চলা পথ।

বাড়ির লোকের কাছে তার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। মাঝে মাঝে পণ করতো পাগলামি ছেড়ে দেবে, কিন্তু পাগলামি তাকে ছাড়তো না।

২

কোনো কোনো ছেলে আছে, সারা বছর পড়ায় ফাঁকি দেয়, অথচ, পরিক্ষায় খামকা পাস করে ফেলে। এর সেই দশা হল।

সমস্ত জীবনটা অকাজে গেল, অথচ মৃত্যুর পরে খবর পেলে যে, তার স্বর্গে যাওয়া মঞ্জুর। কিন্তু নিয়তি স্বর্গের পথেও মানুষের সঙ্গ ছাড়ে না। দূতগুলো মার্কা ভূল করে তাকে কেজো লোকের স্বর্গে রেখে এল।

এই স্বর্গে আর সবই আছে, কেবল অবকাশ নেই।

এখানে পুরুষরা বলছে, হাঁফ ছাড়বার সময় কোথা?' মেয়েরা বলছে চললুম ভাই কাজ রয়েছে পড়ে।' সবাই বলে,'সময়ের মূল্য আছে।' কেউ বলে না 'সময় অমূল্য'। 'আর তো পারা যায় না' বলে সবাই আক্ষেপ করে, আর খুশি হয়। 'খেটে খেটে হয়রান হলুম' এই নালিশটাই সেখানকার সংগীত।

এ বেচারা কোথাও ফাঁক পায় না, কোথাও খাপ খায় না। রাস্তায় অন্যমনস্ক হয়ে চলে, তাতে ব্যস্ত লোকের পথ আটক করে। চাদরটি পেতে যেখানেই আরাম করে বসতে চায়, শুনতে পায়, সেখানেই ফসলের খেত, বীজ পোঁতা হয়ে গেছে। কেবলই উঠে যেতে হয়, সরে যেতে হয়।

৩

ভারি এক ব্যস্ত মেয়ে স্বর্গের উৎস থেকে রোজ জল নিতে আসে।

পথের উপর দিয়ে সে চলে যায় যেন সেতারের দ্রুত তালের গতের মতো।

তাড়াতাড়ি সে, এলো-খোঁপা বেঁধে নিয়েছে। তবু দু-চারটে দুরন্ত অলক, কপালের উপর ঝুকে প'ড়ে তার চোখের কালো তারা দেখবে বলে উঁকি মারছে।

স্বর্গীয় বেকার মানুষটি, একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, চঞ্চল ঝর্ণার ধারে তমাল গাছটির মতো স্থির। জনালা দিয়ে ভিক্ষুককে দেখে রাজকন্যার যেমন দয়া হয়, মেয়েটির তেমনি দয়া হল।

'আহা তোমার হাতে বুঝি কাজ নেই।'

নিশ্বাস ছেড়ে বেকার বললে, 'কাজ করব তার সময় নেই।'
মেয়েটি ওর কথা কিছুই বুঝতে পারলেনা। বললে, আমার হাত থেকে কিছু কাজ নিতে চাও?'
বেকার বললে, 'তোমার হাত থেকেই কাজ নেব বলে দাঁড়িয়ে আছি।'
'কী কাজ দেব?'
'তুমি যে ঘড়া কাঁখে করে জল তুলে নিয়ে যাও, তারই একটি যদি আমাকে দিতে পারো—'
'ঘড়া নিয়ে কি হবে জল তুলবে?'
'না আমি তার গায়ে চিত্র করব।'
মেয়েটি বিরক্ত হয়ে বলল, আমার সময় নেই, আমি চললুম।'
কিন্তু,বেকার লোকের সঙ্গে কাজের লোক পারবে কেন?
রোজ ওদের উৎস তলায় দেখা হয়, আর রোজ সেই একই কথা, 'তোমার কাঁখের একটি ঘড়া দাও, তাতে চিত্র করব।'
হার মানতে হল, ঘড়া দিলে।
সেইটিকে ঘিরে ঘিরে বেকার আঁকতে লাগল কত রঙের পাক, কত রেখার ঘেড়।
আঁকা শেষ হলে মেয়েটি ঘড়া তুলে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে। ভুরু বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'এর মানে?'
বেকার লোকটি বললে, 'এর কোনো মানে নেই।'
ঘড়া নিয়ে মেয়েটি বাড়ি গেল।
সবার চোখের আড়ালে বসে সেটিকে সে নানা আলোতে নানা রকমে হেলিয়ে ঘুলিয়ে দেখলে। রাত্রে থেকে-থেকে বিছানা ছেড়ে উঠে দীপ জ্বেলে চুপকরে বসে সেই চিত্রটা দেখতে লাগল। তার বয়সে এই সে প্রথম এমন-কিছু দেখছে যার কোনো মানে নেই।
তার পরদিন যখন সে উৎস তলায় এল তখন তার দুটি পায়ের ব্যস্ততায় একটু যেন বাধা পড়েছে। পা দুটি যেন চলতে চলতে আন্‌মনা হয়ে ভাবছে — যা ভাবছে তার কোনো মানে নেই।
সেদিনও বেকার মানুষ এক পাশে দাঁড়িয়ে।
মেয়েটি বললে, 'কী চাও?'
সে বললে, 'তোমার হাত থেকে আরো কাজ চাই।'
'কী কাজ দেব?'
'যদি রাজি হও, রঙিন সুতো বুনে বুনে তোমার বেণী বাঁধবার দড়ি তৈরি করে দেব।'
'কী হবে?'
'কিছুই হবে না।'
নানা রঙের নানা- কাজ করা দড়ি তৈরি হল। এখন থেকে আয়না হাতে নিয়ে বেণী বাঁধতে মেয়ের অনেক সময় লাগে। কাজ পড়ে থাকে, বেলা বয়ে যায়।
এদিকে দেখতে দেখতে কেজো স্বর্গে কাজের মধ্যে বড়ো বড়ো ফাঁক পড়তে লাগল। কান্নায় আর গানে সেই ফাঁক ভরে উঠল।
স্বর্গীয় প্রবীনেরা বড়ো চিন্তিত হল। সভা ডাকলে। তারা বললে, 'এখানকার ইতিহাসে কখনো

এমন ঘটে নি।'

স্বর্গের দূত এসে অপরাধ স্বীকার করলে। সে বললে,'আমি ভুল লোককে ভুল স্বর্গে এনেছি।'

ভুল লোকটিকে সভায় আনা হল। তার রঙিন পাগড়ি আর কোমরবন্ধের বাহার দেখেই সবাই বুঝলে, বিষম ভুল হয়েছে।

সভাপতি তাকে বললে, 'তোমাকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে।'

সে তার রঙের ঝুলি আর তুলি কোমরে বেঁধে হাঁফ ছেড়ে বললে, 'তবে চললুম।'

মেয়েটি এসে বললে, ' আমিও যাব।'

প্রবীণ সভাপতি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এই সে প্রথম দেখলে এমন একটা কাণ্ড যার কোনো মানে নেই।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নন্দলাল

নন্দলাল তো একদা একটা করিলো ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে, যা করেই হোক্, রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল, ' আ-হা-হা করো কি, করো কি, নন্দলাল?'
নন্দ বলিল, 'বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল?
আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ?'
তখন সকলে বলিল— 'বাহবা বাহবা বহবা বেশ।'

নন্দর ভাই কলেরায় মরে, দেখিবে তাহারে কেবা।
সকলে বলিল, 'যাও না নন্দ, করো না ভাইয়ের সেবা।'
নন্দ বলিল, 'ভাইয়ের জন্য জীবনটা যদি দিই—
না হয় - দিলাম— কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারিদিক।'
তখন সকলে বলিল— 'হাঁ হাঁ হাঁ তা বটে, তা বটে, ঠিক।'

নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির,
গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির।
পড়িলো ধন্য দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন,
লেখে যতো তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশগুণ।
খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা সন্দেশ থাল থাল,
তখন সকলে বলিল— 'বাহবা বাহবা নন্দলাল।'

নন্দ একটা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি;
সাহেব আসিয়া গলাটি তাহার টিপিয়া ধরিল খালি;
নন্দ বলিল, 'আ-হা-হা! করো কি, করো কি, ছাড়ো না ছাই,
কি হবে দেশের, গলা টিপুনিতে আমি যদি মারা যাই?
বলো ক' বিঘৎ নাকে দিব খৎ, যা বলো করিব তাহা'
তখন সকলে বলিল— 'বাহবা বাহবা বাহবা বাহা।'

নন্দ বাড়ির হতো না বাহির, কোথা কি ঘটে কি জানি;
চড়িতো না গাড়ি, কি জানি কখন উল্টায় গাড়িখানি,
নৌকা ফি-সন ডুবিছে ভীষণ রেলে 'কলিশন' হয়,
হাটিতে সর্প, কুক্কুট আর গাড়ি চাপা-পড়া ভয়,
তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল।
সকলে বলিল— ভ্যালা রে নন্দ বেঁচে থাক চিরকাল।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

মাধবিকা

দখিন হাওয়া — রঙিন হাওয়া, নূতন রঙের ভান্ডারী,
জীবন-রসের রসিক বঁধু, যৌবনেরি কান্ডারী!
সিন্ধু থেকে সদ্য বুঝি আসছ আজি স্নান করি'—
গাং-চিলেদের পক্ষধ্বনির শন্‌শনানির গান ধরি';
মৌমাছিদের মন ভুলানি গুনগনানির সুর ধরে'—
চললে কোথায় মুগ্ধ পথিক, পথটি বেয়ে উত্তরে?

লক্ষ ফুলের গন্ধ মাখি' বক্ষ আঁকি চন্দনে,
যাচ্ছ ছুটে' কোন প্রিয়ারে বাঁধতে ভুজবন্ধনে?
অনেক দিনের পরে দেখা, বছর-পারের সঙ্গী গো,
হোক না হাজার ছাড়াছাড়ি, রেখেছ সেই ভঙ্গি তো।
— তেম্‌নি সরস ঠান্ডা পরশ, তেমনি গলার হাঁকটি সেই,
দেখতে পেলেই চিনতে পারি, কোনখানেই ফাঁকটি নেই!

— কোথায় ছিলে বন্ধু আমার, কোন্ মলয়ের বন ঘিরে',
নারিকেলের কুঞ্জ - বেড়া কোন সাগরের কোন তীরে!
লক্লকে সেই বেতসবীথির বলো তো ভাই কোন্ গলি,
এলা - লতার কেয়াপাতার খবর তো সব মঙ্গলই?

— ভালো কথা, দেখলে পথে, সবাই তোমায় বন্দে তো,—
বন্ধু বলে' চিনতে কারো হয়নি তো ভাই সন্দেহ?
নরনারী তোমার মোহে তেম্নি তো সব ভুল করে—
তেম্নিতর পরস্পরের মনের বনে ফুল ধরে!
আসতে যেতে দীঘির পথে তেম্নি নারীর ছল করা;
পথিকবধূর চোখের কোনে তেম্নি তো সেই জলভরা?
যুবতীরা ডাগর আঁখির কাজল - লেখা মন্তরে
আজও তো সেই আগের মতন প্রিয়জনের মন হরে?
পলাশ ফুলে হঠাৎ দেখে' নক্ষত্রের চিহ্ন কার,
ঈষৎ হেসে কণ্ঠে বাঁধে পূর্বরাতের ছিন্নহার!
রঙ্গনে সেই রং তো আছে, অশোকে তাই ফুটছে তো,
শাখায় তারি দুলতে দোলায় তরুনী দল জুটছে তো?
তোমায় দেখে' তেম্নি ডেকে উঠছে তো সব বিহঙ্গ,
সবুজ ঘাসের শীষটি বেয়ে রয় তো চেয়ে পতঙ্গ?
— তেম্নি — সবই তেম্নি আছে! — হ'লাম শুনে খুব খুশী,
প্রাণটা উঠে চন্‌চনিয়ে মনটা ওঠে উসখুসি'!
নূতন রসে রস্‌ল হৃদয়, রক্ত চলে চঞ্চলি,'—
বন্ধু তোমায় অর্ঘ্য দিলাম উচ্ছ্বসিত অঞ্জলি।
গ্রহন করো, গ্রহণ করো— বন্ধু তোমার দন্ডেকের —
জানি নাক আবার কবে দেখা তোমার সঙ্গে ফের।।

কাজলা দিদি

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই—
মাগো, আমার শোলোক-বলা কাজ্‌লা-দিদি কই?
পুকুর পাড়ে নেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে,—
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে' রই;
মাগো, আমার কোলের কাছে কাজ্‌লা-দিদি কই?
সেদিন হ'তে দিদিকে আর কেনই বা না ডাকো,
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো?
খাবার খেতে আমি যখন দিদি বলে' ডাকি তখন
ও- ঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসে নাকো,
আমি ডাকি,— তুমি কেন চুপটি করে' থাকো?

বল্ মা দিদি কোথায় গেছে, আসবে আবার কবে?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল-বিয়ে হবে!
দিদির মত ফাঁকি দিয়ে আমিও যদি লুকোই গিয়ে—
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে' র'বে?
আমিও নাই দিদিও নাই — কেমন মজা হবে!

ভুঁইচাঁপাতে ভরে' গেছে শিউলি গাছের তল
মাড়াস নে মা পুকুর থেকে আনতে গিয়ে জল;
ডালিম গাছের ডালের ফাঁকে বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে,
দিস না তারে উড়িয়ে মাগো, ছিড়তে গিয়ে ফল;
দিদি এসে শুনবে যখন, বলবি কি মা বল্!

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদে উঠেছে ওই—
এমন সময়, মাগো, আমার কাজ্‌লা - দিদি কই?
বেড়ার ধারে, পুকুর পাড়ে ঝিঁঝি ডাকে ঝোপে-ঝাড়ে;
নেবুর গন্ধে ঘুম আসে না—তাইতো জেগে' রই;—
রাত হ'ল যে ,মাগো, আমার কাজ্‌লা-দিদি কই?

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কোন্ দেশে

কোন্ দেশেতে তরুলতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চলতে গেলেই—
দ'লতে হয় রে দুর্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল,—
সোনোর কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !
কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা—
ফিঙ্গে গাছে গাছে নাচে?
কোথায় জলে মরাল চলে—
মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বোনে—
চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে ?
কোন্ ভাষা মরমে পশি'—
আকুল করি' তোলে প্রান ?
কোথায় গেলে শুনতে পা'ব—
বাউল সুরে মধুর গান ?
চন্ডীদাসের — রামপ্রসাদের
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !
কোন্ দেশের দুর্দশায় মোরা—
সবার অধিক পাইরে দুখ ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়—
বেড়ে উঠে মোদের বুক ?
মোদের পিতৃপিতামহের—
চরণ-ধূলি কোথা রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ
আমাদেরই বাংলা রে !

দূরের পাল্লা

ছিপ্ খান তিন - দাঁড়—
তিনজন মাল্লা
চৌপর দিন্-ভোর
দ্যায় দুর- পাল্লা।

পাড়ময় ঝোপঝাড়
জঙ্গল,— জঞ্জাল,
জলময় শৈবাল
পান্নার টাঁকশাল।

কঞ্চির তীর-ঘর
ঐ চর জাগ্ছে,
বন-হাঁস ডিম তার
শ্যাওলায় ঢাক্ছে।

চুপ চুপ — ওই ডুব
দ্যায় পান্কৌটি,
দ্যায় ডুব টুপ টুপ
ঘোম্টার বউটি।

ঝক্ ঝক্ কলসীর
বক্ বক্ শোন্ গো,
ঘোমটায় ফাঁক বয়
মন উন্মন্ গো।

তিন দাঁড় ছিপখান্
মন্থর যাচ্ছে,
তিন জন মাল্লায়
কোন্ গান গাচ্ছে?

রূপশালি ধান বুঝি
এই দেশে সৃষ্টি
ধূপছায়া যার শাড়ি
তার হাসি মিষ্টি।

মুখ কানি মিষ্টি রে
চোখ দুটি ভোম্‌রা
ভাব-কদমের — ভরা
রূপ দেখ তোমরা।

ময়নামতীর জুটি
ওর নামই টগরী,
ওর পায়ে ঢেউ ভেঙে
জল হ'ল গোখ্‌রী।

ডাক - পাখী ওর লাগি'
ডাক্ ডেকে হদ্দ,
ওর তরে সোঁত- জলে
ফুল ফোটে পদ্ম।

ওর তরে মন্থরে
নদ হেথা চলছে,
জলপিপি ওর মৃদু
বোল বুঝি বোল্‌ছে।

দুই তীরে গ্রামগুলি
ওর জয়ই গাইছে
গঞ্জে যে নৌকো সে
ওর মুখই চাইছে।

আট্‌কেছে যেই ডিঙা
চাইছে সে পর্শ
সংকটে শক্তি ও
সংসারে হর্ষ।

পান বিনে ঠোঁট রাঙা
চোখ কালো ভোম্‌রা
রূপশালি-ধান-ভানা
রূপ দ্যাখো তোমরা

পান সুপারি! পান সুপারি
এইখানেতে শঙ্কা ভারি
পাঁচ পিরেরই শির্ণি মেনে
চল্‌রে টেনে বৈঠা হেনে
বাঁক সমুখে, সামনে ঝুঁকে

বাঁয় বাঁচিয়ে ডাইনে রুখে
বুক দে টানো বৈঠা হানো—
সাত সতেরো কোপ কোপানো।
হাড় — বেরুনো খেজুর গুলো
ডাইনী যেন ঝামর - চুলো
নাচ্‌তেছে ছিলো সন্ধ্যাগমে
লোক দেখে কি থম্‌কে গেলো
জম্‌জমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে
রাত্রি এলো, রাত্রি এলো।
ঝাপ্‌সা আলোয় চরের ভিতে
ফির্‌ছে কারা মাছের পাছে,
পীর বদরের কুদ্‌রতিতে
নৌকা বাঁধা হিজল গাছে।

আর জোর দেড় ক্রোশ
জোর দের ঘন্টা,
টান ভাই টান সব
নেই উৎকণ্ঠা।

চাপ্ চাপ্ শ্যাওলার
দ্বীপ সব সার সার,—
বৈঠার ঘায় সেই
দ্বীপ সব নড়ছে
ভিলভিলে হাঁস তায়
জল-গায় চড়ছে।

ওই মেঘ জম্‌ছে
চল্ ভাই সম্‌ঝে
গাও গান দাও শিস্,
বক্‌শিস বক্‌শিস!

খুব জোর ডুব্-জল,
বয় স্রোত্ ঝির ঝির,
নেই ঢেউ কল্লোল,
নয় দুর নয় তীর।

নেই নেই শঙ্কা,
চল্ সব ফুর্তি,—
বকশিস টংকা,
বকশিস ফূর্তি ।

ঘোর ঘোর সন্ধ্যায়,
ঝাউ গাছ দুল্‌ছে,
ঢোল্ কলমীর ফুল
তন্দ্রায় ঢুল্‌ছে।

লক্‌লক্ শর-বন
বক্ তায় মগ্ন,
চুপ্‌চাপ্ চারদিক্ —
সন্ধ্যার লগ্ন।

চারদিক্ নিঃসাড়্,
ঘোর ঘোর রাত্রি,
ছিপ্ খান তিন দাঁড়্,
চারজন যাত্রী।

জড়ায় ঝাঁঝি দাঁড়ের মুখে,
ঝাউয়ের বীথি হাওয়ায় ঝুঁকে
ঝিমায় বুঝি ঝিঁঝির গানে —
স্বপন পানে পরাণ টানে।
তারায় ভরা আকাশ ওকি
ভুলোয় পেয়ে ধূলোর' পরে
লুটিয়ে প'লো আচম্বিতে
কুহক - মোহ - মন্ত্র - ভরে।

কেবল তারা! কেবল তারা!
শেষের শিরে মানিক পারা,
হিসাব নাহি সংখ্যা নাহি
কেবল তারা যেথায় চাহি।

কোথায় এল নৌকোখানা
তারার ঝড়ে হই রে কানা
পথ ভুলে কি এই তিমিরে
নৌকো চলে আকাশ চিরে।

জ্বলছে তারা, নিব্‌ছে তারা—
মন্দাকিনীর মন্দ সোঁতায়,
যাচ্ছে ভেসে যাচ্ছে কোথায়
জোনাক যেন পন্থা - হারা।

তারায় আজি ঝামর হাওয়া—
ঝামর আজি আঁধার রাতি,
অগুন্‌তি অফুরান্‌ তারা
জ্বালায় যেন জোনাক্‌ - বাতি।

কালো নদীর দুই কিনারে
কল্পতরুর কুঞ্জ কি রে?—
ফুল ফুটেছে ভারে ভারে—
ফুল ফুটেছে মানিক হীরে।

বিনা হাওয়ায় ঝিল্‌মিলিয়ে
পাপ্‌ড়ি মেলে মানিক - মালা;
বিনি নাড়ায় ফুল ঝরিছে
ফুল পড়িছে জোনাক - জ্বালা।

চোখে কেমন লাগ্‌ছে ধাঁধা—
লাগ্‌ছে যেন কেমন পারা,
তারাগুলোই জোনাক হ'ল
কিম্বা জোনাক হ'ল তারা।

নিথর জলে নিজের ছায়া
দেখ্‌ছে আকাশ-ভরা তারায়
ছায়া-জোনাক আলিঙ্গিতে
জলে জোনাক দিশে হারায়।

দিশে হারায়, যায় ভেসে যায়
স্রোতের টানে কোন্ দেশে রে?—
মরা গাঙ আর সুর-সরিৎ
এক হয়ে যেথায় মেশেরে!

কোথায় তারা ফুরিয়েছে, আর
জোনাক কোথা হয় শুরু যে
নেই কিছুরই ঠিক ঠিকানা
চোখ যে আলা, রতন উঁছে।

আলেয়াগুলো দপ্দপিয়ে
জ্বলছে নিবে, নিব্ছে জ্বলে'
উল্কোমুখী জিব মেলিয়ে
চাট্ছে বাতাস আকাশ-কোলে!

আলেয়া-হেন ডাক-পেয়াদা
আলেয়া হতে ধায় জেয়াদা,
একলা ছোটে বন-বাদাড়ে
ল্যাম্পো - হাতে লক্ড়ি - ঘাড়ে;

সাপ মানে না, বাঘ জানে না,
ভূতগুলো তার সবাই চেনা,
ছুট্ছে চিঠি পত্র নিয়ে
রন্রনিয়ে হন্হনিয়ে।

বাঁশের ঝোপে জাগ্ছে সাড়া
কোল্- কুঁজো বাঁশ হচ্ছে খাড়া,
জাগ্ছে হাওয়া জলের ধারে,
চাঁদ উঠেনি আজ আঁধারে।

শুক্তারাটি আজ নিশীথে
দিচ্ছে আলো পিচ্কিরিতে,
রাস্তা এঁকে সেই আলোতে
ছিপ্ চলেছে নিঝুম স্রোতে।

ফিরছে হাওয়া গায় ফুঁ-দেওয়া,
মাল্লা মাঝি পড়ছে থ'কে;
রাঙা আলোর লোভ দেখিয়ে
ধরছে কারা মাছগুলোকে ।

চলছে তরী, চলছে তরী—
আর কত পথ? আর ক'ঘড়ি?
এই যে ভিড়াই, ওই যে বাড়ি,
ওই যে অন্ধকারের ঝাঁড়ি —

ওই বাঁধা বট ওর পেছনে
দেখ্‌ছে আলো? ঐ তো কুঠি
ঐখানেতে পৌঁছে দিলেই
রাতের মতন আজকে ছুটি।

ঝপ্ ঝপ্ তিনখান
দাঁড় জোড় চল্‌ছে,
তিনজন মাল্লার
হাত সব জ্বল্‌ছে

গুর্ গুর্ মেঘ সব
গায় মেঘ-মল্লার
দুর-পাল্লার শেষ
হাল্লাক্ মল্লার।

ঝর্ণা

ঝর্ণা ! ঝর্ণা! সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা ! চন্দন-বর্ণা!
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে,
গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনু ভরি' যৌবন, তাপসী অপর্ণা!
ঝর্ণা!
পাষাণের স্নেহধারা! তুষারের বিন্দু!
ডাকে তোরে চিত-লোল উতরোল সিন্ধু।

মেঘ হানে যুঁইফুলী বৃষ্টি ও অঙ্গে,
চুমা-চুম্‌কীর হারে চাঁদ ঘেরে রঙ্গে,
ধূলা-ভরা দ্যায় ধরা তোর লাগি ধর্ণা।
ঝর্ণা।
এস তৃষ্ণার দেশে এস কলহাস্যে —
গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্যে,
ধূসরের উষরের কর তুমি অন্ত,
শ্যামলিমা ও-পরশে কর গো শ্রীমন্ত;
ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসায় ভর্ণা;
ঝর্ণা!
শৈলের পৈঠায় এস তনুগাত্রী!
পাহাড়ের বুক-চেরা এস প্রেমদাত্রী!
পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো,
হরিচরণ-চ্যুতা গঙ্গার প্রায় গো,
স্বর্গের সুধা আনো মর্ত্যে সুপর্ণা!
ঝর্ণা
মঞ্জুল ও হাসির বেলোয়ারি আওয়াজে
ওলো চঞ্চলা! তোর পথ চলা ছাওয়া যে!
মোতিয়া মতির কুঁড়ি মূরছে ও অলকে;
মেখলায়, মরি মরি, রামধনু ঝলকে
তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা
ঝর্ণা!

ঝর্ণার গান

চপল পায় কেবল ধাই,
কেবল গাই পরীর গান,
পুলক মোর সকল গায়,
বিভোল মোর সকল প্রাণ!
শিথিল সব শিলার পর
চরণ থুই দোদুল মন,
দুপুর-ভোর ঝিঁঝির ডাক,

ঝিমায় পথ, ঘুমায় বন।
বিজন দেশ, কূজন নাই,
নিজের পায় বাজাই তাল,
একলা গাই, একলা ধাই,
দিবস রাত, সাঁঝ সকাল।
ঝুঁকিয়ে ঘাড় ঝুম-পাহাড়
ভয় দ্যাখায়, চোক পাকায়;
শঙ্কা নাই, সমান যাই,
টগর-ফুল-নূপুর পায়।

ঘাঘ্‌রা মোর শ্বেত চামর
জরির থান ওড়না গায়,
অলঙ্কার মানিক-হার,
মুক্তকেশ, — মুক্তা তায়।
তুহিন-লীন কোন্ মুনির
ছিলাম কোন্ স্বপ্নেতে!
জন্ম মোর কোন্ চোখের —
কটাক্ষের সঙ্কেতে!
কোন গিরির হিম ললাট
ঘামল মোর উদ্ভবে,
কোন্ পরীর টুটল হার
কোন্ নাচের উৎসবে!
খেয়াল নাই — নাই রে ভাই
পাইনি তার সংবাদই,
ধাই লীলায়, — খিলখিলাই —
বুলবুলির বোল্ সাধি।

বন-ঝাউয়ের ঝোপ্‌গুলোয়
কাল্‌সারের দল চরে,
শিং শিলায় — শিলার গায়,
ডালচিনির রং ধরে।
ঝাঁপিয়ে যাই, লাফিয়ে ধাই,
দুলিয়ে যাই অচল-ঠাট;
নাড়িয়ে যাই, বাড়িয়ে যাই —
টিলা গায় ডালিম-ফাট।

শালিক শুক বুলায় মুখ
থল্-ঝাঁঝির মখ্ মলে,
জরির জাল আঙ্‌রাখায়
অঙ্গে মোর ঝলমলে।
নিম্নে ধাই, শুনতে পাই
'ফটিক জল' হাঁকছে কে,
কণ্ঠাতে তৃষ্ণা যার
নিক না সেই পাঁক ছেঁকে।

গরজ যার জল স্যাঁচার
পাতকুয়ায় যাক না সেই,
সুন্দরের তৃষ্ণা যার
আমরা ধাই তার আশেই।

তার খোঁজেই বিরাম নেই
বিলাই তান — তরল শ্লোক,
চকোর চায় চন্দ্রমায়,
আমরা চাই মুগ্ধ-চোখ।

চপল পায় কেবল ধাই
উপল-ঘায় দিই ঝিলিক,
দুল দোলাই মন ভোলাই,
ঝিলমিলাই দিগ্বিদিক্!

কুমুদ রঞ্জন মল্লিক
ছুটি

পূজোর ছুটির বন্ধরে ভাই
পেলাম ছুটি আমরা আজি।
দেই গে বকম বকম ছেড়ে
নীল আকাশে নোটনবাজী।
আজকে দুদিন উনঘুনানি মৌমাছিদের গুনগুণানি
এবার দুরের পাল্লারে ভাই,

খোয়ার ঘাট আজ ছাড়াবে মাঝি।।
ঝাঁক বেঁধে আজ মরাল শিশু
ছুটবে তাদের ঘরের টানে।
বন্ধনহীন উড়বে উধাও,
দৃষ্টি মানস সরের-পানে।।
আয়রে হরিন দল বেঁধে ভাই
কেবল ছুটি, কেবল লাফাই,
বাঁধন যদি পড়বে গলায়
আনন্দেতে পরতে রাজি।
রাণীর সোনার ভাঙ্গলো শিবির
নেইক মোটে নেই পিছু টান,
নবীন মীন্ আজ নূতন ঢলে
উল্লাসেতে ছুটবে উজান।
বিশ্ব-বাধায় আর কি ভোলে,
ছুটছে চকোর নভের কোলে—
সুধা না পাই তায় ক্ষতি নাই
সোহাগ পেলেই আমরা বাঁচি।

মোহিত লাল মজুমদার
মিলনোৎকণ্ঠা

বধূরে আমার দেখিনি এখনো, শুনেছি তার,
অপরূপ রূপ, চোখের চাহনি চমৎকার!
কাজলের রেখা আঁখিপাতে,
'কাজল-লতা'টি ধ'রে আছে হাতে
করমূলে বাঁধা লাল সুতা সেই— অলংকার!
শুনেছি সে রূপ চমৎকার?

পরেছে বসন— বুঝি লাল চেলি, ডালিম ফুলী?
দুরু দুরু হিয়া — মনিহার তায় উঠিছে দুলি'।
এয়োরা যখন শঙ্খ বাজায়
বধু চমকিয়া ইতি উতি চায়,

আকুল কবরী, রুখু ভুখু-চুল পড়িছে খুলি'
হিয়া দুরু দুরু উঠিছে দুলি'।

কত দিবানিশি কাটানু স্বপনে — সেই সে মুখ
দেখিনি কখনো, তবু সে আমার ভরেছে বুক।
প্রানের বিজনে ঝরিয়াছে ফুল—
সকালে শেফালি, বিকালে বকুল,
ফুটিয়াছে নীপ — বরষা- আসারে ভরসা-সুখ,
সে - মুখ আমার ভরেছে বুক।

এতদিনে বুঝি বিরহ যামিনী হয়েছে ভোর—
বাঁশি বাজে ওই — এবার নয়নে লেগেছে ঘোর!
হাতে হাতে সেই বাঁধি' মালাখানি
আর কতখনে পরশিব পাণি?
এসেছে কি আজি সে সুখলগন জীবনে মোর—
স্বপন-রজনী হয়েছে ভোর?

পাতি ফুল শেজ বসিব দুজনে কথা না বলি
চিবুক ধরিয়া তুলিব আনত কুসুম কলি!
সে রূপ নেহারি' আঁখি অনিমেষ
প্রদীপ জ্বালায়ে হবে রাতি শেষ!
ভুলে যাব গান, ফুলের মধুও ভুলিবে অলি—
শুধু চেয়ে রঁবো কথা না বলি'।

বধূরে আমার দেখিনি এখনো, শুনেছি তার
অপরূপ রূপ — চোখের চাহনি চমৎকার!
আর কত দেরি গোধূলি লগন?
নিবিয়া আসিবে সারাটি গগন,
শুধু সেই চেলি উজলি তুলিবে অন্ধকার—
সেই আঁখি তারা চমৎকার!

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

হাট

দূরে দূরে গ্রাম দশবারো খানি,
মাঝে একখানি হাট,
সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ
প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট।
বেচা-কেনা সেরে বিকাল বেলায়
যে যাহার সবে ঘরে ফিরে যায়,
বকের পাখায় আলোক লুকায়
ছাড়িয়া পূবের মাঠ,
দূরে দূরে গ্রামে জ্ব'লে ওঠে দীপ
আঁধারেতে থাকে হাট
নিশা নামে দূরে শ্রেনীহারা একা
ক্লান্ত কাকের পাখে
নদীর বাতাস ছাড়ে নিশ্বাস
পার্শ্বে পাকুড় শাখে।
হাটের দোচালা মুদিল নয়ান,
কারো তরে তার নাই আহ্বান
বাজে বায়ু আসি' বিদ্রুপ-বাঁশী
জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে,
নির্জন হাটে রাত্রি নামিল
একক কাকের ডাকে।
দিবসেতে সেথা কত কোলাহল
চেনা-অচেনার ভিড়ে,
কত না ছিন্ন চরণ চিহ্ন
ছড়ানো সে ঠাঁই ঘিরে।
মাল চেনা চিনি, দর জানাজানি
কানা কড়ি নিয়ে কত টানাটানি
হানাহানি করে কেউ নিল ভরে
কেউ গেল খালি ফিরে।
দিবসে থাকে না কথার অন্ত
চেনা অচেনার ভিড়ে।
কত কে আসিল, কত বা আসিছে,
কত না আসিবে হেথা;

ওপারের লোক নামলে পসরা
ছোটে এপারের ক্রেতা।
শিশির বিমল প্রভাতের ফল
শত হাতে সহি পরখের ছল
বিকাল বেলায় বিকায় হেলায়
সহিয়া নীরব ব্যাথা।
হিসাব নাহিরে-এল আর গেল
কত ক্রেতা বিক্রেতা।
নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা
পুরানো হাটের মেলা;
দিবস রাত্রি নূতন যাত্রী,
নিত্য নাটের খেলা।
খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে,
বাঁধা নাই ওগো — যে যায় যে আসে,
কেহ কাঁদে, কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে
ঘরে ফিরিবার বেলা
উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে
চিরকাল একই খেলা।।

জীবনানন্দ দাশ
আবার আসিব ফিরে

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে— এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়— হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিবো এ কাঁঠালছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হবো কিশোরীর — ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে-ভেজা বাংলার এ সবুজ করুন ডাঙায়;
হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মিপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে;

হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়; — রাঙা মেঘে সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে।

বাংলার মুখ

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর ঃ আন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে—
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দোয়েল পাখি — চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশথের করে আছে চুপ
ফণিমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল-বট তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
দেখেছিলো; বেহুলাও একদিন গাঙুরের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিলো, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিলো— একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিলো ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায়।

বনলতা সেন

হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভনগরে,
আমি ক্লান্ত প্রান এক , চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু'দন্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবে কার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; আতিদূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা।
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি- দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে — সব নদী — ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

আট বছর আগের একদিন

শোনা গেল লাশকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে;
কাল রাতে— ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়াছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবারে হ'লো তার সাধ।
বধূ শুয়েছিলো পাশে — শিশুটিও ছিল;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো — জ্যোৎস্নায় —তবু সে দেখিল
কোন্ ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?
অথবা হয় নি ঘুম বহুকাল — লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।
এই ঘুম চেয়েছিল বুঝি!
রক্তফেনামাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার;
কোনোদিন জাগিবে না আর।

'কোনোদিন জাগিবে না আর
জাগিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম— অবিরামভার

সহিবে না আর—'
এই কথা বলেছিলো তারে
চাঁদ ডুবে চলে গেলে — অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোন এক নিস্তব্ধতা এসে।

তবুও তো পেঁচা; জাগে
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়— অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে।

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি;
সোনালী রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কতো দেখিয়াছি ।

ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন — যেন কোন বিকীর্ণ জীবন
অধিকার ক'রে আছে ইহাদের মন;
দুরন্ত শিশুর হাতে ফরিঙের ঘন শিহরণ
মরনের সাথে লড়িয়াছে;
চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা একা;
যে জীবন ফরিঙের, দোয়েলের — মানুষের সাথে তার হয়না কো দেখা
এই জেনে
অশ্বত্থের শাখা
করেনি কি প্রতিবাদ? জোনাকির ভিড় এসে সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে
করেনি কি মাখামাখি
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা এসে
বলেনি কিঃ 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?
চমৎকার!
ধরা যাক দু'একটা ইঁদুর এবার!'
জানায়নি পেঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার?

জীবনের এই স্বাদ — সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের —

তোমার অসহ্য বোধ হ'লো;
মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো
মর্গে — গুমোটে
থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে।

শোন
তবু এ মৃতের গল্প; কোন
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই;
বিবাহিত জীবনের স্বাদ
কোথাও রাখেনি কোন খাদ,
সময়ের উর্দ্ধতনে উঠে এসে বধূ
মধু — আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে;
হাড় — হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ জীবন কোনদিন কেঁপে ওঠে নাই;
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের' পরে।

জানি — তবু জানি
নারীর হৃদয় — প্রেম-শিশু-গৃহ-নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অর্ন্তগত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে,
ক্লান্ত — ক্লান্ত করে
লাশকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই,
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের' পরে।

তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে এসে

চোখ পাল্টায়ে কয় ঃ 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?
চমৎকার!
ধরা যাক দু'একটা ইঁদুর এবার।'
হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার?
আমিও তোমার মত বুড়ো হবো — বুড়ি চাঁদটারে আমি করে দেবো
কালীদহে বেনোজলে পার;
আমরা দু'জনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।

কাজি নজরুল ইসলাম
রাজ-ভিখারী

কোন ঘর-ছাড়া বিবাগীর বাঁশি শুনে উঠেছিলে জাগি'
ওগো চির বৈরাগী!
দাঁড়ালে ধূলায় তব কাঞ্চন-কমল-কানন ত্যাগি'—
ওগো চির বৈরাগী।

ছিলে ঘুম-ঘোরে রাজার দুলাল,
জানিতে না কে সে পথের কাঙাল
ফেরে পথে পথে ক্ষুধাতুর- সাথে ক্ষুধার অন্ন মাগি,'
তুমি সুধার দেবতা 'ক্ষুধা ক্ষুধা' বলে কাঁদিয়া উঠিলে জাগি'—
ওগো চির-বৈরাগী!

আঙিয়া তোমার নিলে বেদনার গৈরিক - রঙে রেঙে'
মোহ ঘুমপরী উঠিল শিহরি' চমকিয়া ঘুম ভেঙে।
জাগিয়া প্রভাতে হেরে পুরবাসী,
রাজা দ্বারে দ্বারে ফেরে উপবাসী,
সোনার অঙ্গ পথের ধূলায় বেদনার দাগে দাগী!
কে গো নারায়ন নবরূপে এলে নিখিল বেদনা ভাগী—
ওগো চির বৈরাগী
'দেহি ভবতি ভিক্ষাম্' বলি দাঁড়ালে রাজ ভিখারী,

খুলিল না দ্বার পেলেনা ভিক্ষা, দ্বারে দ্বারে ভয় দ্বারী!
বলিলে, 'দেবেনা? লহ তবে দান—
ভিক্ষাপূর্ণ আমার এ প্রাণ।'—
দিল না ভিক্ষা, নিলনাক' দান, ফিরিয়া চলিলে যোগী।
যে- জীবন কেহ লইল না তাহা মৃত্যু লইল মাগি।।

বারাঙ্গনা

কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও গায়ে
হয় তো তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতা-সম সতী মায়ে।
না হলে সতী, তবু ত তোমরা মাতা ভগিনীরই জাতি,
তোমাদেরই ছেলে আমাদেরই মত, তারা আমাদের জ্ঞাতি;
'আমাদেরই কোন বন্ধুস্বজন আত্মীয় বাবা কাকা
উহাদের পিতা উহাদের মুখে মোদেরি চিহ্ন আঁকা।
আমাদেরই মত খ্যাতি যশ মান তারাও লভিতে পারে,
তাদেরও সাধনা হানা দিতে পারে সদর স্বর্গ-দ্বারে।
স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচী পুত্র হল মহাবীর দ্রোন,
কুমারীর ছেলে বিশ্ব-পূজ্য কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ণ,
কানীন পুত্র কর্ণ হইল দানবীর মহারথী,
স্বর্গ হইতে পতিতা গঙ্গা শিবেরে পেলেন পতি,
শান্তনু রাজা নিবেদিল প্রেম পুনঃ সেই গঙ্গায়—
তাঁদের পুত্র অমর ভীষ্ম কৃষ্ণ প্রনমে যায়।
মুনি হল সত্যকাম সে জারজ জবালা-শিশু,
বিস্ময়কর জন্ম যাহার মহাপ্রেমিক সে যিশু!
কেহ নহে হেথা পাপ-পঙ্কিল, কেহ সে ঘৃণ্য নহে,
ফুটিছে অযুত বিমল কমল কামনা কালিয় দহে!
শোন মানুষের বাণী,
জন্মের পর মানব জাতির থাকে নাকো কোন গ্লানি!
পাপ করিয়াছে বলিয়া কি নাই পুণ্যেরও অধিকার?
শত পাপ করি হয়নি ক্ষুন্ন দেবত্ব দেবতার।
অহল্যা যদি মুক্তি লভে মা, মেরী হতে পারে দেবী,
তোমরাও কেন হবে না পূজ্য বিমল সত্য সেবি?
তব সন্তানে জারজ বলিয়া কোন গোঁড়া পারে গালি?

তাহাদের আমি এই দুটো কথা জিজ্ঞাসা করি খালি—
দেবতা গো জিজ্ঞাসি—
দেড় শত কোটি সন্তান এই বিশ্বের অধিবাসী
কয়জন পিতামাতা ইহাদের হয়ে নিষ্কাম ব্রতী
পুত্রকন্যা কামনা করিল কয়জন সৎ সতী
ক'জন করিল তপস্যা ভাই সন্তান-লাভ তরে?
কার পাপে কোটি দুধের বাচ্চা আঁতুরে জন্মে মরে?
সেরেফ পশুর ক্ষুধা নিয়া হেথা মিলে নরনারী — যত,
সেই কামনার সন্তান মোরা তবুও গর্ব কত!
শুন ধর্মের চাঁই—
জারজ কামজ সন্তানে দেখি কোনো সে প্রভেদ নাই !
অসতী মাতার পুত্র যদি জারজ পুত্র হয়,
অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়!

অভিযান

নতুন পথের যাত্রা-পথিক
চালাও অভিযান!
উচ্চকণ্ঠে উচ্চার আজ—
"মানুষ মহীয়ান!"
চারদিকে আজ ভীরুর মেলা,
খেলবি কে আয় নতুন খেলা?
জোয়ার জলে ভাসিয়ে ভেলা
বাইবি কে উজান?
পাতাল ফেড়ে চল্‌বি মাতাল
স্বর্গে দিবি টান্‌।।

সমর-সাজের নাই রে সময়
বেরিয়ে তোরা আয়,
আজ বিপদের পরশ নেব
নাঙ্গা আদুল গায়।
আস্‌বে রণ-সজ্জা কবে,

সেই আশায়ই রইলি সবে।
রাত পোহাবে প্রভাত হবে
গাইবে পাখী গান।
আয় বেরিয়ে, সেই প্রভাতে
ধরবি যারা তান।।
আঁধার ঘোরে আত্মঘাতী
যাত্রাপথিক সব
এ উহারে হানছে আঘাত
কর্‌ছে কলরব।
অভিযানের বীর সেনাদল!
জ্বালাও মশাল, চল্‌ আগে চল্‌!
কুচকাওয়াজের বাজাও মাদল,
গাও প্রভাতের গান!
উষার দ্বারে পৌঁছে গাবি
"জয় নব উত্থান!"

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
শাশ্বতী

শ্রান্ত বরষা, অবেলার অবসরে,
প্রাঙ্গণে মেলে দিয়েছে শ্যামল কায়া;
স্বর্ণ সুযোগে লুকাচুরি - খেলা করে
গগনে গগণে পলাতক আলো ছায়া।
আগত শরৎ অগোচর প্রতিবেশে;
হানে মৃদঙ্গ বাতাসে প্রতিধ্বনি;
মূক প্রতিক্ষা সমাপ্ত অবশেষে,
মাঠে, ঘাটে, বাটে আরব্ধ আগমনী।
কুহেলীকলুষ, দীর্ঘ দিনের সীমা
এখনই হারাবে কৌমুদীজাগরে যে;
বিরহবিজন ধৈর্যের ধূসরিমা
রঞ্জিত হবে দলিত শেফালীশেজে।
মিলনোৎসবে সেও তো পড়েনি বাকী;
নবান্নে তার আসন হয়েছে পাতাঃ

পশ্চাতে চায় আমারই উদাস আঁখি;
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা।।

একদা এমনই বাদলশেষের রাতে —
মনে হয় যেন শত জনমের আগে —
সে এসে, সহসা হাত রেখেছিল হাতে,
চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে।
সে-দিনও এমনই ফসলবিলাসী হাওয়া
মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে;
অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া
খুঁজেছিল তার আনত দিঠির মানে।
একটি কথার দ্বিধা থরথর চুড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী;
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি;
একটি পণের অমিত প্রগল্‌ভতা
মর্ত্যে আনিল ধ্রুবতারকারে ধ'রে;
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথ ছেড়ে দিল অকাতরে।।

সন্ধিলগ্ন ফিরেছে সগৌরবে ঃ
অধরা আবার ডাকে সুধাসংকেতে;
মদমুকুলিত তারই দেহসৌরভে
অনামা কুসুম অজান্নায় ওঠে মেতে।
ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি,
অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে;
অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি;
স্বাতি মণিময় তারই প্রত্যাভিষেকে।
স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখি-সম;
সে-রোমরাজির কোমলতা ঘাসে ঘাসে;
পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম;
কিন্তু সে আজ আর কারে ভালবাসে।
স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
আমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণাঃ
সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না।।

অমিয় চক্রবর্তী

রাত্রিযাপন

বুকে প্রাণটা এমনিই রইলো, জানো ভাই,
ঘরে দাঁড়িয়ে মন বললে শুধু, যাই
— যাই।
প্রকাণ্ড তামার চাঁদ রাত্রে
গলে হ'লো সোনা। সোনার পাত্রে
পরে আভায় ছড়ালো অন্তর্লীন রোদ্দুর।
নৌকো দূরে গেলো বেয়ে সেই অভ্রের সমুদ্দুর।
সেদিন রাত্রে যখন আমার কুমু বোনকে হারাই।
আর, অজ্ঞান মুহূর্তগুলো, তারায়
মিলিয়ে রইলো স্বচ্ছধারায়।
জেগে-থাকা চোখে,
মাটি গাছমাঠের জমা ঠাণ্ডা দৃশ্য পলকে-পলকে
বদলালো একটু বর্ণ; তবু বর্ণহীন,
একটু আলো ছিলো, ক্ষীণ, খুব ক্ষীণ।
আলোর সূক্ষ্ম প্রাণ অণুতে-অণুতে কী হচ্ছিলো। কালোর মধ্যে
দিয়ে উদয়।
অন্য কিছু নয়।
তিরোহিত চন্দ্রবর্ণ আকাশে ঊষা
এলো আবার দিন, প্রাচীন সোনার বেশভূষা।
ঘরের দেয়ালগুলো ফুটলো রাঙা আঁচড়ে।
তারপর? মেঘের স্তরে-স্তরে
রোজকার বিষণ্ণ সুন্দর সকাল এলো ভ'রে।
তখন দরজায় দেখলেম দাঁড়িয়ে —হঠাৎ —আছি সবাই,
জানো ভাই,
— আর সবাই।
বুকের হাড়ে শক্ত কান্না নেই, কেবল কী জানি
হয়তো এমনিই মনে-করা
যাই, একবার যাই। রইলাম তবু। শক্ত ধরা।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ছন্নছাড়া

গলির মোড়ে একটা গাছ দাঁড়িয়ে
গাছ না গাছের প্রেতচ্ছায়া —
আঁকাবাঁকা শুকনো কতকগুলি কাঠির কঙ্কাল
শূন্যের দিকে এলোমেলো তুলে দেওয়া,
রুক্ষ রুষ্ট রিক্ত জীর্ণ
লতা নেই পাতা নেই ছায়া নেই ছাল-বাকল নেই
নেই কোথাও এক আঁচড় সবুজের প্রতিশ্রুতি
এক বিন্দু সরসের সম্ভাবনা।
ঐ পথ দিয়ে
জরুরি দরকারে যাচ্ছিলামে ট্যাক্সি ক'রে।
ড্রাইভার বললে, ওদিকে যাব না।
দেখছেন না ছন্নছাড়া ক'টা বেকার ছোকরা
রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে —
চোঙা প্যান্ট, চোখা জুতো, রোখা মেজাজ, ঠোকা কপাল—
ওখান দিয়ে গেলেই গাড়ি থামিয়ে লিফট চাইবে,
বলবে, হাওয়া খাওয়ান।

কারা ওরা?
চেনেন না ওদের?
ওরা বিরাট এক নৈরাজ্যের — এক নেই রাজ্যের বাসিন্দে।
ওদের কিছু নেই
ভিটে নেই ভিত নেই রীতি নেই নীতি নেই
আইন নেই কানুন নেই বিনয় নেই ভদ্রতা নেই
শ্লীলতা-শালীনতা নেই।
ঘেঁষবেন না ওদের কাছে।

কেন নেই?
ওরা যে নেই রাজ্যের বাসিন্দে —
ওদের জন্যে কলেজে সিট নেই
অফিসে চাকরি নেই
কারখানায় কাজ নেই
ট্রামে-বাসে জায়গা নেই

মেলায়-খেলায় টিকিট নেই
হাসপাতালে বেড নেই
বাড়িতে ঘর নেই
খেলবার মাঠ নেই
অনুসরণ করবার নেতা নেই
প্রেরণা-জাগানো প্রেম নেই
ওদের প্রতি সম্ভাষণে কারু দরদ নেই —
ঘরে-বাইরে উদাহরণ যা আছে
তা ক্ষুধাহরণের সুধাক্ষরণের উদাহরণ নয়,
তা সুধাহরণের ক্ষুধাভরণের উদাহরণ —
শুধু নিজের দিকে ঝোল-টানা।
এক ছিল মধ্যবিত্ত বাড়ির এক চিলতে ফালতু এক রক
তাও দিয়েছে লোপাট ক'রে।
তাই এখন পথে এসে দাঁড়িয়েছে সড়কের মাঝখানে।
কোত্থেকে আসছে সেই অতীতের স্মৃতি নেই।
কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সেই বর্তমানের গতি নেই
কোথায় চলেছে নেই সেই ভবিষ্যতের ঠিকানা।

সেচ- হীন ক্ষেত
মণি-হীন চোখ
চোখ-হীন মুখ
একটা স্ফুলিঙ্গ-হীন ভিজে বারুদের স্তূপ।

আমি বললুম, না ওখান দিয়েই যাব,
ওখান দিয়েই আমার শর্টকাট।
ওদের কাছাকাছি হতেই মুখ বাড়িয়ে
জিজ্ঞেস করলুম,
তোমাদের ট্যাক্সি লাগবে? লিফট চাই?
আরে এই তো ট্যাক্সি, এই তো ট্যাক্সি, লে হালুয়া
সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল ওরা
সিটি দিয়ে উঠল
পেয়ে গেছি পেয়ে গেছি চল পানসি বেলঘরিয়া।
তিন-তিনটে ছোকরা উঠে পড়ল ট্যাক্সিতে,
বললুম, কদ্দুর যাবে।
এই কাছেই। ঐ দেখতে পাচ্ছেন না ভিড়?
সিনেমা না, জলসা না, নয় কোনো ফিল্মি তারকার অভ্যর্থনা।

একটা নিরীহ লোক গাড়িচাপা পড়েছে,
চাপা দিয়ে গাড়িটা উধাও —
আমাদের দলের কয়েকজন গাড়িটার পিছে ধাওয়া করেছে
আমরা খালি ট্যাক্সি খুঁজছি।
কে সে লোক?
একটা বেওয়ারিশ ভিখিরি।
রক্তে-মাংসে দলা পাকিয়ে গেছে।
ওর কেউ নেই কিছু নেই
শোবার জন্যে ফুটপাথ আছে তো মাথায় উপরে ছাদ নেই,
ভিক্ষার জন্যে পাত্র একটা আছে তো
তার মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ফুটো।
রক্তে মাখামাখি সেই দলা-পাকানো ভিখিরিকে
ওরা পাঁজাকোলা করে ট্যাক্সির মধ্যে তুলে নিল।
চেঁচিয়ে উঠল সমস্বরে — আনন্দে ঝংকৃত হয়ে —
প্রাণ আছে, এখনো প্রাণ আছে।

রক্তের দাগ থেকে আমার ভব্যতা ও শালীনতাকে বাঁচাতে গিয়ে
আমি নেমে পড়লুম তাড়াতাড়ি।
তারপর সহসা শহরের সমস্ত কর্কশে-কঠিনে
সিমেন্টে-কংক্রিটে।
ইটে-কাঠে-পিচে-পাথরে দেয়ালে-দেয়ালে
বেজে উঠল এক দুর্বার উচ্চারণ
এক প্রত্যয়ের তপ্ত শঙ্খধ্বনি —
প্রাণ আছে, এখনো প্রাণ আছে,
প্রাণ থাকলেই স্থান আছে মান অছে
সমস্ত বাধা-নিষেধের বাইরেও
আছে অস্তিত্বের অধিকার।

ফিরে আসতেই দেখি
গলির মোড়ে গাছের সেই শুকনো বৈরাগ্য বিদীর্ণ ক'রে
বেরিয়ে পড়েছে হাজার-হাজার সোনালি কচি পাতা
মর্মরিত হচ্ছে বাতাসে,
দেখতে দেখতে গুচ্ছে গুচ্ছে উথলে উঠেছে ফুল
ঢেলে দিয়েছে বুকের সুগন্ধ,
উড়ে এসেছে রঙ-বেরঙের পাখি

শুরু করেছে কলকণ্ঠের কাকলি,
ধীরে ধীরে ঘন পত্রপুঞ্জে ফেলেছে স্নেহার্দ্র দীর্ঘছায়া
যেন কোন শ্যামল আত্মীয়তা।
অবিশ্বাস্য চোখে চেয়ে দেখলুম
কঠোরের প্রচ্ছন্নে মাধুর্যের বিস্তীর্ণ আয়োজন।
প্রাণ আছে, প্রাণ আছে — শুধু প্রাণই আশ্চর্য সম্পদ
এক ক্ষয়হীন আশা
এক মৃত্যুহীন মর্যাদা।।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কথা

তারপরও কথা থাকে
বৃষ্টি হয়ে গেলে পর
ভিজে ঠাণ্ডা বাতাসের মাটি-মাখা গন্ধের মতন
আবছায়া মেঘ-মেঘ কথা;
কে জানে তা কথা কিংবা
কেঁপে-ওঠা রঙিন স্তব্ধতা

সে কথা হবে না বলা তাকে
শুধু প্রাণ ধারণের প্রতিজ্ঞা
ও প্রয়াসের ফাঁকে-ফাঁকে
অবাক হৃদয়
আপনার সঙ্গে একা-একা
সেই সব কুয়াশার মতো কথা কয়।
অনেক আশ্চর্য কথা হয়তো বলেছি তার কানে
হৃদয়ের কতটুকু মানে
তবু সে কথায় ধরে
তুষারের মতো যায় ঝরে
সব কথা কোন এক উত্তুঙ্গ শিখরে
আবেগের
হাত দিয়ে হাত ছুঁই
কথা দিয়ে মন হাতড়াই
তবু কারে কতটুকু পাই।

সব কথা হেরে গেলে
তাই এক দীর্ঘশ্বাস বয়
বুঝি ভুলে কেঁপে ওঠে
একবার নির্লিপ্ত সময়
তারপর জীবনের ফাটলে-ফাটলে
কুয়াশা জড়ায়
কুয়াশার মতো কথা হৃদয়ের দিগন্তে ছড়ায়।

নীলকণ্ঠ

হাওয়াই দ্বীপে যাইনি, দক্ষিণ সমুদ্রের কোন দ্বীপপুঞ্জে।
তবু চিনি ঘাসের ঘাগরাপরা ছায়াবরণ তার সুন্দরীদের;
— বিদেশী টহল্‌দারের ক্যামেরা-কলুষিত চোখে নয়।
দেখেছি তাদের ঘাসের ঘাগরায় নাচের ঢেউ-এর হিল্লোল,
নোনা হাওয়ার দমকে দমকে যেমন নারকেল-বনের দোলা।
মোহিনী পলিনেসিয়া!
মহাসাগরে ছড়ান
ভেঙে যাওয়া ভুলে যাওয়া কোন্ সুদূর সভ্যতার নাকি ভগ্নাংশ
আমি জানি,
সমুদ্রের ঔরসে
প্রবাল দ্বীপের গর্ভে তার জন্ম!

সূর্যের ঔরসে
মহারণ্যের গর্ভে যার জন্ম,
আঁধার-বরণ সেই আফ্রিকাকেও জানি,
— শৌখিন শিকারী আর পণ্ডিত-পর্যটকের চোখে নয়।
অরণ্য-চোয়ানো ঝাপসা আলোয়,
কি, দিগন্ত-ছোঁয়া ফেল্টর চোখ-ঝলসানো উজ্জ্বলতায়
উদ্দাম আঁধার-বরণ আফ্রিকা!
কণ্ঠে তার দূরন্ত অরণ্য উল্লাস
— হে- ইডি, হাইডি, হা-ই!

হে-ইডি, হাইডি হা-ই!
কালো চামড়ার ছোঁয়াচ বাঁচাতে
কালো মনের ছোঁয়াচে রোগে জর্জর
বিলাসী ক্লীবের প্রলাপ -প্রতিধ্বনি নয়।
রাত্রি-নিবিড়, অরণ্য-গহন আফ্রিকার
রোমাঞ্চিত উত্তাল উচ্চারণ,
হে-ইডি হাইডি হা-ই!

হে- ইডি, হাইডি, হা-ই।
অরণ্য ডাকে ওই, — যাই!
সিংহের দাঁতে ধার, সিংহের নখে ধার,
চোখে তার মৃত্যুর রোশনাই।
— হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!
বনপথে বিভীষিকা, বিঘ্ন,
আমাদেরও বল্লম তীক্ষ্ণ।
কাপুরুষ সিংহ তো মারতেই জানে শুধু
আমরা যে মরতেও চাই!
হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!
মেয়েদের চোখ আজ চক্‌চকে ধারালো;
নেচে নেচে ঢেউ-তোলা, নাচের নেশায় দোলা
মিশ্‌কালো অঙ্গে কি চেক্‌নাই!
মৃত্যুর মৌতাতে বুঁদ হয়ে গেছি সব
রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই!
— হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!
আমাদের গলায় কই সেই উদ্দাম উল্লাস,
ঘাসের ঘাগরায় দুরন্ত সমুদ্র-দোলা?
কেমন করে থাকবে?
আমাদের জীবনে নেই জলন্ত মৃত্যু,
সমুদ্র নীল মৃত্যু পলিনেসিয়ার!
আফ্রিকার সিংহ-হিংস্র মৃত্যু!
আছে শুধু স্তিমিত হয়ে নিভে যাওয়া,
— ফ্যাকাশে রুগ্ন তাই সভ্যতা !

সভ্যতাকে সুস্থ করো, করো সার্থক।
আনো তীব্র, তপ্ত, ঝাঁঝালো, মৃত্যুর স্বাদ,
সূর্য আর সমুদ্রের ঔরসে
যাদের জন্ম,
মৃত্যু-মাতাল তাদের রক্তের বিনিময়।

ভরাট-করা সমুদ্র আর উচ্ছেদ করা অরণ্যের জগতে
কি লাভ গ'ড়ে কৃমি-কীটের সভ্যতা,
লালন ক'রে স্তিমিত দীর্ঘ পরমায়ু
কচ্ছপের মত?
অ্যামিবারও ত' মৃত্যু নেই।
মৃত্যু জীবনের শেষ সার আবিষ্কার
আর
শিব নীলকণ্ঠ।

হারিয়ে

কোনো দিন গেছ কি হারিয়ে
হাট-বাট নগর ছাড়িয়ে
দিশাহারা মাঠে,
একটি শিমূল গাছ নিয়ে
আকাশের বেলা কাটে?
সেখানে অনেক পথ খুঁজে
পৃথিবী শুয়েছে চোখ বুঁজে
এলিয়ে হৃদয়।
শিয়রে শিমূল শুধু একা
চুপ ক'রে রয়।
পথ খুঁজে যারা হয়রান
কোনদিন সেই ময়দান
তারা পেয়ে যায়।
হঠাৎ অবাক হয়ে

আশে পাশে ওপরে তাকায়।
কোন পথ যেখানেতে নেই
সেখানেই মেলে এক খেই
আরেক আশার।
সব পথ পারাবার পর
বুঝি খোঁজ মেলে আপনার।
একদিন যেও না হারিয়ে
চেনা মুখ শহর ছাড়িয়ে
অজানা প্রান্তরে
একটি শিমূল আর আকাশ যেখানে
মুখোমুখি চায় পরস্পরে।

বুদ্ধদেব বসু
চিল্কায় সকাল

কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায়
কেমন ক'রে বলি।
কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর,
যেন গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তান
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ঃ

কী ভালো আমার লাগলো এই আকাশের দিকে তাকিয়ে;
চারদিক সবুজ পাহাড়ে আঁকাবাঁকা, কুয়াশায় ধোঁয়াটে,
মাঝখানে চিল্কা উঠছে ঝিলকিয়ে!

তুমি কাছে এলে, একটু বসলে, তারপর গেলে ওদিকে,
ইস্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, তা-ই দেখতে।
গাড়ি চ'লে গেলো! — কি ভালো তোমাকে বাসি,
কেমন ক'রে বলি।

আকাশে সূর্যের বন্যা, তাকানো যায় না।
গোরুগুলো একমনে ঘাস ছিঁড়ছে, কী শান্ত!

— তুমি কি কখনো ভেবেছিলে এই হ্রদের ধারে ধারে এসে আমরা পাবো
যা এতদিন পাইনি?

রুপোলি জল শুয়ে-শুয়ে স্বপ্ন দেখছে, সমস্ত আকাশ
নীলের স্রোতে ঝ'রে পড়ছে তার বুকের উপর
সূর্যের চুম্বনে। — এখানে জ্ব'লে উঠবে অপরূপ ইন্দ্রধনু
তোমার আর আমার রক্তের সমুদ্রকে ঘিরে
কখনো কি ভেবেছিলে?

কাল চিল্কায় নৌকোয় যেতে যেতে আমরা দেখেছিলাম
দুটো প্রজাপতি কতদূর থেকে উড়ে আসছে
জলের উপর দিয়ে। — কী দুঃসাহস! তুমি হেসেছিলে, আর আমার
কী ভালো লেগেছিলো
তোমার সেই উজ্জ্বল অপরূপ সুখ। দ্যাখো, দ্যাখো,
কেমন নীল এই আকাশ। — আর তোমার চোখে
কাঁপছে কত আকাশ, কত মৃত্যু, কত নতুন জন্ম —
কেমন ক'রে বলি।

জোনাকি

একী
জোনাকী!
তুই কখন
এলি বলতো!
একলা
এই বাদলায়
কেন কলকা-
তায় এলি তুই?
(এই সারা রাতজ্বলা চিরদীপমালা দেয়ালি-আলোয়!)
তোর সঙ্গী
সব পাড়াগাঁর
পথে সারা রাত
ঘন অন্ধ-

কারে জ্বলছে।
কোন সরকার
দর- কারে তার
এই শহরে
তোকে শফরে
আজ পাঠশালা!
(এই চাঁদ-তারা-ঝরা ছায়া-ছেঁড়া-চির-দেয়ালি আলোয়!)
এ যে কলকা
তার ফুটপাত,
নেই ফাঁকা মাঠ
নেই ঝোপঝাড়
নেই জঙ্গল,
তুই ফিরে যা
তোর পাড়াগাঁর
পচা পুকুরের
পাড়ে থমথমে
কালো রাত্তিরে
কর ঝলমল—
(জ্বল চঞ্চল তারা তারা-ভরা কালো-আকাশ-তলে।)
এই কলকা-
তায় রাত নেই,
নেই চুপচাপ;
তারা তাড়ানোয়
ভরা সারা রাত।
তুই এ-ঘরে
কোন বিঘোরে
এলি দেয়ালে
ছাদে জানালায়
ঘুরে মরতে!
(এই আশবাব-ঠাশা হাঁশফাঁশ-করা গুমোট ঘরে!)
আমি একলা
এই বাদলায়
শুয়ে দেখছি
তোর ঝিকমিক
জ্বলে মশারির

কোণে চিকচিক,
ঘুম আসে না।
ভাবি, ঘুটঘুট
ঘোর রাত্তিরে
তোর সঙ্গীরা
তোকে ডাকছে;
তুই ফিরে যা-
(তোরা মাঠ-ভ'রে-ফোটা সবুজ তারার দেয়ালি জ্বলা।)
যা ফিরে যা
তোর পাড়াগাঁয়
না, না, যাসেন
তুই এখনই;
আরো একটু
থাক, চক্ষু
ভ'রে দেখে নিই—
(এই দেয়ালি-আলোয় চঞ্চল কলকাতার রাতে!)
তবু এটুকুই
বলি ভাগ্য
আজ এলি তুই
এই রাত্রে—
চোখে ঘুম নেই।
সারা শহরে
আমি একলা
শুধু দেখলুম
তোর পাখনার
আলো ঝিলমিল
যেন ছোট্ট
তারা ফুটলো,
যেন স্বপ্নে
দিলি ক্ষণিকের
সুখ- সঙ্গ-
তুই, জোনাকি!

বিষ্ণু দে

প্রচ্ছন্ন স্বদেশ

চেয়েছি অনেকদিন
আজো তাকে খুঁজি সারাক্ষণ
কখনো-বা পাশ দিয়ে কখনো আড়ালে
কখনো বা দেশান্তরে কখনো-বা চোখোচোখি
কখনো-বা ডাকে কানে-কানে কাছাকাছি
নিশ্বাসের তাপে একান্ত আপন ছন্দোময়
বুঝি বা অলক তার কাঁপে আমার কপালে
কখনো হাওয়ায় লাগে হাওয়া
তবু তাকে পাওয়া আজো হ'ল না নিঃশেষ
বাহুর নাগালে নেই অস্পষ্ট অধরা
অথচ সূর্যের মতো সত্য মাটি যেন ফসলের কাছে
পূর্ণিমা চাঁদের মতো প্রত্যক্ষ অথচ
অতনু প্রবাহ তার
রক্তে তার পদধ্বনি জীবনের স্পন্দনে-স্পন্দনে
স্বপ্নে তার হৃদয় সদাই শ্রাবণের তালদীঘি
উত্তরাধিকারে তার দীর্ঘ অঙ্গীকার প্রেরণা পৌরুষে

তবু তাকে খুঁজি সারাক্ষণ
খুঁজি সাধারণ্যে তাকে সাধারণে জনতায় চকিতে নিবিড়ে
দুর্গতির ব্যাপ্ত দায়ভাগে নিশ্চিন্ত আশ্বাসে
জনগণে জনসাধারণে দেশের মানুষে
যে যার আপন কাজে রচনায়-রচনায়

মনে হয় দেখা বুঝি মেলে
সমুদ্রে-সমুদ্রে দেখি আবেগ কল্লোলে
এই বুঝি আবির্ভাব
সাগর উত্থিতা উল্লাসে-উল্লাসে শপথে - শপথে
দীপ্ত মিলিত ভাষায়
লবণাম্বুরাশিরাশি নিবদ্ধ ধারায় মেলে বনরাজিনীলা
সভায় মিছিলে তোমাদের আমাদের ভিড়ে
সমুদ্র সেই সমুদ্রই নয় বুঝি আকস্মিক বান বুঝি
গান শুধু হঠাৎ জোয়ার

উল্লাস উদ্‌ভ্রান্ত মরু ঠেলাঠেলি অন্ধ অহংকার
ক্ষমতার পাতাল সন্ধান প্রায় আত্ম অচেতন

পালায় সে মেঘে মেঘে বজ্রে ও বিদ্যুতে
মোহনার ভাঁটায় ভাঁটায়
আষাঢ়ের অশ্রুহীন হঠাৎ সন্তাপে
রেখে যায় ছায়া শুধু হাওয়া শুধু রেশ
আকাঙ্খায় - আকাঙ্খায়

সেই ছায়া দিনরাত খুঁজে ফিরি সেই হাওয়া
রক্তে আঁকি সেই ছদ্মবেশ একান্ত আপন
তালীতমালের বনে মৃত্যুবাঁধা রাজপথে
তোমাদের আমাদের সামনে আড়ালে তাকে
বার-বার আজো সারাক্ষন
অস্পষ্ট আসন্ন তবু যেন-বা সে
দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
প্রচ্ছন্ন স্বদেশ।।

সাত ভাই চম্পা

চম্পা! তোমার মায়ার অন্ত নেই,
কত না পারুলরাঙানো রাজকুমার
কত সমুদ্র কত নদী হয় পার!
বিরাট বাংলাদেশের কত না ছেলে
অবহেলে সয় সকল যন্ত্রণাই—
চম্পা কখন জাগবে নয়ন মেলে।

চম্পা, তোমার প্রেমেই বাংলাদেশ
কত না শাঙন রজনী পোয়াল বলো।
গৌরীশৃঙ্গ মাথা হেঁট টলোমলো,
নিষিদ্ধ দেশে দীপঙ্করের শিখা,
চীনে জ্বলে, হয় মঙ্গোলিয়ায় লেখা,
চম্পা, তোমায় চিনেছিল সিংহলও।

তোমাকে খুঁজেছে জান কি কৃষকে নৃপে
অশ্বের খুরে, লাঙলের ফলা টেনে,
হাতুড়ির ঘায়ে, কাস্তের বাঁকা শানে,
ভাটিয়ালি গানে, কপিলমুনির দ্বীপে;
কলিঙ্গ আর কঙ্কনে গুর্জরে
চম্পা, তোমার সাত ভাই গান করে।

শ্যাম-কম্বোজে তারা বুঝি টানে দাঁড়,
নীলকমলের দেশে রেখে আসে হাড়
বহু চাঁদ বহু শ্রীমন্ত সদাগর,
চম্পা, তোমারই পারুল মায়ার লোভে
বাহিরকে ঘর আপনাকে করে পর,
বলী হাসে, আসে যবদ্বীপের সাড়।

তোমার বাহুর নির্দেশ দেখে ক্ষোভে
কত প্রাণ গেল, কতজানা নিশি ডেকে
অন্ধ আবেগে বৈতরণীতে ডোবে।
চম্পা, তোমার অবিনশ্বর প্রাণ
এ কোন্ হিরণ মায়ায় রেখেছ ঢেকে,
খুলে দাও মুখ, রৌদ্রে জ্বলুক গান।

কড়ির পাহাড়ে চম্পা, তুমি তো নেই
কাঞ্চনমালা জানে না তোমার খেই;
তবুও তোমায় খুঁজে মরে সারা দেশ—
ঘোচাও চম্পা, দুস্থ ছদ্মবেশ,
এ মাহ্ ভাদরে ভরা বাদরের শেষে
চকিতে দেখাও জনগণমনে মুখ।
মুক্তি! মুক্তি! চিনি সে তীব্র সুখ,
সাত ভাই জাগে, নন্দিত দেশ-দেশ।।

অরুণ মিত্র
এ জ্বালা কখন জুড়োবে

এ জ্বালা কখন জুড়োবে?
আমার এই বোবা মাটির ছাতি ফেটে চৌচির। উঠোনের ভালোবাসার ভোর এক মুঠো ছাই হয়ে ছড়িয়ে যায় শুকনো লাউডগার মাচায়, খড়ের চালে কাঠবেড়ালীর মতো পালায় আনেকদিনের
আশা, শুধু ভাসা ভাসা কথার শূন্যে লেগে থাকে এক জলমোছা দৃষ্টি দুপুরের সূর্য হয়ে। কোথায় সে আকাঙ্খাকে পোষবার সংসার, ভবিষ্যৎকে আদর করবার সংসার। গড়বার, আদর করবার, ফুলে ফলে কাকলীতে মিলিয়ে দেবার। মিলিয়ে গেল তা এই ক্ষোভে।

এ জ্বালা কখন জুড়োবে?
আমার কন্যাকুমারী কপাল কোটে পাথরে । কতদিন তুষার - শীতল স্রোতের প্রার্থনা পেতেছে সে দোরগোড়ায়, চেয়েছে উত্তুরে হাওয়ায় সন্ধ্যাঝরা বর্ষণ। কিন্তু ঝাঁক ঝাঁক বর্শার বিষ উত্তাল করল তার তিন সমুদ্র, এপার ওপার জুড়লো কান্নার কল্লোল। দাওয়ায় বসে আর ছায়াপথে স্বপ্ন পাঠানো যায় না, হারানো তারাগুলো শুধু কাঁটা হয়ে ওঠে আগাছার ঝোঁপে।

এ জ্বালা কখন জুড়োবে?
পুরনো খবরের কাগজের পাতায় বলির তারিখগুলো চাপা পড়েছে। খালি হৃদয়ের বাঁচার আন্দোলনে তারা বেঁচে। শোভাযাত্রায় শোকযাত্রায় যন্ত্রণার মিলনে ভিতরে ভিতরে ফুঁসে-ওঠা ফুঁপিয়ে-ওঠা আবেগ শরীরের সমস্ত তন্তুতে থরথর করে। সেখানে শান্তি ঝরে না, সান্ত্বনা ঝরে না। ছেলে ভুলোনো আসরে কাঠ-পুতুলের একটা একরোখা ভঙ্গি শক্ত হয়ে থাকে যেন এখনি ছিটকে পড়বে বিক্ষোভে।
এ জ্বালা কখনো জুড়োবে?
গোমুখীর পাহাড়-চূড়ায় অন্ধকার উড়িয়ে এ কোন্ জয়ের উল্লাস! তার তাড়নায় আঁকাবাঁকা সুতোলি নদী সাপের মতো মোচড়ায়। লাখ লাখ বুকের তুষানলের আভায় কালো দিগন্তে পাড় বোনা, দুর্গের গড়ে সঙীনের চকমকির ফুলকি আর রাজবাগিচার জঙ্গলের চাউনি। আরো বলি চাই। অনেক তো দেওয়া গেল, অনেক প্রিয়জনের পাঁজর গুঁড়িয়ে গেল আচমকা তোপে। আর কত! কবে আমার এই ধুলো পবিত্র বৃষ্টিতে ধোবে?

এ জ্বালা কখন জুড়োবে?
কখন?

বদলটা অন্ধকারে হয়

বদলটা অন্ধকারে হয়,
ঘুমঘুম ট্রেনে চেপে আমি রওনা হই।
চকের জলন্ত ঘন্টাঘর আর আমাকে টানে না
পড়শীরা তাদের দুর্গের ফোকর থেকে
হাসি ছুঁড়ে বলে না, অভিযানে যাও।
অভিযান!
পতঙ্গের মতো ঝটপট
দু' চোখ বন্ধ ক'রে মাথাকোটা,
আবার ফিরে এলে
ঘুলঘুলির ফাঁকে বরণ-মুদ্রা
যেন মস্ত বিজয়কে আমি বগলদাবা ক'রে এনেছি।
অথচ আমার তো জানা
পায়ের তলায় রাস্তাগুলো কেমন উল্টে থাকে,
এবং বুকে হেঁটে আমার যাওয়া
সেই স্তম্ভটা পর্যন্ত,
ফিরতি পথে একশোবার হাঁটু ভেঙে বসা
আর শুকনো পাতার গাদায় মুখ গোঁজা,
মহল্লায় এসে গেল পথ জুড়ে দুর্গ,
পাঁচিলের ভিতরে আমার জন্যে তৈরী
নিঝ্‌ঝুম বিশ্রাম।

আমি রাতের ট্রেনে পাড়ি দিই,
সমস্ত পথ ঝমঝম বৃষ্টির শব্দ
আদরের কথার শব্দ,
জানালা দিয়ে তাকালে
এপার ওপার কালো দীঘি
পাড় অব্দি গাছগাছালির ঢল,
চোখের দু'পাতা এক করলে
শনশন কালবৈশাখী
আর মৌসুমী হাওয়ার মন্তর।
মেঘ কেটে যেতেই রোদ
আমার ছোটবেলার হুটোপুটির রোদ,
প্রকাণ্ড ইস্টিশনের মাথায় সূর্য

উপরে নিচে পাশে লোহার বাজনা
টালমাটাল মানুষ,
আমি পৌঁছলাম।

দুরন্ত স্রোতে আমার পা
ঘাসমাটিপাথর হুড়মুড়িয়ে
ঘরবাড়ি টলতে টলতে
আমাকে মাঝখানে নিয়ে দুরন্ত,
লক্ষ মুখ বিস্ফোরণের আভায়
আর, কি ঐ আহা আগমনীর গান,
কোন্ আশ্বিনের সূর্য
বুলার ছোট্ট মুঠোয় ধরা,
আমি পৌঁছলাম
আমার কেন্দ্রে বাংলায় আমার বাংলাদেশে।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র
রাজধানী

ইতিহাসই জানে, আর তুমি জানো নাজির হাসান,
দরিবা কালানে এক পুরোনো দালানে বসে —
আঁধিলাগা দিল্লীর ঘোলা-আকাশ চোখে
তুরুক্-সওয়ার ঘোড়া খুরে খুরে শব্দের স্বপ্নই দেখো।
এখন হঠাৎ টুক্‌রো বর্তমান নিয়ে,
টাঙ্গাওয়ালা, স্কুটারের শব্দ ধাবমান,
মন্‌সবদার কোনো বাস থেকে নামে —,
ফর্‌সীর নল মুখে চম্‌কে ওঠো নাজির হাসান।।

অনেক দূরের পথ — ইন্দ্রপ্রস্থ পার হয়ে,
অতিবৃদ্ধ পিতামহ রাজধানী পাশা খেলা হেরে,
যগে যুগে পাঠান মুঘল্ রাজ্যে যুধিষ্ঠির হয়ে
মিশে গেছে ইংরাজের কালে।
এখন পাণ্ডব-পণ্ড ইন্দ্রপ্রস্থে, পাণ্ডুর বাতাসে,

বিবস্ত্র বেপথু কোনো দ্রৌপদীর কান্না নিয়ে,
আধুনিক রেডিওর গান, আর রাস্তায়
বরাত্-মিছিলে, মেশে সিনেমার ধুন্!
শ্রদ্ধা হয় তোমাকেই, তোমার এই বিচিত্র কেলাসে,
সময়ের মদ পান করে মত্ত সুচারু গেলাসে,
রাজধানী ছিলে তুমি সিপাহী বিদ্রোহেও —।
রাস্তায় রাস্তায় মোড়ে ফাঁসীকাঠ, খুনী দরবাজা
হুঁশিয়ারী চীৎকার! — ক্ষুধিত পাষাণ!

একটি প্রবল ইচ্ছা সমবেত হয়ে,
মরে মরে ধূলি হয়ে গেছে সব দিল্লীর রাস্তায়।
তবু, কতখানি সব মনে আছে তোমার জানি না
নাজির হাসান,
সেদিনও যেমন,
এখনও অগুণ্‌তি সব সবুজ টিয়ার ঝাঁক
ময়ূরের বর্ণালী বিলাস,
সন্ধ্যার আরক্ত আকাশ আর লাল কেল্লা ছুঁয়ে
যমুনার পারে উড়ে যায়, বর্ণাঢ্য পাখায় —
লাল-নীল-সবুজের শামিয়ানা
ঢেকে রাখে আকাশের চোখ।
শাহ্‌জাহান আলম্‌গীর বাহাদুর শাহেরাও
দেখে গেছে সব —
হাতির পায়ের তলে অপরাধী পেষা।
ঘাম আর গায়ের রক্ত জল করে করে,
গড়ে তোলে সাধারণ লোক,
ভাস্কর কামার,
নিষ্ঠুর প্রতিমা সব
প্রাসাদে মঞ্জিলে।
এরই নর্ম বিচিত্র আড়ালে
চাঁদ্‌নি চকের কোনো অন্ধকার গলির গহনে
তোমাকেও টেনেছিল, নাজির হাসান,
সুরমাটানা মৃত্যুহানা চোখ
তুর্কী সুন্দরীর।
তোমার যৌবন ছিল আঙুরের মত,
নিটোল, মদির।।

আজ সবই ইতিহাস —।
অথচ তুমি ও আমি, আমরা সবাই
এখানেই আছি, এই রাজধানীতেই
মিলে মিশে এক গালিচায়।
ওপরে, পালাম্ থেকে জেট্ প্লেন
পুরোনো আকাশটাকে ছিঁড়ে চলে যায়।
সন্ধ্যা নামে, শবাচারী শকুনের ভিড়ে—
আগুনের আলো জ্বলে, হল্লা শোনা যায় দূরে,
রাস্তার মোড়ে।
আমি সেই মনসবদার, দিল্লীর বাস থেকে নেমে
জানাই সেলাম —।
পুরোনো কালের ঢুলু ঢুলু চোখে
চারপাই-এ উবু হয়ে বসে,
ফর্সীর নল মুখে চম্‌কে ওঠো নাজির হাসান।।

ডাক্ সাজ প্রতিমায় রং দেয় অভিরাম পাল

বাড়ী ভাড়া বাকি কয়মাস, তবু
রুগ্ন ক্লান্ত দেহটুকু ঘিরে
অত্যাশ্চর্য আবরণ নিয়ে, ঘোরে
তালি দেওয়া অস্তিত্বের সামগ্রী সংগ্রহে —
অভিরাম পাল।
লগ্ন-জ্বরী কন্যা তার।
স্ত্রীও ধোঁকে শ্বাস রোগে।
রেশন আনার কড়ি, বাড়ন্ত, সংসারে।
বাঁচবার অধিকার ধার করে
কয়েকদিন চলে।
তারপর অনিবার্য, শেষ হয়ে যাওয়া।
এই তো সেদিন,
ছোট ভাই মারা গেল গুলি খেয়ে
রাস্তার মোড়ে।
ওদিকে, অনেক রাত্রে ফেরে,
একদা সুন্দরী তার বোন —

তণিমাকে চেনে সব পাড়ার ম'স্তান্।
অত্যন্ত পঙ্কিল ঘৃণ্য জীবনের ফেন পুঞ্জ
পণ্য-দেহ ঘিরে,
অবিরাম ঘূর্ণাবর্ত রচে।
ইতিমধ্যে আকাশ কি ফরসা হয়ে ওঠে!
নীল নীল আকাশের গায়ে লাগে
কাশ-ফুল মেঘ!
ছোট ছোট সারি সারি আশ্বিনের বাৎসরিক সমারোহ
ভেসে ওঠে চোখে।
ঢাকীরা বায়ান নেয়।
স্কুলের উদ্‌গ্রীব ছেলে-মেয়েদের শিরদাঁড়া বেয়ে
ছুটি শিরশিরিয়ে ওঠে।
খেলা-খেলা অন্ধকারে-আলো,
ভাঙ্গা দালানের কোণে,
উঠোনের ঘাস-ওঠা বুকে।
স্টেশন, ট্রেনের বাঁশী, পোড়া কয়লার ধোঁয়া-গন্ধ, আর
হঠাৎ দূরের দেশ, পাহাড়ের বাঁক ঘুরে পদ্ম-বিল।
এইসব চাল-চিত্র নিয়ে,
গহনার নৌকা করে প্রতিমারা পিতৃগৃহে আসে।
দ্রুত টোকা পড়ে যায় ভাঙা দরজায় —
সামন্ত বাড়ীর পেয়াদাটা
বায়না নিয়ে আনে, — মোটাথাম্ পূজার দালান।
ভুলে গেল,
আজকাল পরশুর কথা ভুলে গেল।
অনশন অর্ধাশন বিরোধ বিদ্রোহ্ আর মিছিলের সং।
সব ভুলে গিয়ে, আসে আশ্বিনের সোনার সকাল।
ডাক সাজ প্রতিমায় রং দেয় অভিরাম পাল।।

দিনেশ দাশ

কাস্তে

বেয়নেট হ'ক যত ধারালো
কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু,
শেল্ আর বোম হ'ক ভারালো
কাস্তেটা শান দিও বন্ধু!
বাঁকানো চাঁদের সাদাফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালোবাসতে?
চাঁদের শতক আজ নহে তো,
এ - যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে।
লোহা আর ইস্পাতে দুনিয়া
যারা কাল করেছিল পূর্ণ
কামানে কামানে ঠোকাঠুকিতে
নিজেরাই চুর্ণ-বিচুর্ণ।

চুর্ণ এ লৌহের পৃথিবী
তোমাদের রক্ত সমুদ্রে
ক্ষয়িত গলিত হয় মাটিতে,
মাটির — মাটির যুগ উর্ধ্বে।

দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে
আসে ওই চেয়ে দেখ বন্ধু!
কাস্তেটা রেখেছ কি শানায়ে?
এ- মাটির কাস্তেটা বন্ধু!

কবিগুরুর জন্মদিনে

বছরগুলো শুধু ছায়ার মতই ঘুরে আসে,
দিনগুলি চোখের ভিতরেই ম'রে যায়,
নিঃশব্দে অন্ধকার নামে, যার হাতে কোন বাতি নেই;
আমার সর্বাঙ্গ যখন অবসন্নতায় জড়িয়ে আসে
তখন আমি তোমাকে অনুভব করি

আমার চোখের পাতার নীচে
একটি পবিত্র প্রার্থনার মত
আমি অন্ধকারের উপর ব'সে তোমাকে স্মরণ করি
আমার কথাগুলি শুধু ধুলোর মত ছড়িয়ে পড়ে।
চর্তুদিকের মরা ঘাসের জমির ওপর
আমার উজ্জ্বল লাইনগুলো ঝাপসা হ'য়ে আসে ,
নিটোল শব্দগুলি ভেঙে যায়,
মাটি সরে, সমুদ্র শুকোয়, ঋতুগুলি অদৃশ্যঃ
কবিগুরু! তুমি কোথায় পা রাখবে বল?

ডাষ্টবিন

মানুষ এবং কুত্তাতে
আজ সকলে অন্নচাটি একসাথে
আজকে মহা দু'র্দিনে
আমরা বৃথা খুঁজি ডাষ্টবিনে।

এই যে খুনে সভ্যতা
অনেক জনের অন্ন মেরে কয়েক জনের ভব্যতা,
এগোয় নাকো পেছোয় নাকো অচল গতি ত্রিশঙ্কুর
হোটেলখানার পাশেই এরা বানিয়ে চলে আঁস্তাকুড়।

পঁজির প্রভু! মহাপ্রভু! তোমার কৃপা অনন্ত
জলের কৌটা ঘিয়ের কড়ায় ফুটন্ত,
পিঁপড়ে পেল মানুষ-গলা শর্করা,
তোমার কৃপা বুঝবে কি আর মুর্খরা?

আজ যে পথে আবর্জনার স্বৈরিতা
মহাপ্রভু! সবই তোমার তৈরিতা।
দেখছি ব'সে দূরবীনে
তোমায় শেষে আসতে হবে তোমার গড়া ডাষ্টবিনে।

সমর সেন

নাগরিক

মহানগরীতে এলো বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি
আর দিন
সমস্ত দিন ভরে শুনি রোলারের শব্দ,
দূরে, বহুদূরে কৃষ্ণচূড়ার লাল, চকিত ঝলক,
হাওয়ায় ভেসে আসে গলানো পিচের গন্ধ;
আর রাত্রি
রাত্রি শুধু পাথরের উপরে রোলারের
মুখর দুঃস্বপ্ন।
তবু মাঝে মাঝে মুহূর্তগুলি
আমাদের এই পথ
সোনালী সাপের মতো অতিক্রম করে;
পাটের কলের আকাশ তখন
পাথরের মত কঠিন,
মান হয় যেন সামনে দেখি —
দুধারে গাছের সবুজ বন্যা,
মাঝখানে ধূসর পথ,
দূরে সূর্য অস্ত গেল;
ভরা চাঁদ এলো নদীর উপরে,
চারিদিকে অন্ধকার — রাত্রের ঝাপসা গন্ধ,
কিছুক্ষন পরে হাওয়ার জোয়ার আসবে
দূর সমুদ্রের কোন দ্বীপ থেকে, —
সেখানে নীল জল, ফেনায় ধূসর সবুজ জল,
সেখানে সমস্ত দিন সবুজ সমুদ্রের পরে
লাল সূর্যাস্ত,
আর বলিষ্ঠ মানুষ, স্পন্দমান স্বপ্ন—

যতদুর চাই হাসির অরণ্য,
পায়ে চলা পথের শেষে কান্নার শব্দ।

ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়ো
হে মহানগরী
রূদ্ধশ্বাস রাত্রি শেষে
জ্বলন্ত আগুনের পাশে আমাদের প্রার্থনা,

সমান জীবনের অস্পষ্ট চকিত স্বপ্ন

আর কত লাল শাড়ী আর নরম বুক, আর টেরিকাটা মসৃণ মানুষ,
আর হাওয়ায় কত গোল্ড ফ্লেকের গন্ধ,
হে মহানগরী!
যদি কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্ত বাতাসে
— স্কুল আর কলেজ হোলো শেষ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট জনহীন,
দশটা-পাঁচটার দীর্ঘশ্বাস গিয়েছে থেমে,
সন্ধ্যা নামলোঃ
মাঝে মাঝে সবুজ গাছের নরম অপরূপ শব্দ;
দিগন্তে জলন্ত চাঁদ, চিৎপুরে ভিড়;
কাল সকালে কখন সূর্য উঠবে!
কলেরা আর কলের বাঁশী আর গণোরিয়া আর বসন্ত
বন্যা আর দুর্ভিক্ষ
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ

সন্ধ্যার সময়,
রাস্তায় অনুর্বর অত্মার উচ্ছ্বাসে
মাঝে মাঝে আকাশে শুনি
হাওয়ার চাবুক
আর ঝাপসা ভাবে শুধু অনুভব করি—
চারিদিকে ঝড়ের নিঃশব্দ সঞ্চরন।

মণীন্দ্র রায়
একবার বিদায় দে মা

এখন সকালে রোজ দৈনিকের পাতা থেকে
চায়ের ভিতর ছিটকে পড়ে
রক্ত শুধু কয়েকশ খুনের।
এখন সংবাদ শুধু
নিত্য গনধর্ষণ ও হরিজন বস্তি ঘিরে
পোড়া মাংস আর্ত আগুনের।
সুজলা সুফলা এই দেশে
এখন আতঙ্ক আর

এ- ওকে পায়ের তলায় ঠেসে
গড়ে তোলা ভ্রান্তির পাহাড়

অথচ এই কি নয় সেই দেশ যার ডাকে
বুড়িবালামের তীরে, চাঁটগার পাথরে
তাজা রক্ত পড়েছিলো ঝরে?
নিজ বাসভূমে পরবাসী
আজও বুকে প্রতিধ্বনি তোলে নাকি—
এই যমজয়ী গান
একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

মেজাজ

থলির ভেতর হাত ঢেকে
শাশুড়ি বিড় বিড় করে মালা জপছেন;
বউ
গটগট গটগট করে হেঁটে গেল।

আওয়াজটা বেয়াড়া ; রোজকার আটপৌরে নয়।
যেন বাড়িতে ফেরিওয়ালা ডেকে
শখ করে নতুন কেনা হয়েছে।
সুতরাং
মালাটা থেমে গেল; এবং
চোখ দুটো বিষ হয়ে
ঘাড়টাকে হেলিয়ে দিয়ে যেদিকে বউ যাচ্ছিল
সেই দিকে ঢলে পড়ল।
নিচের চোয়ালটা সামনে ঠেলে
দাঁতে দাঁত লাগল।
পরমুহূর্তেই শাশুড়ির দাঁত চোখ ঘাড় চোয়াল
যে যার জায়গায় ফিরে এল।
তারপর সারা বাড়িটাকে আঁচড়ে আঁচড়ে
কলতলায়
ঝমর ঝম ঘনর ঘন ক্যাঁচ ঘ্যাঁষঘিঁষ ক্যাঁচর ক্যাঁচর

শব্দ উঠল।
বাসনগুলো কোনোদিন তো এত ঝাঁঝ দেখায় না —
বড় তেল হয়েছে।

ঘুরতে ঘুরতে মালাটা দাঁড়িয়ে পড়ল।
নোড়া দিয়ে মুখ ভেঙে দিতে হয়—
মালাটা একবার ঝাঁকুনি খেয়ে
আবার চলতে লাগল।

নাকে অস্ফুট শব্দ করে
থলির ভেতর পাঁচটা আঙুল হঠাৎ
মালাটার গলা টিপে ধরল।
মিনসের আক্কেলও বলিহারি!
কোত্থেকে এক কালো অলক্ষুনে
পায়ে ক্ষুরঅলা ধিঙ্গী মেয়ে ধরে এনে
ছেলেটার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেল।
কেন? বাংলাদেশে ফরসা মেয়ে ছিলনা?
বাপ অবশ্য দিয়েছিল থুয়েছিল—
হ্যাঁ দিয়েছিল!
গলায় রসুড়ি দিয়ে আদায় করা হয়েছিল না?

এবার মালাটাকে দয়া করে ছেড়ে দেওয়া হল।
শাশুড়ির মুখ দেখে মনে হচ্ছিল
থলির ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে এই সময়ে
কী যেন তিনি লুকোচ্ছিলেন।
একটা জিনিস—
ক'মাস আগে বউমা
মরবার জন্যে বিষ খেয়েছিল।
ভাসুরপো ডাক্তার না হলে
ও - বউ এ - বংশের গালে ঠিক চুনকালি মাখাত।
কেন? অসুখ করে মরলে কী হয়?
ঢঙী আর বলেছে কাকে!

হাতে একরাশ ময়লা কাপড় নিয়ে
কালো বউ
গটগট গটগট করে সামনে দিয়ে চলে গেল।

নাঃ আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়।
'বউমা—'
'বলুন।'
উঁহু, গলার স্বরটা ঠিক কাছা- গলায়- দেওয়ার মত নয়,
বড্ড ন্যাড়া।
হঠাৎ এই দেমাক এল কোত্থেকে?
বাপের বাড়ির কেউ তো
ভাইফোঁটার পর আর এদিক মাড়ায় নি?

বাড়িটা যেন ঝড়ের অপেক্ষায়
থম থম করছে।
ছোট ছেলে কলেজে;
মেজোটি সামনের বাড়ির রোয়াকে বসে
রাস্তায় মেয়ে দেখছে;
ফরসা ফরসা মেয়ে
বউদির মত ভূশুণ্ডি কালো নয়।

বালতি ঠনঠনিয়ে
বউ যেন মা-কালীর মত রণরঙ্গিনী বেশে
কোমরে আঁচল জড়িয়ে
চোখে চোখ রেখে শাশুড়ির সামনে দাঁড়ালো।

শাশুড়ির কেমন যেন
হঠাৎ গা ছমছম করতে লাগল।
তাড়াতাড়ি থলির মধ্যে হাতটা লুকিয়ে ফেলে
চোখ নামিয়ে বললেনঃ আচ্ছা থাক, এখন যাও।
বউ মাথা উঁচু করে
গটগট গটগট করে চলে গেল।

তারপর একা একা পা ছড়িয়ে বসে
মোটা চশমায় কাঁথা সেলাই করতে করতে
শাশুড়ি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে ভাবতে লাগলেন
বউ হঠাৎ কেন বিগড়ে গেল
তার একটা তদন্ত হওয়া দরকার।

তারপর দরজা দেবার পর
রাত্রে
বড় ছেলের ঘরে আড়ি পেতে
এই এই কথা কানে এল —

বউ বলছে ঃ 'একটা সুখবর আছে।'
পরের কথাগুলো এত আস্তে যে শোনা গেল না।
খানিক পরে চকাস চকাস শব্দ,
মা হয়ে আর দাঁড়াতে লজ্জা করছিল।
কিন্তু তদন্তটা শেষ হওয়া দরকার —
বউয়ের গলা; মা কান খাড়া করলেন।
বলছে ঃ 'দেখো, ঠিক আমার মত কালো হবে।'
এরপর একটা ঠাস করে শব্দ হওয়া উচিত।
ওমা, বউমা বেশ ডগমগ হয়ে বলছেঃ
'কী নাম দেব, জানো?
আফ্রিকা।
কালো মানুষেরা কী কাণ্ডই না করছে সেখানে।'

শুধু ভাঙা নয়

ভেঙো না কো, শুধু ভাঙা নয়।
চাষের জন্যে যে জমিটা পেলে ভাল হয়
সে তো ঠিক
বালি চিক-চিক
ডাঙা নয়।

দেখ দেখ, এই ছোট্ট সবুজ উঠোনেই—

হামাগুড়ি দেয়,
ব্যথা পেলে কাঁদে,
প'ড়ে গেলে ঠেলে ওঠে ফের,
ছোট ছোট দুটো মুঠো দিয়ে বাঁধে
সাধ আহ্লাদ আমাদের।

হাত ছেড়ে দিলে দেয়ালটা ধ'রে
করে হাঁটি-হাঁটি পা-পা।
ভুলে যেন তাকে
দিও না কো মাটি চাপা।

ভেঙো না কো, শুধু ভাঙা নয়।

এখনও আকাশ সূর্যের রঙে
রাঙা নয়।
শিয়রে দাঁড়িয়ে থাবা তুলে আছে
গলিতনখ এ রাত্রি।
তবু যদি দুটি একটি করেও পাঁপড়ি
খুলে যায়,
কাছে থেকো —
পাছে কোনো মদমত্ত হাতির পায়ে
সেটুকুও হয় থেঁতো।
ক্রমাগত চোখ রাঙিয়ে রাঙিয়ে
যারা হয়ে গেছে অন্ধ
তাদের নাকের কাছে ধ'রে দিও
ফুলের একটু গন্ধ।

ভেঙো না কো, শুধু ভাঙা নয়।

মৃত্যুটা যত বড়ই হোক না —
জীবনের চেয়ে এমন কিছু সে
ঢ্যাঙা নয়।

যার লাগে না কো মিষ্টি
মানুষের এই সৃষ্টি,
যে বলবে এই পৃথিবীতে আছে
এক রং
শুধু রক্তের —
যত থাক নামডাক তার
যত বড় দল থাকুক অন্ধভক্তের —
টেকে কি না টেকে

একবার ভালো কবিরাজ ডেকে
অচিরে দেখানো দরকার।

ভেঙো না কো, শুধু ভাঙা নয়।
মন দাও আজ
এর চেয়ে আরও তাজা রঙে এঁকে
দেশ জুড়ে আরও ভালো এক ছবি
টাঙানোয়।
আস্ত একটি জীবনকে ঘরে আনা যাক
— একটুও যার ভাঙা নয়।

যেতে যেতে

তারপর যে-তে যে-তে যে-তে
এক নদীর সঙ্গে দেখা।

পায়ে তার ঘাঙুর বাঁধা
পরনে উড়্-উড়্ ঢেউয়ের।
নীল ঘাগরা।

সে-নদীর দুদিকে দুটো মুখ।

এক মুখে সে আমাকে আসছি বলে
দাঁড় করিয়ে রেখে
অন্য মুখে
ছুটতে ছুটতে চলে গেল।

আর
যেতে যেতে বুঝিয়ে দিল
আমি অমনি করে আসি
অমনি করে যাই।
বুঝিয়ে দিল

আমি থেকেও নেই,
না থেকেও আছি।

আমার কাঁধের ওপর হাত রাখল
সময়
তারপর কানের কাছে
ফিসফিস করে বলল —

দেখলে!
কাণ্ডটা দেখলে!
আমি কিন্তু কক্ষনো
তোমাকে ছেড়ে থাকি না।

তার কথা শুনে
হাতের মুঠোটা খুললাম।
কাল রাত্রের বাসি ফুলগুলো
সত্যিই শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে।

২.

গল্পটার কোনো মাথামুণ্ডু নেই বলে
বুড়োধাড়ীদের একেবারেই
ভাল লাগল না।
আর তাছাড়া
গল্পটা বনোনো।

পাছে তারা উঠে যায়
তাই তাড়াতাড়ি
ভয়ে ভয়ে আবার আরম্ভ করলামঃ
'তারপর যে-তে যে-তে যে-তে ...
দেখি বনের মধ্যে
আলো-জ্বালা প্রকাণ্ড এক শহর।
সেখানে খাঁ-খাঁ করছে বাড়ি;
আর সিঁড়িগুলো সব
যেন স্বর্গে উঠে গেছে।

তারই একটাতে
দেখি চুল এলো করে বসে আছে
এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা।'
লোকগুলোর চোখ চকচক করে উঠল।

তাদের চোখে চোখ রেখে
আমি বলতে লাগলাম —

তারপর সেই রাজকন্যা
আমার আঙুলে জড়ালো।
আমি তাকে আস্তে আস্তে বললামঃ

'তুমি আশা,
তুমি আমার জীবন।'

শুনে সে বললঃ
'এতদিন তোমার জন্যেই
আমি হাঁ করে বসে আছি।'
বুড়োধাড়ীরা আগ্রহে উঠে ব'সে
জিগ্যেস করলঃ 'তারপর?'

ব্যাপারটা তাদের মাথায় যাতে ঢোকে
তার জন্যে
ধোঁয়ার ধোঁয়াকার হয়ে
মিলিয়ে যেতে যেতে আমি বললাম —

'তারপর? কী বলব—
সেই রাক্ষুসীই আমাকে খেলো।'

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এসো, আমরা প্রেমের গান গাই

রাজা দেখলাম, রাণী দেখলাম
এবার একটু মানুষের কাছে বসতে চাই।

এসো আমরা প্রেমের গান গাই।

এসো, আমাদের প্রিয় কবির কাছে যাই,
তাকে বলি ঃ
আপনি গাছ ফুল পাখি ভালবাসেন
আপনি মানুষ ভালবাসেন —

প্রেমের গান গাইতে আমাদের গলা কেঁপে যায়,
আপনি আমাদের গান শেখান।'
রাজা দেখলাম, রানী দেখলাম

এবার আমরা আমাদের প্রিয় কবির কাছে ফিরে যাবো।
তিনি আমাদের সেই গান শেখাবেন
যা তুমি আর আমি গাইতে চাই।

এইসব ছাইপাঁশ কবিতা আর ভাল লাগে না
আর ভাল লাগে না ওদের মুখের ওপর
ঘৃণার কবিতা ছুঁড়ে দিতে।

এ কোনো মানুষের জীবন নয়, কবির জীবন নয়!

কিন্তু আমাদের চারদিকে বড় বেশি অন্ধকার।
আমরা কবির কাছে যেতে চাই, কিন্তু অন্ধকার ...

অন্ধকারে আলাদিনের দৈত্য আমাদের পথ রুখে দাঁড়ায়
সে আমাদের কাছ থেকে কবিতা লেখার খাজনা চায়
সে আমাদের আইন শেখাতে চায়।

এসো, তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিই, আমরা খাজনা দেবো না।
আমরা সেই রাজা মানি না যার কাছে প্রেমের গান কোনো গান নয়।
আমরা সেই রানী মানি না যিনি আমাদের ভয় দেখিয়ে খাঁচার
পাখি বানাতে চান।

তাকে আমরা সহজ, স্পষ্ট গদ্য ভাষায় আমাদের বক্তব্য বলবো;
তার জন্য, রাজা-রাণীদের জন্য, কোনো ঘৃণার কবিতাও আর নয়।

তারপর, অন্ধকারে যেদিকে দু'চোখ যায়, আমরা এগিয়ে যাবো।
কবিকে না পাই, আমরা চিৎকার করে তাঁর কবিতা বলবো—
আমাদের বেসুরো গলায় হয়তো উচ্চারণ ঠিকমত হবে না,
হয়তো তাঁর প্রেমের গান কান্নার মত শোনাবে;

কিন্তু আমরা চেষ্টা করবো, আমাদের গান যেন কান্না না হয়
যেন আমাদের ভালবাসা কবিতার আগুনে নম্র হয়, পবিত্র হয় —
মানুষের জন্য। আমরা মানুষকে স্পর্শ করতে চাই।
আমাদের প্রেমের গান
যদি গান হয়ে না ওঠে, তবু মানুষ আছে, মানুষ থেকে যায়....

তারপর নতুন কবিরা আসবে, শুদ্ধ উচ্চারণে তারা প্রেমের গান গাইবে...
আমরা তো শুধু রাস্তা হাঁটছি...
অন্ধকারে চলতে চলতে, আছাড় খেতে খেতে, বারবার ভুল
গান গাইতে গাইতে
তুমি আর আমি কান পেতে থাকবো
তুমি আর আমি কান পেতে থাকবো ঃ 'কে যায় অন্ধকারে ?'....
'কে আসে?'

সেই মানুষটিকে যে ফসল ফলিয়েছিল

সেই বিরাট খামারটিতে কোন বৃষ্টি হয় না
আমার কপালের ঘাম দিয়ে গাছগুলিকে
তৃষ্ণা মেটাতে হয়
সেখানে যে কফি ফলে আর চেরীগাছে
যে টুকটুকে লাল রঙের বাহার ধরে
তা আমারই ফোঁটা ফোঁটা রক্ত
যা জমে কঠিন হয়েছে।
কফিগুলোকে ভাজা হবে, রোদে শুকোতে হবে
তারপর গুঁড়ো করতে হবে
যতক্ষন না তাদের গায়ের রঙ হবে
আফ্রিকার কুলির জমাট রক্তে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ

যে পাখিরা গান গায়, তাদের জিজ্ঞাসা করো,
যে ঝর্ণারা নিশ্চিন্ত মনে এদিকে ওদিকে
ছুটোছুটি করছে তাদের
এই মহাদেশের মধ্যকার মানচিত্র থেকে
যে বাতাস মর্মরিত হচ্ছে, তাদের —
কে ভোর না হতেই ওঠে? কে তখন থেকেই খেটে মরে?
কে লাঙল কাঁধে দীর্ঘ রাস্তা কুঁজো হয়ে হাঁটে,
আর কেই বা শস্যের বোঝা বইতে বইতে
ক্লান্ত হয়?
কে বীজ বপন করে আর তার বিনিময়ে
যা পায় তা হলো ঘৃণা, বাসি রুটি,

পচা মাংসের টুকরো, শতছিন্ন নোংরা পোশাক
কয়েকটা নয়া পয়সা?
আর এর পরেও কাকে পুরস্কৃত করা হয়
চাবুক আর বুটের ঠোক্কর দিয়ে
কে সেই মানুষ?

কে ওপড়ওয়ালাকে গাড়ি যন্ত্রপাতি,
মেয়ে মানুষ কেনার টাকা
আর মোটরের নিচে চাপা পড়ার জন্য
নিগ্রোদের মুণ্ডুগুলি যোগান দেয়।
কে সাদা আদমিকে বড় লোক করে তোলে
তাকে রাতারাতি ফাঁপিয়ে তোলে,
পকেটের টাকা যোগায়?
— কে সেই মানুষ?

তাদের জিজ্ঞাসা করো! যে পাখিরা গান গায়,
যে ঝর্ণারা নিশ্চিন্ত মনে এদিক ওদিক
ছুটোছুটি করছে
যে বাতাস এই মহাদেশের মধ্যকার
মানচিত্র থেকে মর্মরিত হয়,
তারা সকলেই উত্তর দেবে;
— ঐ কালো রঙের মানুষটা;
যে দিনরাত গাধার খাটুনি খাটছে।
আহা! আমাকে অন্তত ঐ তালগাছটার
চুড়োয় উঠতে দাও
সেখানে বসে আমি মদ খাবো
তালগাছ থেকে যে মদ চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে;
আর মাতলামোর মধ্যে আমি নিশ্চয়ই,
ভুলে যাব, ভুলে যাব, ভুলে যাব—
যে আমি একজন কালো রঙের মানুষ,
আমার জন্যেই এইসব।

মূল রচনা ঃ আন্তোনিও জাসিন্টা

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

মেঘ বৃষ্টি ঝড়

চলে এলুম, তোমায় ছেড়ে চলে এলুম।
সখী আমার হারানো দিন ভালোবাসার ভীরু আশার,
তবু তোমায় ছেড়ে এলুম ছেড়ে এলুম।

চষা-জমির কানে কানেই ভোরবেলায় সোনালী গান
গেয়েছিলুম পেয়েছিলুম তার বুকেই ফিরে আসার
ইশারাঃ প্রাণ, সবুজ ধান, সোনালী ধান।

তবু কখন ঈশান মেঘ ঈষৎ চায় —
তবুও তার ধূসর চোখ ঘূর্ণি-ঘুরঘুর হাসার
মাটির বুক ফাটার সুখে প্রাণ বাঁচায়!
কোথায় দূরে মিলিয়ে যায় সখী তোমার তাল-তমাল।
মরাই নেই, ধানও নেই সবুজ ধান ভালবাসার।
ঈশান আনে জোর তুফান, ঘোর আকাল।

সব শেষ?
সবুজ দিন, শ্রান্তিহরা আকাশ নেই নেই —
সব শেষ?
ছাড়াই মাঠ, ছাড়াই হাট ধূসর পায়ে পায়ে
মিলছি ভূখ-মিছিলে গাঁয়ে গাঁয়ে,
কারখানায় অন্ধ, দিকভ্রান্ত, ভয় ভয়,
মনের দিকপ্রান্তে ঠিক সন্ধ্যা হয় হয়,
ভালোবাসার
ভীরু আশার
এই কি শেষ নয়?

কখন এরি মধ্যে সেই আশার হাতছানি —
তোমায় খুঁজি; এদিক-ওদিক চলছে কানাকানি।
কোথাও তুমি নেই-যে তাও জানি।
সেই তোমার সবুজ শাড়ি, কালো কাজল-চোখ
ছিঁড়ল টেনে সংগ্রামের সংঘাতের নখ।
সময় নেই, সময় নেই
কবে জানাই শোক।
তবু জানাই শোক।

হঠাৎ কালো হাওয়ায় তাই কিসের গুঞ্জন
যন্ত্রে যদি মেলাই হাত মেলায় হাত মন,
কিসের গুঞ্জন।
স্তব্ধ মেঘ লক্ষ বুকে হৃদয় দেয় শোধ।
যন্ত্রণায় যুদ্ধ। প্রতিরোধ।

আকাশভরা হাওয়ায় ঝরা-পাতার মর্মর—
কখন এল ঝড়?
শেষ রাত্রে মরুধূসর ঝড় এল।
তারপর হঠাৎ এলোমেলো।
হাওয়া, হাওয়ায় বৃষ্টি নামল।
তারপর কখন ভোরের চমক। বৃষ্টি থামল।

জানতুম। তুমি ঘোমটা-টানা ফুল রজনীগন্ধা,
লজ্জা-পাওয়া রাঙিয়ে-ওঠা সন্ধ্যা
নিতান্ত এক গাঁয়ের মেয়ে।
ধান ভানতে, জল আনতে
অজান্তে পথ বেয়ে।

সুখেই ছিলুম, এমন দিনে আকাল এল।
ঘর ছাড়লুম, জীবন কী যে দশায় পেল।
সঙ্গে তুমি। পথ হারালে
পা বাড়ালে
ঝড়ে।
রইল না কেউ ঘরে সুখের ঘরে।

তারপর সেই ঝড়ের হাওয়ায়
হঠাৎ - জাগা অন্ধকারে আবার দেখি তোমায়ঃ
পাগলা হাওয়ায় চুল উড়ছে
চুল ঘুরছে
জ্বালামুখীর সাপ —
চোখে তোমার প্রলয়-পীত তাপ —
তখন আবার ভাবলুম, একি তুমিই? তুমি সুখী তো নও।
প্রাণের মধ্যে আজও আদিম আগুন কি বও?
তাই কি ঝড়ের হাজার ফণায় আগুন জ্বলে?
তারপর সেই আগুন গলে চোখের জলে।
আমার মনের আবাদ ভরে বৃষ্টি ঝরে... সোনাও ফলে।

গান ধরলুম আয় বৃষ্টি ঝেঁপে।
ফিরব যখন ভাঙা বাসায় — দাওয়ায় মাটি লেপে
চাষ করব, গান ধরব, ধানও দেব মেপে।
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে।

তারপর কখন ভোর হয়েছে,
বৃষ্টি নেই, হাওয়ায় আলোর ঘোর রয়েছে।
উঠে বসলুম,
সুখে হাসলুম,
মনে ভাবলুম — এবার তুমি আসবে,
আবার ভালোবাসবে।
আবার আমি ঘর বাঁধব, মন সাধব জীর্ণ দেহে
জীবনকে ফের গড়ে তোলার গভীর স্নেহে।

সন্তোষকুমার ঘোষ

নিরাকাশ

কোথায় উঠবে ভেবে ভেবে সেদিন সন্ধ্যাতারাটা দিশাহারা। চেনা,
প্রতিদিনের জানা আকাশটাকে আর খুঁজে পায় না। গেল কোথায়?
এই তো গতকালও এখানেই ছিল। মেঘ-টেঘ উড়িয়ে দিয়ে একেবারে নিপাট
নীল। তারাটা শুনেছে, দিনের যৌবনে এই আকাশটাই একদম গনগনে হয়ে
থাকে। একটা কোনে একটু লালচে ছিট ছড়িয়ে পড়ে। তো, সেই বিকেলের
দিকে। এখন এই সন্ধ্যাবেলা সেই আকাশ গা-ঢাকা দিল কোথায়? এদিকে
তারাটার ফোটার সময় যে পেরিয়ে যায়! সে কাতর প্রার্থনা জানাতে থাকে,
সময়টুকু ফুরোবার আগেই তুমি ফিরে এসো, হে আকাশ, আমার আকাশ।
ঝিকমিক আলো ফেলে ফেলে তারাটা তাকে খোঁজে। নেই। কোথায়
অনেকখানি নীলচে বাষ্প জমেছে, তার আড়ালে কি লুকোলো আকাশটা?
তারাটা গন্ধ শোঁকে। নেই। অত বড় মস্ত একটা ঢাকনার আকার যার,
সে গা-ঢাকা দিলই বা কী করে, অবাক কাণ্ড। হার মানছি। ফিরে এসো তুমি।

তুমি নেই বলে দ্যাখো আকাশ, আজ রাত্তির হতে পারেনি, অথচ সব
অন্ধকার। কাল সকালেও দিনের পায়ের আওয়াজ বাজবে কোথায়, হলই বা
দশ দিক আলোয় আলো। দিন নেই, রাত নেই, এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার,
অদ্ভুতভাবে উধাও হয়ে গিয়ে ঘটাতে খালি তুমিই পারো।

মানছি তো, তুমি পারো, পারো পারো। এবার ফেরো। আকুল তারাটা বলতে থাকল,
জানি তোমার মায়া-দয়া নেই, তুমি খামখেয়ালী, নীলের নিচে
তুমি ভীষণ কালো। রোজ কত উল্কা ছুঁড়ে দাও খেলতে খেলতে, কত বুড়ো-
ধাড়ি তারাদেরও ঝরিয়ে দাও, তাদের শুকনো ফুলের মতো ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে
মারো। কোনোটাকে বা শেষ করো আঁতুড়েই। তোমার অঢেল তারা, তাই দু-
দশটা কেন, হাজার-দু'হাজার খসে পড়লেও কিচ্ছু যায় আসে না। কিন্তু
আমাদের — তারাদের- যে একটাই আকাশ। সেটাও হারিয়ে গেলে আমরা
কোথায় উঠব, কোথায় ফুটব, আর একটা আকাশ কোন্‌খানে, কখনও কি,
খুঁজে পাব?
নিরাশ, নিরাশ্রয় সন্ধ্যাতারা ভয়ে ভয়ে চোখ বোজে। তার গা-ঢালা
আলো গলে গলে পড়ে যায়, সে আস্তে আস্তে জোনাকির টিপের মতো ছোট্ট
হতে থাকে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
অমলকান্তি

অমলকান্তি আমার বন্ধু,
ইস্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়তাম।
রোজ দেরি করে ক্লাসে আসত, পড়া পারত না,
শব্দরূপ জিজ্ঞেস করলে
এমন অবাক হয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকত যে,
দেখে ভারী কষ্ট হত আমাদের।

আমরা কেউ মাস্টার হতে চেয়েছিলাম, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল।
অমলকান্তি সে-সব কিছু হতে চায়নি।
সে রোদ্দুর হতে চেয়েছিল।
ক্ষান্তবর্ষণ কাক-ডাকা বিকেলের সেই লাজুক রোদ্দুর,
জাম আর জামরুলের পাতায়
যা নাকি অল্প-একটু হাসির মতন লেগে থাকে।

আমরা কেউ মাস্টার হয়েছি, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল।
অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি।

সে এখন অন্ধকার একটা ছাপাখানায় কাজ করে।
মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে;
চা খায়, এটা-ওটা গল্প করে, তারপর বলে, "উঠি তাহলে।"
আমি ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

আমাদের মধ্যে যে এখন মাষ্টারি করে,
অনায়াসে সে ডাক্তার হতে পারত;
যে ডাক্তার হতে চেয়েছিল,
উকিল হলে তার এমন-কিছু ক্ষতি হত না।
অথচ, সকলেরই ইচ্ছে পূরণ হল, এক অমলকান্তি ছাড়া।
অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি।
সেই অমলকান্তি — রোদ্দুরের কথা ভাবতে ভাবতে
যে একদিন রোদ্দুর হতে চেয়েছিল।

উলঙ্গ রাজা

সবাই দেখছে যে, রাজা উলঙ্গ, তবুও
সবাই হাততালি দিচ্ছে।
সবাই চেঁচিয়ে বলছেঃ শাবাশ, শাবাশ!
কারও মনে সংস্কার, কারও ভয়;
কেউ বা নিজের বুদ্ধি অন্য মানুষের কাছে বন্ধক দিয়েছে;
কেউ বা পরান্নভোজী, কেউ
কৃপা প্রার্থী, উমেদার, প্রবঞ্চক;
কেউ ভাবছে, রাজবস্ত্র সত্যিই অতীব সূক্ষ্ম, চোখে
পড়ছে না যদিও, তবু আছে,
অন্তত থাকাটা কিছু অসম্ভব নয়।
গল্পটা সবাই জানে
কিন্তু সেই গল্পের ভিতরে
আপাদমস্তক ভিতু, ফন্দিবাজ অথবা নির্বোধ
স্তাবক ছিল না।
একটি শিশুও ছিল।
সত্যবাদী, সরল, সাহসী একটি শিশু। নেমেছে গল্পের রাজা বাস্তবের প্রকাশ্য
রাস্তায়। আবার হাততালি উঠছে মুহুর্মুহু;

জমে উঠছে
স্তাবকবৃন্দের ভিড়।
কিন্তু সেই শিশুকে আমি
ভিড়ের ভিতরে আজ কোথাও দেখছি না।

শিশুটি কোথায় গেল? কেউ কি কোথাও তাকে কোনো
পাহাড়ের গোপন গুহায়
লুকিয়ে রেখেছে?
নাকি সে পাথর-ঘাস-মাটি নিয়ে খেলতে খেলতে
ঘুমিয়ে পড়েছে —
কোনো দূর
নির্জন নদীর ধারে কিংবা কোনো প্রান্তরের গাছের ছায়ায়
যাও, তাকে যেমন করেই হোক
খুঁজে আনা।
সে এসে একবার এই উলঙ্গ রাজার সামনে
নির্ভয়ে দাঁড়াক।
জিজ্ঞাসা করুক ঃ
রাজা, তোর কাপড় কোথায়?

নিজের কাছে স্বীকারোক্তি

আমি পাহাড় থেকে পড়তে পড়তে
তোমাকে ধরে বেঁচে রয়েছি, কবিতা।
আমি পাতালে ডুবে মরতে মরতে
তোমাকে ধরে আবার ভেসে উঠেছি।
আমি রাজ্যজয় করে এসেও
তোমার কাছে নত হয়েছি, কবিতা।
আমি হাজার দরজা ভালবেসেও
তোমার বন্ধ দুয়ারে মাথা কুটেছি।

কখনও এর, কখনও ওর দখলে
গিয়েও ফিরি তোমারই টানে, কবিতা।
আমাকে নাকি ভীষণ জানে সকলে,
তোমার থেকে বেশি কে আর জানে কবিতা?

আমি   ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াই
            গোপন রাখি সকল শোক, কবিতা।
আমি   শ্মশানে ফুল ফোটাব তাই
            তোমার বুকে চেয়েছি ঢেউ রটাতে।
আমি   সকল সুখ মিথ্যে মানি
            তোমার সুখ পূর্ণ হোক কবিতা।
আমি   নিজের চোখ উপড়ে আনি
            তোমাকে দিই তোমার চোখ ফোটাতে।
তুমি   তৃপ্ত হও পূর্ণ হও
            জ্বালো ভূলোক জ্বালো দ্যুলোক কবিতা।

রাম বসু

পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে

অনেকক্ষণ বৃষ্টি থেমে গেছে
বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ,
ফুটো চাল থেকে আর জল গড়িয়ে পড়বে না,
খোকাকে শুইয়ে দাও।

খোকাকে শুইয়ে দাও
তোমার বুকের ওম্ থেকে নামিয়ে
ওই শুকনো জায়গাটায় শুইয়ে দাও,
গায়ে কাঁথাটা টেনে দাও
অনেকক্ষণ বৃষ্টি থেমে গেছে।

মেঘের পাশ দিয়ে কেমন সরু চাঁদ উঠেছে
তোমার ভুরুর মতো সরু চাঁদ
তোমার চুলের মতো কালো আকাশে,
বর্ষার ঘোলা জল মাঠ ছাপিয়ে নদীতে মিশে গেছে
কুমোরপাড়ার বাঁশের সাঁকোটা ভেঙে গেছে বোধ হয়
বোধহয় ভেসে গেছে জলের তোড়ে
অভাবের টানে যেমন আমাদের আনন্দ ভেসে যায়।

নলবনের ধার দিয়ে
পানবরজের পাশ দিয়ে
গঞ্জের স্টীমারের আলো —
আলো পড়েছে ঘোলা জলে
রামধনুর মতো
রামধনুর মতো এই রাত্তির বেলা।
ধানখেত ভাসিয়ে জল গড়ায় নদীতে
স্টীমারের তলায়
আমাদের অভাবের মতো
ঠিক আমাদের কপালের মতো।
আমাদের পেটে তো ভাত নেই
পরনে কাপড় নেই
খোকার মুখে দুধ তো নেই এক ফোঁটাও —
তবু কেন এই গঞ্জ হাসিতে উছলে ওঠে
তবু কেন এই স্টীমার শস্যেতে ভরে ওঠে
আমাদের অভাবের নদীর ওপর
কেন ওরা সব পাঁজরকে গুঁড়িয়ে যায়?

শোন, —
বাইরে এস
বাঁকের মুখে পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে
শোন, বাইরে এস,
ধান-বোঝাই নৌকো রাতারাতি পেরিয়ে যায় বুঝি
খোকাকে শুইয়ে দাও
বিন্দার বৌ শাঁখে ফুঁ দিয়েছে।

এবার আমরা ধান তুলে দিয়ে
মুখ বুজিয়ে মরবো না
এবার আমরা প্রাণ তুলে দিয়ে
অন্ধকারে কাঁদবো না
এবার আমরা তুলসীতলায়
মনকে বেঁধে রাখবো না।

বাঁকের মুখে কে যাও, কে?
লন্ঠনটা বাড়িয়ে দাও
লন্ঠনটা বাড়িয়ে দাও!
আমাদের হাঁকে রূপনারায়ণের স্রোত ফিরে যাক

আমাদের সড়কিতে কেউটে আঁধার ফর্সা হয়ে যাক
আমাদের হৃৎপিণ্ডের তাল দামামার মতো
ঝড়ের চেয়েও তীব্র আমাদের গতি।
শাসনের মুগুর মেরে আর কতকাল চুপ করিয়ে রাখবে?
এস
বাইরে এস —
আমরা হেরে যাবো না
আমরা মরে যাবো না
আমরা ভেসে যাবো না
নিঃস্বতার সমুদ্রে একটা দ্বীপের মতো আমাদের বিদ্রোহ
আমাদের বিদ্রোহ মৃত্যুর বিভীষিকার বিরুদ্ধে —

এস বাইরে এস
আমার হাত ধর
পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে।

সুকান্ত ভট্টাচার্য
প্রার্থী

হে সূর্য! শীতের সূর্য!
হিমশীতল সুদীর্ঘ রাত তোমার প্রতীক্ষায়
আমরা থাকি,
যেমন প্রতীক্ষা ক'রে থাকে কৃষকদের চঞ্চল চোখ,
ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলির জন্যে।

হে সূর্য, তুমি তো জানো,
আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব!
সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে,
এক-টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে,
কত কষ্টে আমরা শীত আটকাই!

সকালের এক-টুকরো রোদ্দুর —
এক টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামী।

ঘর ছেড়ে আমরা এদিক-ওদিক যাই —
এক-টুকরো রোদ্দুরের তৃষ্ণায়।

হে সূর্য !
তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
উপর আর আলো দিও,
আর উত্তাপ দিও,
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
হে সূর্য!
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও —
শুনেছি, তুমি এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড,
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে
পরিণত হব!
তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা,
তখন হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারবো
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
আজ কিন্তু আমরা তোমার অকৃপণ উত্তাপের প্রার্থী।

বোধন

হে মহামানব, একবার এসো ফিরে
শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরের ভিড়ে,
এখানে মৃত্যু হানা দেয় বারবার;
লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার।
এই যে আকাশ, দিগন্ত, মাঠ স্বপ্নে সবুজ মাটি
নীরবে মৃত্যু গেড়েছে এখানে ঘাঁটি ;
কোথাও নেইকো পার
মারী ও মড়ক, মন্বন্তর, ঘন ঘন বন্যার
আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন ভাঙা নৌকার পাল,
এখানে চরম দুঃখ কেটেছে সর্বনাশের খাল,
ভাঙা ঘর, ফাঁকা ভিটেতে জমেছে নির্জনতার কালো,
হে মহামানব, এখানে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো।

ব্যাহত জীবনযাত্রা, চুপি চুপি কান্না বও বুকে,
হে নীড়-বিহারী সঙ্গী! আজ শুধু মনে মনে ধুকে
ভেবেছ সংসারসিন্ধু কোনোমতে হয়ে যাবে পার
পায়ে পায়ে বাধা ঠেলে। তবু আজো বিস্ময় আমার —
ধূর্ত, প্রবঞ্চক যারা কেড়েছে মুখের শেষ গ্রাস
তাদের করেছ ক্ষমা, ডেকেছো নিজের সর্বনাশ।
তোমার ক্ষেতের শস্য
চুরি ক'রে যারা গুপ্তকক্ষতে জমায়
তাদেরি দুপায়ে প্রাণ ঢেলে দিলে দুঃসহ ক্ষমায়;
লোভের পাপের দুর্গ গম্বুজ ও প্রাসাদে মিনারে
তুমি যে পেতেছ হাত; আজ মাথা ঠুকে বারে বারে
অভিশাপ দাও যদি, বারংবার হবে তা নিষ্ফল —
তোমার অন্যায়ে জেনো এ অন্যায় হয়েছে প্রবল।
তুমি তো প্রহর গোনো,
তারা মুদ্রা গোনে কোটি কোটি,
তাদের ভাণ্ডার পূর্ণ; শূন্য মাঠে কঙ্কাল-করোটি
তোমাকে বিদ্রূপ করে, হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকে—
কুজ্ঝটি তোমার চোখে, তুমি ঘুরে ফেরো দুর্বিপাকে।

পৃথিবী উদাস, শোনো হে দুনিয়াদার!
সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু-কালো পাহাড়
দগ্ধ হৃদয়ে যদিও ফেরাও ঘাড়
সামনে পেছনে কোথাও পাবে না পার;
কি করে খুলবে মৃত্যু- ঠেকানো দ্বার—
এই মুহূর্তে জবাব দেবে কি তার?

লক্ষ লক্ষ প্রাণের দাম
অনেক দিয়েছি; উজাড় গ্রাম।
সুদ ও আসলে আজকে তাই
যুদ্ধ শেষের প্রাপ্য চাই।

কৃপণ পৃথিবী, লোভের অস্ত্র
দিয়ে কেড়ে নেয় অন্নবস্ত্র,
লোলুপ রসনা মেলা পৃথিবীতে
বাড়াও ও-হাত তাকে ছিঁড়ে নিতে।

লোভের মাথায় পদাঘাত হানো—
আনো, রক্তে ভাগীরথী আনো।
দৈত্যরাজের যত অনুচর
মৃত্যুর ফাঁদ পাতে পর পর;
মেলো চোখ আজ ভাঙো সে ফাঁদ —
হাঁকো দিকে দিকে সিংহনাদ।
তোমার ফসল, তোমার মাটি
তাদের জীয়ন ও মরণকাঠি
তোমার চেতনা চালিত হাতে।
এখনও কাঁপবে আশঙ্কাতে?
স্বদেশপ্রেমের ব্যাঙ্গমা পাখি
মারণমন্ত্র বলে, শোনো তা কি?
এখনো কি তুমি আমি স্বতন্ত্র?
করো আবৃত্তি, হাঁকো সে মন্ত্র ঃ
শোন্ রে মালিক, শোন্ রে মজুতদার!
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড় —
হিসাব কি দিবি তার?

প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলতে পারি?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজনহারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।

শোন্ রে মজুতদার,
ফসল ফলানো মাটিতে রোপণ
করব তোকে এবার।

তারপর বহুশত যুগ পরে
ভবিষ্যতের কোনো যাদুঘরে
নৃতত্ত্ববিদ হয়রান হয়ে মুছবে কপাল তার,
মজুতদার ও মানুষের হাড়ে মিল খুঁজে পাওয়া ভার।
তেরোশো সালের মধ্যবর্তী মালিক, মজুতদার

মানুষ ছিল কি? জবাব মেলে না তার।

আজ তার বিমূঢ় আস্ফালন নয়,
দিগন্তে প্রত্যাসন্ন সর্বনাশের ঝড়;
আজকের নৈঃশব্দ্য হোক যুদ্ধারম্ভের স্বীকৃতি।
দুহাতে বাজাও প্রতিশোধের উন্মত্ত দামামা,
প্রার্থনা করো ঃ
হে জীবন, হে যুগ-সন্ধিকালের চেতনা—
আজকে শক্তি দাও, যুগ যুগ বাঞ্ছিত দুদর্মনীয় শক্তি,
প্রাণে আর মনে দাও শীতের শেষের
তুষার-গলানো উত্তাপ।
টুকরো টুকরো ক'রে ছেঁড়ো তোমার
অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী।
শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।

তা যদি না হয় মাথার উপরে ভয়ঙ্কর
বিপদ নামুক, ঝড়ে বন্যায় ভাঙুক ঘর;
তা যদি না হয়, বুঝবো তুমি তো মানুষ নও —
গোপনে গোপনে দেশদ্রোহীর পতাকা বও।
ভারতবর্ষ মাটি দেয়নিকো, দেয় নি জল
দেয় নি তোমার মুখেতে অন্ন, বাহুতে বল
পূর্ব পুরুষ অনুপস্থিত রক্তে, তাই
ভারতবর্ষে আজকে তোমার নেইকো ঠাঁই।।

প্রিয়তমাসু

সীমান্তে আজ আমি প্রহরী।
অনেক রক্তাক্ত পথ অতিক্রম ক'রে
আজ এখানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছি —
স্বদেশের সীমানায়।
ধূসর তিউনিসিয়া থেকে স্নিগ্ধ ইতালী ,
স্নিগ্ধ ইতালী থেকে ছুটে গেছি বিপ্লবী ফ্রান্সে

নক্ষত্র নিয়ন্ত্রিত নিয়তির মতো
দুর্নিবার, অপরাহত রাইফেল হাতেঃ
— ফ্রান্স থেকে প্রতিবেশী বার্মাতেও।

আজ দেহে আমার সৈনিকের কড়া পোশাক,
হাতে এখন দুর্জয় রাইফেল,
রক্তে রক্তে তরঙ্গিত জয়ের আর শক্তির দুর্বহ দম্ভ,
আজ এখন সীমান্তের প্রহরী আমি।
আজ নীল আকাশ আমাকে পাঠিয়েছে নিমন্ত্রন
স্বদেশের হাওয়া বয়ে এনেছে অনুরোধ,
চোখের সামনে খুলে ধরেছে সবুজ চিঠি ঃ
কিছুতেই বুঝি না কী করে এড়াব তাকে?
কী ক'রে এড়াব এই সৈনিকের কড়া পোশাক?
যুদ্ধ শেষ। মাঠে মাঠে প্রসারিত শান্তি,
চোখে এসে লাগছে তারই শীতল হাওয়া,
প্রতি মুহূর্তে শ্লথ হয়ে আসে হাতের রাইফেল
গা থেকে খসে পড়তে চায় এই কড়া পোশাক,
রাতে চাঁদ ওঠে ঃ আমার চোখে ঘুম নেই।
তোমাকে ভেবেছি কতদিন,
কত শত্রুর পদক্ষেপ শোনার প্রতীক্ষার অবসরে,
কত গোলা ফাটার মুহূর্তে।
কতবার অবাধ্য হয়েছে মন, যুদ্ধজয়ের ফাঁকে ফাঁকে
কতবার হৃদয় জ্বলেছে অনুশোচনার অঙ্গারে
তোমার আর তোমাদের ভাবনায়।
তোমাকে ফেলে এসেছি দারিদ্রের মধ্যে
ছুঁড়ে দিয়েছি দুর্ভিক্ষের আগুনে,
ঝড়ে আর বন্যায়, মারী আর মড়কের দুঃসহ আঘাতে
বার বার বিপন্ন হয়েছে তোমাদের অস্তিত্ব।
আর আমি ছুটে গেছি এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আর এক যুদ্ধক্ষেত্রে।
জানি না আজো, আছ কি নেই,
দুর্ভিক্ষে ফাঁকা আর বন্যায় তলিয়ে গেছে কিনা ভিটে
জানি না তাও।

তবু লিখছি তোমাকে আজ ঃ লিখছি আত্মম্ভর আশায়।
ঘরে ফেরার সময় এসে গেছে।
জানি, আমার জন্যে কেউ প্রতীক্ষা ক'রে নেই

মালায় আর পতাকায়, প্রদীপে আর মঙ্গল ঘটে;
জানি, সম্বর্ধনা রটবে না লোক মুখে,
মিলিত খুশিতে মিলবে না বীরত্বের পুরষ্কার।
তবু, একটি হৃদয় নেচে উঠবে আমার আর্বিভাবে
সে তোমার হৃদয়।

যুদ্ধ চাই না আর, যুদ্ধ তো থেমে গেছে ঃ
পদার্পণ করতে চায় না মন ইন্দোনেশিয়ায়।
আর সামনে নয়,
এবার পেছন ফেরার পালা।

পরের জন্যে যুদ্ধ করেছি অনেক,
এবার যুদ্ধ তোমার আর আমার জন্যে।
প্রশ্ন করো যদি এত যুদ্ধ ক'রে পেলাম কী? উত্তর তার —
তিউনেসিয়ায় পেয়েছি জয়
ইতালীতে জনগনের বন্ধুত্ব,
ফ্রান্সে পেয়েছি মুক্তি মন্ত্র;
আর নিষ্কন্টক বার্মায় পেলাম ঘরে ফেরার তাগাদা।
আমি যেন সেই বাতিওয়ালা
যে সন্ধ্যায় রাজপথে পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে
অথচ নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালার সামর্থ্য,
নিজের ঘরে জমে থাকে দুঃসহ অন্ধকার।।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক
প্রদর্শনী

পূর্ব-তোরণ খুলে দিয়েছি, বন্ধুগন,
আপনারা যে যার পোশাক পড়ে এগিয়ে আসুন ধীরে ধীরে,
অনেকদিনের প্রয়াসের ফল আমার এই প্রদর্শনী।

সামনের দরজাটা এখন ঝুঁকে পড়েছে বাঁদিকে, একটু টালমাটাল আর কি।
বাঁশের খুটি লাগিয়েছি স্বদেশী শিল্পের খাতিরে, বন্ধুগণ,
ভেতরে ঢুকলে দেখতে পাবেন, সরল স্নিগ্ধ ছায়ার এলোমেলো মাতলামি,

কম্পমান ফুলের গাছ থেকে মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে
প্রাচীনতম লেবুবনের দিকে।
ইচ্ছে ছিল, ভোর ভোর একটা বৈদ্যুতিক আলোর বাল্‌ব
ঝুলিয়ে দেব মাঝখানে। সেটা হল না।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার প্রয়োজনে
এখানে একটু কুয়াশা সৃষ্টি করেছি বাধা হয়ে।

সীমান্তের প্রাচীর ঘেষে আপনারা এগিয়ে আসুন
ক্রমশঃ ভেতরের দিকে।
বন্ধুগণ, এখানে একটু সাবধান হওয়া দরকার।
কয়েকটি স্বদেশী কুকুর পাহারা দিচ্ছে পিতামহের স্মৃতিস্তম্ভ,
পাশেই অনন্ত ও ভবিষ্যৎকালের প্রতীকস্বরূপ
কয়েকটি মৃতদেহ দেখতে পাবেন
সুদৃশ্য কাচের ভেতর।
আজকের প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ এই মাঝের মহল।

এবার একটু বাঁয়ে যেতে হবে, বন্ধুগণ, এবার একটু বাঁয়ে।
চেয়ে দেখুন, প্রেমিকের মতো মুখ করে
একজন যুবক দাঁড়িয়ে আছে ছোড়া হাতে,
সুন্দর বনের বাঘের মতো ভয়ঙ্কর সুন্দর তার মুখ,
চোখে আশ্চর্য দীপ্তি, গায়ে আরণ্যক গন্ধ,
ভেবে দেখুন, আপনরা এগোবেন কি না, এখনো সময় আছে।
এ দৃশ্য দেখতে ভারি ভয় করছে আমার,
ভারি ভয় করছে.....
ভারি ভয়......
তাহলে এদিকে আসুন, বন্ধুগণ, খানিকটা স্মৃতিচারি হোন,
একজন কিশোর এখন সাঁতার কাটছে অম্লান জলে, চেয়ে দেখুন,
সাঁতার কাটতে কাটতে সে চলে যাচ্ছে
জঙ্গলের ভেতর, তার বয়স বেড়ে যাচ্ছে,
আর সেই বয়সের নিদারুণ উত্তেজনায় ও ভয়ে
সে কেবল দৌড়চ্ছে আর দৌড়চ্ছে
এক জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আরেক জঙ্গলের ভেতর।
এ পথ দিয়েই আপাতত প্রদর্শনীর শেষতম রাস্তাটি খুঁজে নিতে হবে
একান্ত সাবধানে। নাহলে
আপনারা আটকে পড়বেন এক রহস্যময় মায়াজালের ভেতর।

দেখুন, ঐ যে বৃদ্ধ যাদুকর এবং তাঁর স্ত্রী
একজন যুবককে পোষ মানাচ্ছেন রূপকথার গল্প শুনিয়ে —
সে দোষ কার? লোভের ফাঁদে পা দিচ্ছে কে? ঐ যুবক
আপাতত রাজকুমারীর স্বপ্ন দেখবে কিছুকাল, তারপর
অপূর্ব এক ধুসর সূর্যালোকে বৃত্তের ভেতরে বৃত্ত তৈরি করবে,
বৃত্তের ভেতরে বৃত্ত —
কিন্তু বাইরে বেরুবার পথ খুজে পাবে না কোনোদিন।
একেকটি বৃত্তের ভেতর বসে সে পিতা হবে, পিতামহ হবে।
আপাতত প্রেমে, ঘৃণায়, কর্তব্যবোধে তার হৃদয় আচ্ছন্ন!

আপনারা কি সবাই এই মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়তে চান ?
কে চান না? চলে যান ঐ নিচু প্রাচীরের কাছে,
সাবধান! যমদুতের মতো ওখানে আছে কয়েকটি পাহারাদার।
ওদের চোখ এড়িয়ে ঐ প্রাচীর ডিঙোতে হবে আপনাদের।
তারপর দৌড়ে চলে যেতে হবে সামনের বিশাল প্রান্তরে।
ওখানে গৃহস্থের প্রবেশ নিষেধ ।

এই প্রদর্শনী থেকে বাইরে যাওয়ার ওটাই একমাত্র রাস্তা।

শামসুর রাহমান

কখনো আমার মাকে

কখনো আমার মাকে কোনো গান গাইতে শুনিনি।
সেই কবে শিশু রাতে ঘুম পাড়ানিয়া গান গেয়ে
আমাকে কখনো ঘুম পাড়াতেন কিনা আজ মনে পড়ে না।

যখন শরীরে তার বসন্তের সম্ভার আসেনি,
যখন ছিলেন তিনি ঝড়ে আম কুড়িয়ে বেড়ানো
বয়সের কাছাকাছি হয়তো তখনো কোনো গান
লতিয়ে ওঠেনি মীড়ে মীড়ে দুপুরে সন্ধ্যায়,
পাছে গুরুজনদের কানে যায়। এবং স্বামীর
সংসারে এসেও মা আমার সারাক্ষণ
ছিলেন নিশ্চুপ বড়ো, বড়ো বেশি নেপথ্যচারিণী।

যতদূর জানা আছে, টপ্‌পা কি খেয়াল তাঁকে করেনি দখল
কোনোদিন। মাছ কোটা কিংবা হলুদ বাটার ফাঁকে
অথবা বিকেলবেলা নিকিয়ে উঠোন
ধুয়ে মুছে বাসন-কোসন
সেলাইয়ের কলে ঝুঁকে, আলনায় ঝুলিয়ে কাপড়,
ছেঁড়া শার্টে রিফু কর্মে মেতে
আমাকে খেলার মাঠে পাঠিয়ে আদরে
অবসরে চুল বাঁধবার ছলে কোনো গান গেয়েছেন কিনা
এতকাল কাছাকাছি আছি তবু জানতে পারিনি।

যেন তিনি সব গান দুঃখ-জাগানিয়া কোনো কাঠের সিন্দুকে
রেখেছেন বন্ধ ক'রে আজীবন, এখন তাদের
গ্রন্থিল শরীর থেকে কালেভদ্রে সুর নয়, শুধু
ন্যাপথলিনের তীব্র ঘ্রাণ ভেসে আসে।

বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা

নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সত্তায়।
মমতা নামের প্লুত এদেশের শ্যামলিমা তোমাকে নিবিড়
ঘিরে রয় সর্বদাই। কালো রাত পোহানোর পরের প্রহরে
শিউলি-শৈশবে 'পাখি সব করে রব' ব'লে মদনমোহন
তর্কালঙ্কার কী ধীরোদাত্ত স্বরে প্রত্যহ দিতো ডাক। তুমি আর আমি,
অবিচ্ছিন্ন, পরস্পর মমতায় নীল,
ঘুরেছি কাননে তাঁর নেচে নেচে, যেখানে কুসুম-কলি সবই ফোটে,
জোটে অলি ঋতুর সংকেতে
আজন্ম আমার সাথী তুমি,
আমাকে স্বপ্নের সেতু দিয়েছিলে গড়ে পলে পলে,
তাইতো ত্রিলোক আজ সুনন্দ জাহাজ হয়ে ভেড়ে
আমারই বন্দরে।
গলিত কাচের মতো জলে ফাতনা দেখে দেখে রঙিন মাছের
আশায় চিকন ছিপ ধ'রে গেছে বেলা। মনে পড়ে, কাঁচি দিয়ে
নক্সা কাটা কাগজ এবং বোতলের ছিপি ফেলে
সেই কবে আমি 'হাসিখুশি'র খেয়া বেয়ে

পৌঁছে গেছি রত্নদীপে কম্পাস বিহনে।।

তুমি আসো আমার ঘুমের বাগানেও

সে কোন্ বিশাল

গাছের কোটর থেকে লাফাতে লাফাতে নেমে আসো

আসো কাঠবিড়ালীর রূপে,

ফুল্ল, মেঘমালা থেকে চকিতে ঝাঁপিয়ে পড়ো ঐরাবত সেজে,

সুদূর পাঠশালার একান্নটি সতত সবুজ

মুখের মতোই দুলে দুলে ওঠো তুমি

বারবার কিংবা টুকটুকে লঙ্কা-ঠোঁট টিয়ে হ'য়ে

কেমন দুলিয়ে দাও স্বপ্নময়তার চৈতন্যের দাঁড়।

আমার এ অক্ষি গোলকের মধ্যে তুমি আঁখিতারা।

যুদ্ধের আগুনে,

মারীর তাণ্ডবে,

প্রবল বর্ষায়

কি অনাবৃষ্টিতে

বারবনিতার

নূপুর নিক্বণে,

বনিতার শান্ত

বাহুর বন্ধনে

ঘৃণায় ধিক্কারে

নৈরাজ্যের এলো —

পাথারি চীৎকারে,

সৃষ্টির ফাল্গুনে

হে আমার আঁখিতারা তুমি উন্মীলিত সর্বক্ষণ জাগরণে।

তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কী থাকে আমার?

উনিশ শ বাহান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি

বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহীয়সী।

সে ফুলের একটি পাপড়িও ছিন্ন হ'লে আমার সত্তার দিকে

কতো নোংরা হাতের হিংস্রতা ধেয়ে আসে।

এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি-খেউয়ের পৌষমাস!

তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো,

বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।

শঙ্খ ঘোষ

বাবুমশাই

সে ছিল একদিন আমাদের যৌবনে কলকাতা!
বেঁচে ছিলাম বলেই সবার কিনেছিলাম মাথা
আর তাছাড়া ভাই
আর তাছাড়া ভাই আমরা সবাই জেনেছিলাম হবে
নতুন সমাজ, চোখের সামনে বিপ্লবে বিপ্লবে
যাবে খোল-নলিচা
যাবে খোল-নলিচা পালটে, বিচার করবে নীচুজনে'
কিন্তু সেদিন খুব কাছে নয় জানেন সেটা মনে
মিত্র বাবুমশয়
মিত্র বাবুমশয় বিষয়-আশয় বাড়িয়ে যান তাই,
মাঝেমধ্যে ভাবেন তাদের নুন আনতে পান্তাই
নিত্য ফুরোয় যাদের
নিত্য ফুরোয় যাদের সাধ-আহ্লাদের শেষ তলানিটুকু
চিরটাকাল রাখবে তাদের পায়ের তলার কুকুর
সেটা হয় না বাবা
সেটা হয় না বাবা' বলেই থাবা বাড়ান যতেক বাবু
কার ভাগে কী কম পড়ে যায় ভাবতে থাকেন ভাবুক
অম্‌নি দু'চোখ বেয়ে
অম্‌নি দু'চোখ বেয়ে অলপ্পেয়ে ঝরে জলের ধারা,
বলেন বাবু 'হা, বিপ্লবের সব মাটি সাহারা'
কুমীর কাঁদতে থাকে
কুমীর কাঁদতে থাকে 'আয় আমাকে নামা নামা' বলে
কিন্তু বাপু আর যাব না চরাতে-জঙ্গলে
আমরা ঢের বুঝেছি
আমরা ঢের বুঝেছি, বেঁদীপেঁচী নামের এসব আদর
সামনে গেলেই ভরবে মুখে, প্রাণ ভরে তাই সাধো
তুমি সে-বন্ধু না
তুমি সে-বন্ধু না, যে-ধূপধুনা জ্বলে হাজার চোখে
দেখতে পাবে তাকে, সে কি যেমন-তেমন লোকে
তাই সব অমাত্য
তাই সব অমাত্য, পাত্র মিত্র এই বিলাপে খুশি
'শুঁড়িখানাই কেবল সত্য, আর তো সবই ভূষি

ছি ছি   হায় বেচারা'

ছি ছি   হায় বেচারা? শুনুন যাঁরা মস্ত পরিব্রতা
             এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা

হেঁটে   দেখতে শিখুন

হেঁটে   দেখতে শিখুন ঝরছে কী খুন দিনের রাতের মাথায়
             আর একটা কলকাতায় সাহেব আর একটা কলকাতায়

সাহেব   বাবুমশয়।

যমুনাবতী

One more unfortunate
        Weary of breath
Rashly importunate
        Gone to her death
                - Thomas Hood

নিভন্ত এই চুল্লীতে মা
        একটু আগুন দে
আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি
        বাঁচার আনন্দে।
নোটন নোটন পায়রাগুলি
        খাঁচাতে বন্দী
দুই এক মুঠো ভাত পেলে তা
        ওড়াতে মন দি'।
                হায় তোকে ভাত দিই   কী করে যে ভাত দিই হায়
                হায় তোকে ভাত দেব   কী দিয়ে যে ভাত দেব হায়
নিভন্ত এই চুল্লী তবে
                একটু আগুন দে—
হাড়ের শিরা শিখার মাতন
                মরার আনন্দে!

দুইপারে দুই রুই কাৎলার
মারণী ফন্দী
বাঁচার আশায় হাত-হাতিয়ার
মৃত্যুতে মন দি'।।
বর্গী না টর্গী না, যমকে কে সামলায়!
ধার-চকচকে থাবা দেখছো না হামলায়?
যাস্‌নে ও-হামলায়, যাস্‌নে।
কান্না-কন্যার মায়ের ধমনীতে আকুল ঢেউ তোলে, জ্বলে না—
মায়ের কান্নায় মেয়ের রক্তের উষ্ণ হাহাকার মরে না —
চলল মেয়ে রণে চলল!
বাজে না ডম্বরু, অস্ত্র ঝন্‌ঝন্‌ করে না, জানল না কেউ তা
চলল মেয়ে রণে চলল।
পেশীর দৃঢ় ব্যথা, মুঠোর দৃঢ় কথা, চোখের দৃঢ় জ্বালা সঙ্গে
চলল মেয়ে রণে চলল!
নেকড়ে-ওজরে মৃত্যু এল
মৃত্যুরই গান গা —
মায়ের চোখে বাপের চোখে
দু-তিনটে গঙ্গা।
দূর্বাতে তার রক্ত লেগে
সহস্র সঙ্গী
জাগে ধক্‌ ধক্‌, যজ্ঞে ঢালে
সহস্র মণ ঘি!
যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনায় বিয়ে
যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে
বিষের টোপর নিয়ে।।
যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে
দিয়েছে পথ, গিয়ে।
নিভন্ত এই চুল্লীতে বোন আগুন ফলেছে।

সহজ পাঠ

এমনিতে বেশ, দিব্যি ভালো
সৌজন্যেও কম্‌তি নেই —
তেমন-তেমন সময় হলেই
দাঁতনখ সব বেরিয়ে আসে।

কৃতজ্ঞতা? পুঁথির কথা
ধর্ম সাক্ষী সুড়ঙ্গের।
বিনিময়ের হিসেব ছাড়া
এক কড়িও মূল্য নেই।

এই যে বুকের খুবলেনেওয়া
শুনতে চাও কি, কখন হলো?
সে এক মস্ত গল্পকথা
সাত সমুদ্র তেরো নদীর!

অর্থাৎ সেই জলস্রোত ও
ক্ষতের ওপর ঝরত যদি
দাহ কিছুই কমত না তার
জলই হতো তুষের আগুন।

কিন্তু নখর চিহ্ন? সে তো
থাকেই। খুবই দুঃখ হলো?
বাঁচো, প্রবল বাঁচো, কেবল
মা ফলেষু কদাচন!

কবিতা সিংহ
দেবব্রত বিশ্বাস

দেবব্রত বিশ্বাস!
আপনার সঙ্গে কবে আমার প্রথম চেনা হ'ল
কবে?
যেদিন ভীষণ দুঃখের ভিতর
এক রৌদ্রহীন বর্ণহীন ভোরে

বিনিদ্র রাত্রির পর জেগে উঠে
মনে হ'ল
কোনো মানে নেই —
কোনো অর্থ নেই বেঁচে থাকার
পৃথিবীতে আলো নেই হাসি নেই বন্ধুতা নেই
সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র চোখে
যে অন্ধকারের পাথরে মাথা খুঁড়েছি —
নখ দিয়ে ছিঁড়তে চেয়েছি যে গাঢ় কালো
সকালের সমস্ত গায়ে
তারই শুকনো ছড়, কালশিটে রক্তের দাগ
লেগে আছে
আমি ঈশ্বরহীন
ব্রতহীন
বিশ্বাসহীন এক অচ্ছুত মানুষ
আমি চূর্ণবিচূর্ণ
বড় একা
তখন ভাঙা ট্রানজিসটারে
পুরোনো ব্যাটারীর অসহযোগিতা সত্ত্বেও
একটি সুর
একটি মূর্ছনা
কিছু বাণী
আমার কাছে পৌঁছেছিল
যেভাবে ফাঁসির সেলে পৌঁছোয় আলোর একটি কিরণ
বাতাসের একটি তরঙ্গ
যেভাবে ক্ষুধার্তের কাছে পৌঁছোয়
রুটির প্রথম টুকরো
তৃষ্ণা-ফাটা মানুষের কাছে
জল পাত্র —
আমি কতবার শুনেছি, কতবার!
কিন্তু সেদিন
সেই হতাশার দীর্ঘ অন্ধকার গুহায় একা
শুনলাম
বুঝলাম
দেখতে পেলাম
আকাশ, সমস্ত আকাশ কী ভাবে খচিত হয়ে যাচ্ছে

সূর্য তারায়
দেখতে পেলাম অজস্র তারকা কণার খচিত —
নীহারিকা পুঞ্জ
ঘুরে উঠেছে আকাশ পারেরও মহাকাশে
ছিটিয়ে দিচ্ছে অজস্র নতুন তারা, নতুন প্রান
নতু নতুন ভুবন
দেখতে পেলাম সমস্ত প্রপঞ্চ জুড়ে পুঞ্জে পুঞ্জে
স্তরে স্তরে বিথরে সজ্জিত —
প্রাণ, প্রাণ, বিশ্বভরা প্রাণপুঞ্জ
আমার বিবর্ণ সকালের
পাংশু পাথর থেকে
করুণা গড়িয়ে পড়ল
আমি দেখলাম আমার বেদনা বদলে যাচ্ছে আনন্দে
আমার দুঃখ মথিত ক'রে উঠছে বিপুল সুখ
আমার কান্না থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে হাসির হীরকদীপ্তি
ভিতর ভিতর —
যন্ত্রণা কারুকার্যে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে
সুন্দর করে দিচ্ছে আমার অভ্যন্তর—
জীবনকে
যেভাবে পেয়েছি সেভাবেই তো নিতে হবে
নেবো!
এই বেরঙা ভোরকে ভেঙে তুলে আনবো
সাত রঙের আলো
এই অন্ধকারের নদীতেই ভাসিয়ে দেব
ভালোবাসার মান্দাস
যারা আমাকে এত যন্ত্রনা দিয়েছে আমি তাদের দিকেই
ছুটে যাবো
যে-সুর আমাকে দেখিয়েছে
যে-সুর অন্ধকার থেকে দৌড় করিয়ে নিয়ে গেছে
আমায় আলোর দিকে, মানুষের দিকে,
সে-সুর বিস্ময়ে জাগিয়ে দিয়েছে আমার প্রাণ
সেই সুরই আমাকে সেই ভোরে
সেই বিবর্ণ অপমানক্লান্ত সকালে
একে একে
ফিরিয়ে দিয়েছিল আমার আরাধ্য আমার দেবতা

আমার কর্ম — আমার ব্রত
আমার সম্বল — আমার বিশ্বাস।
দেবব্রত বিশ্বাস
সেইদিন থেকেই আপনার সঙ্গে আমার চেনা।
একদিন যখন পৃথিবী পেরিয়ে যাবে অনেকগুলো
সংক্রান্তি —
যেদিন এই সময়ের হাহুতাশ ঘূর্ণি
ঈর্ষার ধূম অহমিকার মালিন্য ধুয়ে যাবে
অপমানের বর্শায় জমবে মরচে
সমালোচনার নিউজপ্রিন্ট যাবে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে
যেদিন আপনি মিশবেন ধূলায়
সেদিনও
সেদিনও, দেবব্রত বিশ্বাস,
এক বিবর্ণ ভোরে
মরবার ইচ্ছে নিয়ে জেগে উঠবে একটি মানুষ
প্রেমহীন প্রীতিহীন বন্ধুবিহীন এক দুঃসময়ে
আর তার সেই অন্ধ গুহায়
একটি কিরণ —
একটু হাওয়া
একপাত্র জল
একটুকরো রুটির মতো —
ছুটে আসবে আপনার সুর
আপনার কণ্ঠ
আপনার মূর্ছনা —
ধ'রে ফেলবে তার শিরা ছিন্ন করতে যাওয়া হত্যার হাত
বলবে, বাঁচো বাঁচো
দেখছ না আমি এত সয়ে এত যন্ত্রণা পেয়েও
কীভাবে বেঁচে আছি?
দেখছ না?
আকাশভরা সূর্যতারা — বিশ্বভরা প্রাণ —
সেইদিন মানুষ জানবে
যিনি গানের ভিতর দিয়ে ছবি আঁকতে পারেন
ছবির ফ্রেম ফাটিয়ে নিয়ে যেতে পারেন
দর্শনের গভীর জগতে
জীবিতকালেই যিনি উপকথার আশ্চর্য সম্রাট
তাঁর নাম ছিল —
তাঁর নাম আবহমান দেবব্রত বিশ্বাস।।

পূর্ণেন্দু পত্রী

সোনার মেডেল

বাবুমশাইরা
গাঁ-গেরাম থেকে ধুলোমাটি ঘস্‌টে ঘস্‌টে
আপনাদের কাছে এয়েছি।
কি চাক্‌চিকান শহর বানিয়েছেন গো বাবুরা।
রোদ পড়লে জোছনা লাগলে মনে হয়
কাল কেউটের গা থেকে খসে পড়া
রূপোর তৈরী একখান্‌ লম্বা খোলস্‌।
মনের উনোনে ভাতের হাঁড়ি হাঁ হয়ে আছে খিদেয়
চাল ডাল তরিতরকারি শাকপাতা কিছু নেই
কিন্তু জল ফুটছে টগবগিয়ে।

বাবুমশাইরা,
লোকে বলেছিল, ভালুকের নাচ দেখালে
আপনারা নাকি পয়সা দেন।
যখন যেমন বললেন, নেচে নেচে হদ্দ।
পয়সা দিবেন নি?
লোকে বলেছিলো ভানুমতীর খেল দেখালে
আপনারা নাকি সোনার ম্যাডেল দেন।
নিজের করাতে নিজেকে দুখান করে
আবার জুড়ে দেখালুম,
আকাশ থেকে সোনালি পাখির ডিম পেড়ে
আপনাদের ভেজে খাওয়ালুম গরম ওমলেট
বাঁজা গাছে বানিয়ে দিলুম ফুলের ঘুঙুর!
সোনার ম্যাডেল দিবেন নি?

বাবুমশাইরা
সেই ল্যাংটো বেলা থেকে বড় শখ
ঘরে ফিরবো বুকে সোনার ম্যাডেল টাঙিয়ে।
আর বৌ-বাচ্চাদের মুখে
ফাটা কাপাসতুলোর হাসি ফুটিয়ে বলবো —
দেখিস। আমি মারা গেলে
আমার গা থেকে গজাবে
চন্দনগন্ধের বন।
সোনার ম্যাডেল দিবেন নি?

সরোদ বাজাতে জানলে

আমার এমন কিছু দুঃখ আছে যার নাম তিলক কামোদ
এমন কিছু স্মৃতি যা সিন্ধুভৈরবী
জয়জয়ন্তীর মত বহু ক্ষত রয়ে গেছে ভিতর দেয়ালে
কিছু কিছু অভিমান
ইমনকল্যান।
সরোদ বাজাতে জানলে বড় ভাল হতো,
পুরুষ কিভাবে কাঁদে সে-ই শুধু জানে।

কার্পেটি সাজানো প্রিয় অন্তঃপুরে ঢুকে গেছে জল।
মর্হুমূহু নৌকাডুবি ভেসে যায় বিরুদ্ধ নোঙর।
পৃথিবীর যাবতীয় প্রেমিকের সপ্তডিঙা ডুবেছে যেখানে
সেখানে নারীর মত পদ্ম ফুটে থাকে।
জল হাসে, জল তার চুড়িপরা হাতে,
নর্তকীর মত নেচে ঘুরে ঘুরে ঘাগরার ছোবলে
সবকিছু কেড়ে নেয়, কেড়ে নিয়ে ফের ভরে দেয়
বাসি-হয়ে-যাওয়া বুকে পদ্ম গন্ধ, প্রকাণ্ড উদ্যান।
এই অপরূপ ধ্বংস, মরচে-পড়া ঘরে-দোরে চাঁপা রঙে এই চুনকাম
দরবারী কানাড়া এরই নাম?
সরোদ বাজাতে জানলে বড় ভাল হতো।
পুরুষ কীভাবে বাঁচে সে - ই শুধু জানে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

জরাসন্ধ

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

যে-মুখ অন্ধকারের মতো শীতল, চোখ দুটি রিক্ত হ্রদের মতো কৃপণ কৃপণ, তাকে তোর মায়ের হাতে ছুঁয়ে ফিরিয়ে নিতে বলি। এ-মাঠ আর নয়, ধানের নাড়ায় বিঁধে কাতর হলো পা। সেবন্নে শাকের শরীর মাড়িয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ, ডুবো জলে তেচোকো মাছের আঁশগন্ধ সব আমার
অন্ধকার অনুভবের ঘরে সারি সারি তোর ভাঁড়ারের নুনমশলার পাত্র হ'লো, মা। আমি যখন অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না, তখন তোর জরায় ভর ক'রে এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি। আমি কখনো অনঙ্গ অন্ধকারে হাত দেখি না, পা দেখি না।

কোমল বাতাস এলে ভাবি, কাছেই সমুদ্র। তুই তোর জরার হাতে কঠিন বাঁধন দিস। অর্থ হয়, আমার যা-কিছু আছে তার অন্ধকার নিয়ে নাইতে নামলে সমুদ্র সরে যাবে শীতল সরে যাবে মৃত্যু সরে যাবে।

তবে হয়তো মৃত্যু প্রসব করেছিস জীবনের ভুলে। অন্ধকার আছি, অন্ধকার থাকবো, বা অন্ধকার হবো।

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

আনন্দ ভৈরবী

আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি
এমন ছিলো না আষাঢ়-শেষের বেলা
উদ্যানে ছিলো বরষা-পীড়িত ফুল
আনন্দ-ভৈরবী।

আজ সেই গোঠে আসে না রাখাল ছেলে
কাঁদে না মোহনবাঁশিতে বটের মূল
এখনো বরষা কোদালে মেঘের ফাঁকে
বিদ্যুৎ-রেখা মেলে

সেকি জানিত না এমনি দুঃসময়
লাফ মেরে ধরে লাল মোরগের ঝুঁটি
সেকি জানিত না হৃদয়ের অপচয়
কৃপণের বামমুঠি

সে কি জানিত না যত বড়ো রাজধানী
তত বিখ্যাত নয় এ হৃদয়পুর

সেকি জানিত না আমি তারে যত জানি
আনখ সমুদ্দুর
আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি
এমন ছিলো না আষাড়-শেষের বেলা
উদ্যানে ছিলো বরষা-পীড়িত ফুল
আনন্দ-ভৈরবী।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
না পাঠানো চিঠি

মা, তুমি কেমন আছো?
আমার পোষা বেড়াল খুঁচু — সে কেমন আছে?
সে রাত্তিরে কার পাশে শোয়?
দুপুরে যেন আলিসাহেবদের বাগানে না যায়
মা ঝিঙে মাচায় ফুল এসেছে?
তুলিকে আমার ডুরে শাড়িটা পড়তে বলো
আঁচলের ফেঁসোটা যেন সেলা করে নেয়
তুলিকে কত মেরেছি, আর কোনদিন মারব না।
আমি ভাল আছি, আমার জন্য চিন্তা করো না।
মা আমাদের, মা তোমাদের ঘরের চালে নতুন খড় দিয়েছে?
এবারে বৃষ্টি হয়েছে খুব
তরফদার বাবুদের পুকুরটা কি ভেসে গেছে
কালু ভুলুরা মাছ পেয়েছে কিছু
একটা মেঘের ডাক শুনে কইমাছ উঠে এসেছিল ডাঙায়
আমি আমগাছতলায় দুটো কইমাছ ধরেছিলাম
তোমার মনে আছে মা
মনে আছে আলিসাহেবের বাগানের সেই নারকোল
চুরি করে আনিনি—
মাটিতে পড়েছিল, কেউ দেখেনি
নারকোল বড়ার সেই স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে
আলিসাহেবের ভাই মিজান আমাকে খুব আদর করত
বাবা একদিন দেখতে পেয়ে চ্যালাকাঠ দিয়ে পিটিয়েছিল আমাকে

আমার কি দোষ! কেউ আদর করলে আমি না বলতে পারি
আমার পিঠে এখনও সেই দাগ আছে
আলিসাহেবে বাগানেই আর কোনদিন যাইনি —
আমি আর কোন বাগানেই যাই না মা
সেই দাগটায় হাত বুলিয়ে বাবার কথা মনে পড়ে
বাবার জন্য আমার খুব কষ্ট হয়।
আমি ভালো আছি, খুব ভালো আছি
বাবা যেন আমার জন্য একটুও না ভাবে
তুলি কি এখনও ভূতের ভয় পায় মা
তুলি আর আমি পুকুরধারে কলা বৌ দেখেছিলাম
সেই থেকেই তুলির ফিটের ব্যারাম শুরু হল
দাদা সেই কলাগাছটা কেটে ফেলল
আমি কিন্তু ভয় পাই নি; তুলিকে কত ক্ষেপিয়েছি।
আমার আবার মাঝরাত্রে সেই কলাবৌ দেখতে ইচ্ছে করে
হ্যাঁ, ভাল কথা — দাদা কোন কাজ পেয়েছে
নকুড়বাবু যে বলেছিল বহরমপুর নিয়ে যাবে
দাদাকে বল ওর উপর আমি রাগ করিনি
রাগ পুষে রাখলে মানুষের বড় কষ্ট
আমার শরীরে আর রাগ নেই
আমি আর একফোঁটাও কাঁদিনা মা
আমি, আমি রোজ দোকানের খাবার খাই
হোটেল থেকে দুবেলা আমার খাবার এনে দেয়
মাংস মুখে দিই আর তুলির কথা কালুভুলুর কথা মনে পড়ে
আমাদের; তোমাদের গ্রামে পটল পাওয়া যায় না
আমি আলুপটলের তরকারি খাই, পটল ভাজাও খাই
হোটেলে কিন্তু কক্ষোনো শাক রান্না হয় না
পুকুরপাড় থেকে তুলি আর আমি তুলে আনতাম কলমী শাক
কী ভালো কী ভালো — বিনা পয়সায়
কোনদিন আর কলমীশাক আমার ভাগ্যে জুটবে না।

জোর হাওয়া দিলে তালগাছের পাতা শরশর করে
ঠিক বৃষ্টির মতন শব্দ হয়
এই ভাদ্দর মাসে তাল পাকে, ঢিপ ঢিপ করে তাল পড়ে
বাড়ির তালগাছ দুটো আছে তো?
কালু তালের বড়া বড় ভালবাসে, একদিন বানিয়ে দিও
তেলের খুব দাম জানি — তবু একদিন দিও।

আমাকে বিক্রি করে দিয়ে ছ'হাজার টাকা পেয়েছিলে
তা দিয়ে একটা গোরু কেনা হয়েছে তো
সেই গোরুটা ভাল দুধ দেয়
আমার মতো মেয়ের চেয়ে গরুও অনেক ভালো
গুরুর দুধ বিক্রি করে সংসারের সুসার হয়
গরুর বাছুর হয়, তাতেও কত আনন্দ হয়
বাড়িতে কন্যাসন্তান থাকলে কত জ্বালা
দুবেলা ভাত দাওরে, শাড়ি দাওরে, বিয়ের জোগাড় কররে
হাবলু, মিজান, শ্রীধরদের থাবা থেকে মেয়েকে বাঁচাও রে
আমি কি বুঝি না সব বুঝি সব বুঝি
কেন আমায় বিক্রি করে দিলে তাও তো বুঝি
সে জন্যই তো আমার কোন রাগ নেই, অভিমান নেই
আমি তো ভালই আছি, খেয়ে পড়ে আছি
তোমরা ঐ টাকায় বাড়িঘর সারিয়ে নিও ঠিক ঠাক
কালুভুলুকে ইস্কুলে পাঠিও
তুলিকে ব্রজেন ডাক্তারের ঔষধ খাইও
তুমি একটা শাড়ি কিনো, বাবার জন্য একটা ধুতি
দাদার একটা ঘড়ির শখ — তাকি ঐ টাকায় কুলোবে
আমি কিছু টাকা জমিয়েছি, সোনার দুল গড়িয়েছি
একদিন কি হলো জান মা, আকাশে খুব মেঘ জমেছিল
দিনের বেলা ঘুটঘুটি অন্ধকার
মনটা হঠাৎ কেমন করে উঠল
দুপুর বেলা চুপি চুপি বেরিয়ে ট্রেনে চেপে বসলাম
স্টেশনে নেমে দেখি একটা মাত্র সাইকেল রিক্সা
খুব ইচ্ছে হল একবার আমাদের, তোমাদের বাড়িটা দেখি আসি
রথতলার মোড়ে আসতেই কারা যেন চেঁচিয়ে উঠল— 'কে যায়'?
দেখি যে হাবুল শ্রীধরের সঙ্গে তাস খেলছে দাদা।
আমাকে বলল, হারামজাদি কেন ফিরে এসেছিস
আমি ভয় পেয়ে বললাম, ফিরে আসিনি গো, থাকতেও আসিনি
একবার শুধু দেখতে এসেছি
হাবুল বলল, এটা একটা বেবুশ্যে মাগি
কী করে জানল বলতো? তা কি আমার গায়ে লেখা আছে ?
আরেকটা ছেলে— চিনি না — বলল ছি ছি ছি, গাঁয়ের বদনাম
হাবুল রিক্সাওয়ালাকে চোখ রাঙিয়ে বলল, ফিরে যা।
আমি বললাব দাদা, দাদা আমি মায়ের জন্য কটা টাকা

এনেছিলাম , আর তুলির জন্য....
দাদা টেনে এক চড় কষাল আমার গালে
আমাকে বিক্রির টাকা হক্কের টাকা
আর আমার রোজগারের টাকা নোংরা টাকা
দাদা সে পাপের টাকা ছোঁবে না—ছিনিয়ে নিল শ্রীধর
আমাকে দুর দুর করে তাড়িয়ে দিল
আমি তবু দাদার উপর রাগ করিনি
দাদা তো ঠিকই করেছে, আমি তো আর দাদার বোন নই
তোমার মেয়ে নই, তুলির দিদি নই
আমার টাকা নিলে তোমাদের সংসারের অকল্যান হবে
না-না, আমি চাই তোমরা সবাই ভালো থাকো
গোরুটা ভালো থাকুক, তাল গাছ দুটো ভালো থাকুক
পুকুরে মাছ হোক, ক্ষেতে ধান হোক, ঝিঙে মাচায় ফুল ফুটুক
আর কোনোদিন ঐ গ্রাম অপবিত্র করতে যাব না।

আমি খাট বিছানায় শুই নীল রঙের মশারী
দোরগোড়ায় পাপশ আছে, দেয়ালে মা দুর্গার ছবি
আলমারী ভর্তি কাচের গেলাস, বন বন করে পাখা ঘোরে
সাবান মেখে রোজ চান করি, এখানকার কুকুরগুলোও
সারা রাত ঘেউঘেউ করে।
তাহলেই বুঝছ, কেমন আরামে আছি আমি
আমি আর তোমার মেয়ে নই, তবু তুমি আমার মা
তোমার আরো ছেলে মেয়ে আছে, আমি আর মা পাবো কোথায়
সেজন্যই তোমাকে চিঠি লিখছি মা
তোমার কাছে একটা খুব অনুরোধ আছে
তুলিকে একটু যত্ন করো, ও বেচারী খুব দুর্বল
যতই অভাব হোক, তবু তুলিকে তোমরা, তোমার পায়ে পড়ি মা
তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বলো
তুলিকেও যেন আমার মতন আরামের জীবনে না পাঠায়
যেমন করেই হোক তুলির একটা বিয়ে দিও
ওর একটা নিজস্ব ঘর সংসার, একটা নিজের মানুষ
আর যদি কোন রকমেই ওর বিয়ে দিতে না পার
ওকে বল গলায় দিয়ে মরতে
মরলে ও বেঁচে যাবে মা
মরলে ও বেঁচে যাবে।

কেউ কথা রাখেনি

কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখেনি
ছেলেবেলায় এক বোষ্টমী তার আগমনী গান হঠাৎ থামিয়ে বলছিলো
শুক্লা দ্বাদশীর দিন অন্তরাটুকু শুনিয়ে যাবে
তারপর কত চন্দ্রভুক অমাবশ্যা চলে গেল কিন্তু সেই বোষ্টমী
আর এল না
পঁচিশ বছর প্রতিক্ষায় আছি
মামা বাড়ির মাঝি নাদের আলি বলছিল, বড় হও দাদাঠাকুর
তোমাকে আমি তিন প্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাবো
যেখানে পদ্মফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর
খেলা করে!
নাদের আলি, আমি আর কত বড় হবো? আমার মাথা এই ঘরের ছাদ
ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করলে তারপর তুমি আমায়
তিন প্রহরের বিল দেখাবে?
একটাও রয়্যালগুলি কিনতে পারিনি কখনো
লাঠি-লজেন্স দেখিয়ে দেখিয়ে চুষেছে লস্কর বাড়ির ছেলেরা
ভিখারীর মতো চৌধুরীর গেটে দাঁড়িয়ে দেখেছি
ভিতরে রাস উৎসব
অবিরল রঙের ধারার মধ্যে সুবর্ণ কঙ্কন পরা ফর্সা রমনীরা
কত রকম আমোদে হেসেছে
আমার দিকে তারা ফিরেও চায়নি!
বাবা আমার কাঁধ ছুঁয়ে বলেছিলেন, দেখিস একদিন আমরাও.....
বাবা এখন অন্ধ, আমাদের দেখা হয়নি কিছুই
সেই রয়্যাল গুলি, সেই লাঠি-লজেন্স, সেই রাস উৎসব
আমায় কেউ ফিরিয়ে দেবে না!
বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমাল রেখে বরুণা বলেছিলো,
যেদিন আমায় সত্যিকারের ভালোবাসবে
সেদিন আমার বুকেও এরকম আতরের গন্ধ হবে !
ভালোবাসার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়েছি
দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়
বিশ্বসংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছি ১০৮ টা নীলপদ্ম
তবু কথা রাখেনি বরুণা এখনো তার বুকে শুধুই মাংসের গন্ধ
এখনো সে যে-কোন নারী !
কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটালো, কেউ কথা রাখে না।

হাস্‌ন রাজার বাড়ি

গাঁয়েতে এয়েছে এক কেরামতি সাহেব কোম্পানি
কত তার ট্যাড়া ক্যাঁড়া — মানুষ না পিপিলিকা , যারে ছুটে যা
যারে যা দ্যাখ গা খেলা — হুরীর নাচন আর
ভাঁড়ের কেরদানি
এখানে এখন শুধু মুখোমুখি বসে রবো আমি আর হাস্‌ন রাজা।

আনভোলা হাওয়া ঘোরে, তিলফুলে বসেছে ভ্রমর
উদলা নদীটি আজ বড়ই ছেনালী
বিষয় বুঝলে দাদা, ভূলাতে এয়েছে যে দোলায়ে কোমড়
যা বেটি হারামজাদী, ফাঁকা মাঠে দিব তোর মুখে চুন কালি।

ক'ও তো হাস্‌ন রাজা, কি বৃত্তান্তে বানাইলে হে মনোহর বাড়ি ?
শিওরে শমন, তুমি ছয় ঘরে বসাইলে জানালা—
চৌখুপি বাগানে এত বাঞ্ছা কল্পতরুর কেয়ারী
দুনিয়া আন্ধার তবু তোমার নিবাসে কত পিদ্দিমের মালা!

জানুতে ঠেকায়ে থুত্‌নি হাস্‌ন চিন্তায় বসে,
মুখে তার মিটি মিটি হাসি
কড়ি কড়ি চক্ষু দুটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে দেখে জমিন্‌ আসমান
ফিস্‌ফিস্‌য়ে কয়, বড় আমোদে আছিরে ভাই, ছয়টি ঘরেতে ঐ যে
ছয় দাসদাসী

শমন আসিলে বলে, তিলেক দাঁড়াও, আগে দেখে লই
পঞ্চের নকশায় পইড়লো কিনা শেষটান।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

আমার নাম ভারতবর্ষ

স্টেনগানের বুলেটে বুলেটে
আমার ঝাঁঝরা বুকের ওপর ফুটে উঠেছে যে মানচিত্র—
তার নাম ভারতবর্ষ।

আমার প্রতিটি রক্তের ফোঁটা দিয়ে
চা বাগিচায় কফি খেতে,

কয়লা-খাদানে, পাহাড়ে অহরণ্যে
লেখা হয়েছে যে ভালোবাসা —
তার নাম ভারতবর্ষ

আমার অশ্রুর জলসেচে আর হাড়ের ফসফেট- এ
খুনির চেয়ে ও রুক্ষ কঠোর মাটিতে
বোনা হয়েছে যে অন্তহীন ধান ও গানের সপ্ন —
তার নাম ভারতবর্ষ।

আমার ঠান্ডা মুখের ওপর
এখন গাঢ় হয়ে জমে আছে
ভাক্‌রা নাঙালের পাথুরে বাঁধের গম্ভীর ছায়া।
ডিগবয়ের বুক থেকে
মায়ের দুধের মত উঠে আসা তেলে ভেসে যাচ্ছে
আমার সারা শরীর।
কপাল থেকে দাঙ্গার রক্ত মুছে ফেলে
আমাকে বুকে ক'রে তুলে নিতে এসেছে
আমেদাবাদের সুতোকলের জঙ্গি মজুর।
আমার মৃতদেহের পাহারাদার আজ
প্রতিটি হালবহনকারী বলরাম ।
প্রতিটি ধর্ষিতা আদিবাসী যুবতীর
শোক নয় ক্রোধের আগুনে
দাউ দাউ জ্বলে যাচ্ছে আমার শেষ শয্যা ।

ভরাট গর্ভের মত
আকাশে আকাশে কেঁপে উঠেছে মেঘ।

কাঠের চেয়ার

কাঠের চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে
মানুষও একদিন কাঠ হয়ে যায়।
তার কোমড় থেকে
সোঁদরি, গড়ান, গঁদের আঠা ঝরতে ঝরতে
তাকে একদিন পুরো পুরি এঁটে ধরে তক্তার সঙ্গে
কুর কুর কুর কুর

ঘুণপোকা ঘুরতে থাকে তার আশির-নখর,
কাঠের চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে
একদিন পুরোপুরি কাঠ হয়ে যায় সে।
তখ কেউ তাকে চড় মেরে চলে যায়।
সে রাগে না।
সমর্পন নিয়ে নারী এসে কাছে দাঁড়ায় ।
সে কেঁপে ওঠে না।
টালমাটাল পায়ে শিশু ছুটে আসে ।
সে দুহাত বাড়িয়ে দেয় না ।
একটার পর একটা
কাঠ জুড়তে জুড়তে
সে এমন এক কাঠের চেয়ার এখন,
যার শরীরের সন্ধিতে
শুধু জং-ধরা পেরেকের গান,
একটানা করাত-চেড়াই-এর গান।

যে হাত একদিন সমুদ্র শাসন করত
তা এখন চেয়ারের দুই ভারী হাতল।
যার দুই উরুতে
একদিন টগবক করত একজোড়া বাদামি ঘোড়া
আজ তার ডান পা কেটে নিল
বাঁ পা জানতে পারে না।
কাঠের অশ্রু নেই সপ্ন নেই নিদ্রা নেই হাহাকার নেই।
একটু চেষ্টা করলেই
সে জানালায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেত
ঢ্যাঙা কালো বেঁটে মাঝারি
উটের মত পরিশ্রমী মানুষ মানুষ আর মানুষ;
কিন্তু কাঠের চেয়ারের এই হল মুসকিল
সে জানালা অব্দি হেঁটে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না।
শুধু
কাঠের ভেতর লেহার পেরেক-আঁটা তার দুটো চোখ
বাকী জীবনভর
ছোটো চেয়ার থেকে মেজো চেয়ার
মেজো চেয়ার থেকে বড়ো চেয়ার হওয়ার
সপ্ন দেখতে থাকে ।

মণীভূষণ ভট্টাচার্য্য

সুকান্ত ভট্টাচার্যকে খোলা চিঠি

রাত্রির দ্রুতগামী অশ্বারোহীদের বলেছি
এই চিঠি তারা স্মৃতির লাল ডাকবাক্সে ফেলে দেবে।

রাস্তার পাশে তামাটে কলাপাতা জড়ানো দু'শো পাঁচখানা হাড়
পেটের ভারে কুঁজো হয়ে মাটিতে বাটি পেতে বসে আছে,
বাটিতে টুংটাং টুংটাং শব্দ তুলে
রোদ্দুরের মুখে জুতোর ঝিলক মেরে
পেরিয়ে গেল পকেটে-কলম-গোঁজা সময়।

গাঁয়ের আড় চোখ তাকানো টাউটের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে শহুরে শয়তান,
চারদিকে তালপাতার সেপাইদের কুচকাওয়াজের শব্দ
আমাদের সমস্ত গানকে গলা টিপে দেওয়ালে ঠেসে ধরেছে, এই সময়ে
তুমি যদি বেঁচে থাকতে —
আজ তোমার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হোতো।

পূর্ব গোলার্ধের এই উষ্ণ অঞ্চলে বার্ধক্য বড় তাড়াতাড়ি আসে,
বেঁচে থাকলে তুমি হয়ত তোমার মতোই টগ্‌বগে তরুণ,
কিংবা আমাদের মত অস্পষ্টভাষী মেনিমুখো বাহাত্তুরে
হয়ে যেতে পারতে,
এখানে সকাল সন্ধ্যে টপ্‌ টপ্‌ ঘামের শব্দের মধ্যে
দু'একবার দোয়েল শিস দেয়,
ফস্‌ করে দেশলাই জ্বলে ওঠে, আর তখনই
দক্ষিণ বাতাসে উড়ো খবর আসে —
এখানে শোক কিংবা সুখের পরমআয়ু, এখনো,
একটা জলন্ত সিগারেটের চেয়ে বেশি নয়।

টিকে থাকলে হয়তো কোনো আর্ন্তজাতিক লেখক সংঘের
পুরস্কার-ঝোলানো সভাপতি —
ঘন ঘন হাওয়াই জাহাজের তলা থেকে মাটি সরে যেতো,
একাডেমির চেয়ারম্যান, পুস্তক প্রকাশনীর মালিক,
বাজারি পত্রিকার খুঁটি কিংবা রাষ্ট্রিয় পুঁজির প্রচার অধিকর্তা অথবা
আগাগোড়া খাঁটি থাকার দায়ে
চারখানা যবের ঝলসানো পূর্ণিমা চাঁদের উপর

এক হাতা আস্ত কলাইসেদ্ধ গড়িয়ে যেত—
জেলখানায়।

বেঁচে থাকা, বিশেষ ক'রে কলমবাজদের পক্ষে
একটা করুণ চালাকি।
টিকে থাকতে থাকতে শুধুমাত্র 'বেঁচে থাকা' নামক দুটো
ভালো মানুষ শব্দের জন্য জীবনের মস্ত ভারি অভিধানের পাতায় পাতায়
চোখ ঘষে ঘষে মানুষ কত কী যে হয়ে যেতে পারে......

তোমার শোকমিছিলে সম্ভবত চারজন লোক ছিলো,
কারন মৃতদেহ বহনের জন্য কমপক্ষে চারজনের দরকার হয়,
আর যাদের থাকার কথা ছিলো—
তারা তখন কারখানায় বয়লারের সামনে
খনির অন্ধকারের মালিকানায় শাবলের ধাতব সংঘর্ষে
ভাঙা খোয়ার পাহাড়ের সামনে রাস্তার ধারে গাছতলায়
জলন্ত ইটের পাঁজার কাছাকাছি,
গোড়ালি-ফাটা মাঠে তেষ্টার লম্বা দরখাস্ত মেলে-দেওয়া
জিভের উপর
কর্কটক্রান্তির চামড়া-পোড়ানো আঁচের নিচে পিঠ পেতে
গামছা দিয়ে বার বার গায়ের ঘাম মুছে নিচ্ছিলো ।

না তারা তোমার কথা জানতো না। কারণ,
তাদের কাছে তোমার লেখা পৌছোয়নি, কারণ
তাদের অক্ষর-পরিচয় ঘটেনি।

তাই এখন আমরা আমাদের নিরক্ষর বিবেকের সামনে
হিতৈষী খাদির পর্দা ঝুলিয়ে দিয়ে
তাদের স্বাক্ষর বানাবার তালে আছি। যাতে
অন্তত এই ভুবনবিজয়ী লঙ্গরখানার নামের দীর্ঘতম তালিকায়
তারা নিজের নামটা পড়ে নিতে পারে।

মৃত ব্যক্তির কাছে চিঠি লেখার কোন মানে হয় না, জানি।
কিন্তু তুমি তো ব্যক্তি নও, প্রতিষ্ঠান নও, তুমি একটা শ্রেনী —
একটা সর্বগ্রাসী ঘামে-ভেজা লেলিহান অগ্রগামী শ্রেনীগত মানুষ - তুমি ,
তাই রাত্রির দ্রুতগামী অশ্বারোহীদের বলেছি

তারা যেন একবার অন্ধকার দিগন্তে নক্ষত্রভেদী বর্শা এবং
মশাল নামিয়ে রেখে এই চিঠি স্মৃতির গোপন লাল ডাকবাক্সে ফেলে দেয়।

টি বি-তে তোমার ফুসফুস ঝরঝরে হয়ে গিয়েছিলো,
এদেশে লক্ষ লক্ষ লোকের যায়,
তোমাকে শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে ঘরে বাইরে যক্ষ্মার জীবাণুদের বিরুদ্ধে
লড়তে হয়েছিলো; এদেশে এরকম সংগ্রামীর সংখ্যা কম নয়,
তুমি এক সময় ঠোটের রক্তে-ভেজা গান গাইতে গাইতে
আগুনের পাখি হয়ে ভোরের পাহাড় থেকে দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে চলে গেলে —
এরকম সকলের ক্ষেত্রে হয় না। আর, সেখানেই তুমি
আমাদের প্রানের সঙ্গী, আমাদের কুড়ে-খাওয়া স্মৃতি,
আমাদের আগামী বিবেক, আমাদের কাপুরুষ পাঁজরের নিচে
তুমি একটা গন্‌গনে গানের মধুরতম সন্ত্রাস।

ফুটপাতে বসে থাকা ঐ ভিখিরি মেয়েটির সামনে চুরুট মুখে
শলা পরামর্শ করতে করতে পাল্টে যাচ্ছে সময়।
উপর থেকে নিচের দিকে ছেঁড়া কাপড়, এক টুকরো ক্ষয়ে যাওয়া সাবান,
দু'খানা বাসি রুটি ছুড়ে দিয়ে বিশাল ঘোড়ালে জালে তুলে নিচ্ছে
গায়ের রক্ত-জল-করা রুপালি শস্য —
এখন জন্মান্ধের ঘষা চোখের মতো সূর্য পশ্চিম সমুদ্রে নেমে গেল
গায়ে দু'তিনটে গোল ছিদ্র নিয়ে তরুণ - মড়ার খুলির মতো
চাঁদ উঠে আসে,
তোমার রানার এখন আর ঝুঁম্ ঝুম্ ঘন্টা বাজায় না,
তালিমারা ছাতা মাথায় কাঁধের ঝোলা থেকে উনত্রিশটা
আত্মহত্যার খবর আর অগুন্‌তি বরখাস্তের চিঠি বিলি করে বেড়ায়—
আর রাত্রে হাঁপানির টানের সঙ্গে কপালের নিচে দুটো গভীর গর্ত থেকে
ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসে লাল্‌চে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ—
গলায় মাদুলি হয়ে ঝুলে থাকে এশিয়ার দীর্ঘতম রাত্রি।

তুমি যে ভরপুর প্রাণের আবেগে লেনিন হ'তে চেয়েছিলে—
সেই তাঁকে নিয়েও এখন ভাগ-বাঁটোয়ারা চলেঃ ফলে—
ভাগের মা গঙ্গা পায় না।
একথা তো তুমি পরিষ্কার জানতে
এই কোটি কোটি পিছু-মোড়া-হাত-পা-বাঁধা ক্রীতদাসের বাজারে
সব কিছুই পণ্য —

এই মৌসুমী অঞ্চলের ফুল ও ফল,
ঐ বাতাসা হাতে ছুটন্ত শিশুটির চিবুকের তিল,
এই জবরদস্তি জীবনের সমস্ত লবঙ্গ ও এলাচ
ঐ রোদে - পোড়া ফুটপাতে ডানহাতের আঙুলকাটা আসন্নপ্রসবা
ভিখিরি মেয়েটির চিত্রকল্প,
নিঃস্বের ন্যাকড়া কিংবা পণ্ডিতের মগজ,
এমনকি তোমার জন্মদিনও
পণ্য।

আর এই মাল খালাস-করা বেনিয়া, মাতাল, ধড়িবাজ, গুপ্তচর এবং
ফড়েদের ভীড় এবং তোমার জন্য লোক দেখানো হা-হুতাস
এসবের বাইরে একজন আমাদের জন্য ঘোরতর অপেক্ষা করে আছে,
সে সবেমাত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে,
যদিও আমরা তাকে, নিজেদের মধ্যে চোখ টেপাটেপি করে,
তোমার জন্ম-জয়ন্তির কমিটির সদস্য ক'রে নেবার ফিকিরে আছি
সে কিন্তু আমাদের কাউকেই পেয়ারের লোক ব'লে খাতির করবে না,
কারণ আমরা তার মা-কে ফুটপাতে শুকিয়েছি—
আমরা তার হাতে তোবড়ানো এনামেলের বাটি ধরিয়ে দিয়েছি এবং
জন্মের পরে শুকনো মায়ের ঝুলন্ত বুক চুষে
দুধের পরিবর্তে কয়েক ফোঁটা রক্ত চেটে নিয়েছে এই সদ্যোজাত
উলঙ্গ, আগামী ভারতবর্ষ।
আর তাই যখন এই উপমহাদেশ জোড়া বিশাল ডালপালা ছড়ানো
প্রানময় গাছটিকে দুই প্রান্ত থেকে দেশি এবং বিদেশি হাতল লাগানো
করাতে চিরে রস গড়িয়ে-পড়া ফালিগুলো দুই দিকে জমা করছে, আর,
মধ্যবর্তী বধ্যভূমিতে
ফিন্‌কি দিচ্ছে দিন এবং রাত্রির অগ্নিকনা—এই সুসময়ে
তোমার কথাই মনে পড়ে, একমাত্র তোমার কথা—
তাই রাত্রির দ্রুতগামী অশ্বারোহীদের বলেছি
অন্ধকারের সমস্ত আশ্রয় পুড়িয়ে দেবার আগে,
সমস্ত পাহাড় আর সমুদ্রের উপর হাজার হাজার পাখি উড়িয়ে দেবার আগে,
এই চিঠি যেন তারা তোমার ফুসফুস-ক্ষরিত ভোরের
লাল ডাকবাক্সে ফেলে দেয়।

তারাপদ রায়

আমার ডুগডুগি

আমি মমতা থেকে তুলে এনেছিলাম পরিহাস
আমি বিষাদ থেকে তুলে এনেছিলাম অশ্রু
আমি ঘুম থেকে তুলে এনেছিলাম স্বপ্ন
আমি স্মৃতি থেকে তুলে এনেছিলাম অভিমান
আমি শব্দ থেকে তুলে এনেছিলাম কবিতা
তুমি কোনোদিন কিছুই খেয়াল করোনি
আমি বিষাদ সিন্ধুর তীরে দাঁড়িয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে ছিলাম
তুমি সেই বাঁদরনাচের বাজনা শুনতে পাওনি।
উত্তরের অনন্ত বাতাসে ঝরা পাতার মতো উড়ে উড়ে পড়েছে
আমার পরিহাসময় অশ্রু, আমার স্বপ্নময় অভিমান।
তুমি লাল মখলের চটি পায়ে রেশমের চাদর জড়িয়ে
উজ্জ্বল রোদের মধ্যে উদাসীন হেঁটে গেছো
তোমার পায়ের প্রান্তে ঘুরে ঘুরে লুটিয়ে পড়েছে
ঝরাপাতার মতো আমার পরিহাস, আমার কবিতা
তোমার শ্রুতি ছুঁয়ে ভেসে গেছে আমার ডুগডুগির বোল
বছরের পর বছর, দিনের পর দিন
গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই, শুধু শীত আর শীতের হাওয়া
ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন, স্বপ্নের মধ্যে অভিমান
শীতল অভিমানে জড়ানো ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝরা পাতা
এলোমেলো ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে রোদের উজ্জ্বলতায়।
তুমি উদাসীন চলে গেছো
কোনদিন তাকিয়ে দেখোনি,
তুমি কোনদিন শুনলে না
আমার ডুগডুগি, আমার বাঁদরনাচের বাজনা।

কেন ভয় দেখালে ?

তুমি আমাকে স্বপ্ন দেখা শিখিয়েছিলে,
তুমি আমাকে বুঝিয়েছিলে
আকাশ একদিন হীরেমন পখির চোখের মত
নীল , ঝকঝকে ;
দুর থেকে লুকিয়ে দেখতে হয় সেই আকাশকে,

না হলে নীল কাঁচ ঝন ঝন করে ভেঙ্গে যায়।
তুমি শিখিয়েছিলে,
রেশমের চাদরে মুখ ঢেকে দেখতে হয় স্বপ্ন,
না হলে স্বপ্নে নীল কাঁচ ঝন ঝন করে ভেঙ্গে যায়।
সারা জীবন আমি ভয় পেয়েছি;
কখন ঝন ঝন করে বেজে উঠবে
ভাঙ্গা কাঁচের জল তরঙ্গ।
সারা জীবন আমি চাদরে মুখ ঢেকে লুকিয়ে
স্বপ্ন দেখেছি ;
সারা জীবন আমি গাছপালার আড়াল থেকে
নীল আকাশ দেখেছি।
কিন্তু কোথায় সেই ভাঙা কাঁচের ঝনঝন শব্দ
যা চুরমার করে দেবে?
বলো, হে অমোঘভাষিনি, তুমি বলো,
কেন সারা জীবন আমাকে মিথ্যে ভয় দেখালে?

নবনীতা দেবসেন

বাতিটা

(মায়ের জন্মদিন স্মরনে)

— "এইবারে শুয়ে পড়ো মাগো
এগারোটা বেজে গেছে।"
—"এগারোটা আবার রাত নাকি?
তুই শুয়ে পর, তোর কাল কলেজ রয়েছে।"

মা বসে আছেন তাঁর ইজিচেয়ারে
সরু নাকে মোটা চশমা
ফর্সা আঙুলে আতসকাচটা ধরা
কোলের ওপরে বিছানো স্টেটসম্যান।
পাশের টেবিলে ফ্লাস্কে চা, ওষুধবিসুধ,
রুপোর ডিবিতে পান আর জর্দা,
পেতলের পিকদান, পেতলের ক্যাশবাক্সো।

পিছনের টিপয়ে মাটির ঘটে
মার প্রিয় রজনীগন্ধার গুচ্ছ,
আর বেতের টেবিল ল্যাম্প, আগরতলায় তৈরী —
সামনে টিক টিক করছে অ্যালার্ম ঘড়িটা।
ট্র্যাভেলিং ক্লক।

মা কাগজের পাতা ওলটালেন।
প্রচণ্ড খড়খড় শব্দে শব্দহীন রাত্রি টুকরো হলো।
বই বন্ধ করে আমি উঠে আসি।
ঘরে পা দিতেই একগলা রজনীগন্ধার
গন্ধের গভীরে ডুবে যাই।
চেয়ারে বসেই ঢুলছে নার্স মেয়েটি।
—"মাগো, শুয়ে পড়ো এইবারে,
রাত দেড়টা বাজে"—
—"রাত দেড়টা?" ধমকে উঠেন, "এখনও
শুসনি তুই? সকালে কলেজ?"
বকুনি খেয়েও বলি, নির্লজ্জ বেহায়া—
—"শরীর যে খারাপ হবে, এভাবে জেগো না" —
— শরীর?" এক গা গয়নার মতো ঝলমলিয়ে
হেসে ফেলেন মা।
—" আরও কত খারাপ হবে রে, শরীর?
আর — হবেই বা কী, শরীর দিয়ে?"

আরেকবার যেতেই হয়, নিজের শোয়ার আগে।
" আড়াইটে বাজলো, মাগো, ক্ষান্ত দাও,
খাটে শোবে চল।"
—" শোবো, শোবো, এইটুকুনি বাকি—
পড়া তো সহজ নেই, ছানির দৌলতে?"
সামান্য অপ্রস্তুত হেসে, ডুবে যান ছাপার হরফে।
টেবিলল্যাম্পের আলো, আতসকাচের
উদ্ভাসিত মনোযোগে
অ্যালার্ম ঘড়িটার টিকটিক
মুছে যায়।
ফিরে আসতে আসতে শুনি
নার্সমেয়েকে বলছেন — 'না না, বাছা

নিবিয়ে দিয়ো না আলো,
বাতিটা জ্বলুক অমনি
আরো এক পৃষ্ঠা বাকি আছে"—

আরো এক পৃষ্ঠা বাকি, আর এক
প্যারাগ্রাফ, আরো একটা বাক্য বাকি —
আরো একটি শব্দ দাও, নার্সমেয়ে,
আরো একটি দিন।।

সব্যসাচী দেব
চণ্ডালিকা

মা, দিগন্তে তাকিয়ে দেখ
রক্তিম মেঘে সর্বনাশের আভাস,
ঐ সর্বনাশের অগুন পেরিয়ে
আমার দুয়ারে এসে দাঁড়ায়নি কোন আনন্দ,
অঞ্জলি পেতে কেউ বলেনি — 'জল দাও'।

সারাজীবন আমাকেই তীব্র পিপাসায়
চিৎকার করতে হয়েছে — জল দাও, জল দাও।

চৈত্রের মধ্য দুপুরে পাখিরাও ডানা গুটিয়ে নেয়,
দূর শহরের রাস্তায় বাবুদের ভির নাই ,
গাঁয়ের কুকুরগুলো ঢুকে যেতে চায় উঠোনের ছায়ায়;
আমাকে এখন যেতে হবে দূর নদীর চড়ায়,
বালি খুঁড়ে তুলে আনতে হবে ফোঁটা ফোঁটা জল,
তারপর ফিরে আসব খরায় ফাটা মাঠ, শুকনো পুকুর
আর টলটলে জলে ভরা নতুন ইঁদারার পাশ দিয়ে —
বাবুদের ইঁদারা;

তৃষ্ণায় ডুবে যায় আমাদের গোটা গাঁ,
কুকুর আর মানুষের জিভ ঝুলে পড়ে,
আর বাবুদের ইঁদারায় বাবুদের ছেলেদের স্নান;

আমাদের শরীর জ্বলে যায় চৈত্রের খরায়।

মা, আমি এক চণ্ডালিকা;
বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, রাঢ়ের হা-হা করা মাঠ ফাটিয়ে,
বিহারের তপ্ত প্রান্তর চিরে আমি চিৎকার করছি
জল দাও।

আর আমার সারা শরীরের রক্ত উঠে আসছে মাথায়।

মা, একফোঁটা জলের দাম আমাদের গোটা জীবন।

কৃষ্ণা

অমার কোন শোক নেই, আমার কোন বিষাদ নেই।
হে কুরুবৃদ্ধগণ, আপনাদের নীরবতায় আমার কোন ক্ষোভ নেই

পিতামহ ভীষ্ম, ক্ষমা করবেন,
আপনাকে প্রণতি জানাবার স্থিরতা আজ নেই।
আর কর্ণ, তোমার জন্য ঘৃণাও বড় বেশী মনে হয়।

আর হে আমার পঞ্চস্বামী, আর্যাবত বিজয়ী বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন,
শক্তিমান ভীম, নকুল, সহদেব আর আপনি ধর্মপুত্র—
আপনারা আমার কৃতজ্ঞ অভিবাদন গ্রহণ করুন।

আমি সর্বজ্ঞা নই। যজ্ঞভূমের অগ্নি থেকে
আমার জন্ম, ধর্মাধর্মের ক্ষুরধার পথ আমার অজানিত;
আর্যপুত্র, আপনার বিচার তাই আমার পক্ষে ধৃষ্টতা।
আপনার কোন বিচলন নেই, আপনার ধর্ম আপনাকে
রক্ষা করছে বিকার থেকে — কৃতজ্ঞতা জানান সেই ধর্মকে।
ভীমসেন তোমাকে আমি ভালবাসা দিই নি কখনও,
তাই তা ফিরেও চাইনি।
শুধু তোমাকে আমার জিজ্ঞাসা ছিল ফাল্গুনী,
উর্ধ্বচারী মৎসের ছায়ানীল চোখের থেকেও দুর্লক্ষ্য কি
দুর্যোধনের বুক ; বল সত্য করে, প্রেম নয়,
শুধু পৌরুষের আস্ফালনই ছিল পাঞ্চালী বিজয়ের পটভূমি!

কিন্তু মিথ্যা প্রশ্ন ; আমি জানি তোমার কোন
উত্তর নেই , যেমন নেই কোন ভালোবাসা।

তোমার শুধু আশা আছে; কৈশোর থেকে তুমি
জেনে এসেছ বীরভোগ্যা পৃথিবী আর রূপ মুগ্ধা নারী;
জেনেছ একদিন ধার্তরাষ্ট্রের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে
কৌরব-উত্তরাধিকার; জেনে এসেছ যেখানে যা কিছু সর্ব্বোত্তম
সেখানে পৌঁছতে হবে তোমাকে। শুধু এই কুমারী-লক্ষ্যের
দিকেই তোমার দৃষ্টি, ধনঞ্জয়। তাই অনায়সে তুমি সরে যাও
এক নারী থেকে অন্য রমনীতে; তোমার পূর্বপুরুষেরা যেমন একদা
এক তৃণ প্রান্তরকে নিঃশেষ করে চলে যেতেন বনান্তরে।
এই দ্যূত সভায় দাঁড়িয়ে আমাকে জানতে হল
নারী শুধু কয়েক প্রহরের বিলাস-সঙ্গিনী।
মনিময় হার, শত সহস্র তরুণী দাসী, দান্ত মাতঙ্গ,
গন্ধর্বপ্রেরিত অশ্বযুথ আর অমি পাণ্ডু পুত্রবধু—
এক পংক্তিতে দাঁড়িয়ে আমরা সবাই অপেক্ষায়;

পিতৃগৃহে যেমন দেখেছিলাম, আহিরিনীরা দূর গ্রাম থেকে
নিয়ে আসে তাদের পসরা — আর তার ওপর ঝুঁকে পড়ে
লুব্ধ ক্রেতার দল—আমাদের ব্যবহার করার জন্য
তেমনই উন্মুখ হয়ে আছে, যাঁরা আমার পতির আত্মীয়;

আর আমাকে, আমাদের বিলিয়ে দিচ্ছেন যাঁরা
তারা আমার পঞ্চস্বামী — বিবাহের মঙ্গলসুত্র হাতে বেঁধে যারা
একদিন আমার ওপর নিয়ম সিদ্ধ করেছিলেন তাঁদের অধিকার।

না শুধু এই রত্নমণ্ডিত সভাগৃহেই নয়—
আরও আগে আমাকে জানতে হয়েছিল
আমার কোন বাসনা নেই, নেই কোন নিজস্ব ইচ্ছা;
অর্জুন, প্রথম দেখার মুহূর্তে আমার হৃদয় দিয়েছিলাম তোমাকে;
অথচ আমার শরীরকে প্রথম আলিঙ্গন করলেন
ঐ মহাভাগ যাঁর খ্যাতি ধর্মপুত্র বলে।

ইন্দ্রপ্রস্থ'র সৌধখিরে যখন আছড়ে পড়ত
নববর্ষার জলধারা যখন আমার কামনা ছুঁতে চাইত তোমাকে,
আমার অনুৎসুক দেহকে তখন আকর্ষণ করত অন্য কেউ ,
যে আমার স্বামী। বসন্তরজনীতে কিংশুকের প্রমত্ত উল্লাস-মুহূর্তে
তোমার ব্যকুল বাহু টেনে নিত, আমাকে নয় অন্য কোন যুবতীকে।

বারে বারে আমাকে সন্তানবতী করেছে পুরুষ, কিন্তু
তারা প্রত্যেকেই আমার আকাঙ্ক্ষিত নয়।

কোন প্রার্থনা নেই আমার। কুরুবৃদ্ধরা বিলাপ করুন
জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, প্রহর গুনুন কোন পুণ্যলগ্নে
ধর্মরাজ্য নেমে আসবে মাটিতে; ভীম, অনুগ্রহ করে স্তব্ধ হও,
নকুল, সহদেব, বিচ্যুৎ হয়োনা অগ্রজের প্রতি অটল বিশ্বাসে;
আর অর্জুন, অন্তঃপুরে যাও, সেখানে তোমার জন্য
স্নিগ্ধ শরীর সাজিয়ে রেখেছে তোমার কোন প্রেয়সী।

শোক নয় লজ্জা নয়; এই রাজগৃহে দাঁড়িয়ে
আমি জানলাম, প্রেম নয়, শ্রদ্ধা নয়, অধিকার নয়,
নারী শুধু প্রয়োজনের। আমি জানলাম, এখানে কোন
ভেদ নেই ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির, শক্তিমান ভীম, প্রেমিক অর্জুন
আর লোলুপ ধৃতরাষ্ট্র - নন্দনদের মধ্যে।

প্রতিকার চাইছি না।
যা শুধু বিলাসের, সেই বস্ত্র ছিনিয়ে নেয় যদি
কোন দুঃশাসন — নিক্। আমি কাঁদছি না।
চারপাশে ভাসানের ডিঙ্গায় পশুদের উদ্দাম নাচের ভঙ্গি
আমি দেখছি না।
চারপাশে ক্লীবদের অক্ষম বিলাপ
আমি শুনছি না।
ধনুর্বান নেই।
আমি ফিরিয়ে আনছি আমার জন্মের স্মৃতি, যজ্ঞের আগুন।

দ্রৌপদী নই, নই পাঞ্চালী, নই ভরতকুলবধূ,
আমি কৃষ্ণা, যজ্ঞাগ্নি-সম্ভূতা, শুধু নারী এক।

কর্ণ

তাহলে সময়, অর্জুন!
দ্বৈরথ সমর,
উত্তর ভূখণ্ড জুড়ে পরমায়ু হন্তারক ছায়া,
বুকের নিভৃত থেকে উঠে আসে অরণ্য-পিপাসা,

সমস্ত শিকড় জুড়ে প্রতিহিংসা ঢালে বিষ;
এতদিনে, অর্জুন, এতদিনে
মুখোমুখি তোমাতে আমাতে।

তিলে তিলে শোধ করছি অযাচিত জন্মের ঋণ,
আশৈশব আকাঙ্ক্ষার ভেলা বেয়েছি উজানে,
আজ সেই ধ্রুব-লগ্ন;
দেখ, এই মধ্য দিনে কনিষ্ঠ আঙুলে আমি ধরে রাখি সমস্ত পৃথিবী,
নেই একাঘ্নী আয়ুধ, কবচ-কুণ্ডল হৃত ছদ্ম বেশী ভিক্ষুকের হাতে,
আর নেই, এমনকি জীবনেরও নেশা
বিলিয়ে দিয়েছি তা গত গোধূলিতে;

অস্তমান সূর্যকে ঢেকে, আমার সামনে এসে
মাতা কুন্তী ভিক্ষা চাইলেন পঞ্চপুত্রের প্রাণ,
তাঁর চোখের মিনতি তোমারই জন্য হে অর্জুন;
সেই মুহুর্তে জানলাম, যদি জয়ী হই সমস্ত জীবন
আমাকে বহন করতে হবে অভিশাপ — আমার মাতার;
এইবার লগ্ন এল, তৃতীয় পাণ্ডব। শেষ খেলা;
বাজি রইল যে কোন জীবন, ধনুর্বাণ হাতে নাও,
এ খেলায় পরিত্রাণ নেই কোনও, কারও নেই তোমার আমার।

আমাকে একমুহূর্ত ভিক্ষা দাও, কৌন্তেয়;
সারা শরীর ভারী হয়ে আসছে পাথরের মত
বড় দীর্ঘকাল রণক্ষেত্রে আছি।
সমবেত জনতার অট্টহাসি, আচার্যের প্রত্যাখ্যান, তোমার বঙ্কিম বিদ্রূপ,
এর মাঝে তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম আমি ক্রীড়াঙ্গনে
জানতাম আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই ভারতভূমিতে তুমি ছাড়া
প্রবল স্পর্ধায় ছুঁড়ে দিয়েছিলাম দ্বন্দ্বের আহ্বান,
কিন্তু বিনা যুদ্ধে তুমি অর্জন করে নিলে শ্রেষ্ঠত্বের বরমাল্য;
আরও একবার, কাঙ্ক্ষিতা নারীকেও তুমি জতে নিয়েছিলে
আমার অবনত দৃষ্টির সামনে থেকে,
অসিতাঙ্গী অগ্নিকন্যা আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন
সুতপুত্রকে বরণ করার অনিচ্ছায়;
তবু স্থির করিনি আমার পথ,
বারেবারে আমাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে আমি সুতপুত্র
বারেবারে আমি ভুলতে চেয়েছি সেই পরিচয়;

অধিরথ দিয়েছিলেন স্নেহ; সামান্যা নারী রাধা
আমাকে পূর্ণ করেছিলেন মাতৃত্বের অমৃতে
আর প্রতি মুহূর্তে সেই ভালোবাসা আস্বাদন করতে করতে
আমি ভেবেছি, এখানে নয়, আমার স্থান পাণ্ডু - রাজ গৃহে;

যা কিছু আমার আকাঙ্ক্ষা, তাই আমাকে অর্জন করতে হয়েছে
মিথ্যার আড়লে। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে পেয়েছি শস্ত্রজ্ঞান,
বিদ্রূপের প্রতিবাদে বজ্রমুষ্টি তুলে ছেড়ে আসিনি ক্রীড়াভূমি,
দুর্যোধনের অনুগ্রহ বরণ করে, আত্মবঞ্চনার মোহে নিজেকে ভুলিয়ে
বসেছি ছদ্ম-ক্ষত্রিয়ের সিংহাসনে।
আর বিনিময়ে বিলিয়ে দিয়েছি আমার স্বাধীনতা।

বিশাল সভাগৃহে দুঃশাসনের লোলুপ আঙুল
যখন ছিঁড়ে নিচ্ছিল দ্রৌপদীর লজ্জা
ক্ষণিকের জন্য আমার তূণীর থেকে তীর উঠে এসেছিল হাতে
আমার কাঙ্ক্ষিতার অপমানে —
পরক্ষণেই করতালিতে ব্যস্ত হয়েছে দু'হাত;
কেননা দুর্যোধন আমার উপকারী বান্ধব, আমার প্রভু।
প্রতিমুহূর্তে দুর্যোধনের ভ্রূকুটি স্থির করে দিচ্ছিল আমার কর্তব্য
আর প্রতিমুহূর্তে নিজের অক্ষম ভীরুতাকে ঢেকে রাখার জন্য
উচ্চরবে প্রচার করেছি আমার শৌর্যের অহংকার।

তারপর এল এই মহালগ্ন। প্রত্যাবর্তনের কোনও পথ নেই;
দুই পক্ষ ভারত সমরে, একদিকে আমার অন্নদাতা, অন্যপক্ষে
আমার মাতার পঞ্চপুত্র। মাঝখানে আমি সুতপুত্র,
রাধার সন্তান, কেউ নই যুযুধান শিবিরের, অন্নের দাসত্ব
তবু টান দেয় স্বেচ্ছাবৃত শৃঙ্খলের পাকে।

রণক্ষেত্র থেকে দূরে, ভাঙা কুটিরে, শুধু দীর্ঘশ্বাস
ফেলে যায় এক নারী, যার নাম রাধা, যার স্বামী সামান্যই রথের সারথি।
মাঝে মাঝে সেই দীর্ঘশ্বাস আমাকে ছুঁয়েছে; ভেবেছি তা বুঝি
উত্তরের হিমেল বাতাস। কানে ভেসে এসেছে মৃদু কান্নার শব্দ
ভেবেছি তা বুঝি দূর দক্ষিণ সমুদ্রের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস।

আর প্রতি সন্ধ্যায়
সূর্যবন্দনার ছলে নামিয়ে রাখতে চেয়েছি
আমার অপরাধের ভার;
চারপাশে গাঢ় হয়ে নেমেছে

শ্মশানের ছায়া;
ফিরিনি তবুও যেখানে স্বদেশ।
কেউ নেই আত্মীয়-বান্ধব, তাদের ফিরিয়েছি নিজে
পরিবর্তে চেয়েছি কৌরব-সম্মান,
যে ছিল স্বজন, রূঢ় অস্বীকারে বিমুখ করেছি তাকে
ভুলেছি স্বস্থান;
আমি ভুলেছিলাম, তাই এই মুহূর্তে আমাকেও ত্যাগ করল
আমার অভ্যস্ত বিদ্যা, আজন্ম-লালিত অস্ত্রজ্ঞান;

অর্জুন, মেদিনী নয়, রথচক্র গ্রাস করছে আমারই সে দ্বিধা।

বড় তৃষ্ণা ওষ্ঠ জ্বালিয়ে নেমে যাচ্ছে বুকের ভেতর
সামনে কে তুমি?
অর্জুন!
একটু সরে দাঁড়াও, আমাকে দেখতে দাও
বিদায় বেলার সূর্য।
আর কার মুখ ঝুঁকে পড়ছে চোখের ওপর!

আমাকে মার্জনা করবেন, পিতা অধিরথ;
আর অর্জুন, আমার তূণীর থেকে তুলে নাও একটি তীর
ধনুকে রোপণ কর জ্যা, দূর গঙ্গাতীরে নিস্তব্ধ কুটিরে
একাকিনী রাধার কাছে পৌঁছে দাও আমার প্রণাম।

আর হে মৃত্তিকা, জীবনে এই প্রথম মাথা রাখলাম
তোমার কোলে; গ্রহণ কর আমাকে।

উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়

মেটামরফসিস

এক বিদেশি গল্পের যুবক নায়ক একদিন ভোরবেলা
ঘুম থেকে উঠে টের পায় সে পোকা হয়ে গেছে।
হাত পা গুটিয়ে গিয়ে শুঁড়, শুয়োর মতন রোঁয়া সারা গায়ে,
থলথলে পোকার শরীরে, আশ্চর্য, সে এক জ্যান্ত মানুষ।
এরপরের ইতিহাস খুবই করুণ। একা ঘরে দিন রাত চলে
তার স্বভাব বদলের সংগ্রাম। পোকার শরীর আর মানুষের স্বভাব—

দুয়ের ভিতর সমঝোতা আনার প্রাণান্ত প্রয়াসে বিফল
যুবক অবশ্য কিছুদিন পর মারা গেল।
গল্পটা অনেকেরই জানা। কাফ্‌কা সাহেব মহানুভব,
যন্ত্রনার হাত থেকে বেচারাকে শেষে মুক্তি দিয়েছেন
কিংবা বলা যেতে পারে, হয়তো এটাই বোঝাতে চেয়েছেন
যে, স্বভাবে মানুষ পোকার শরীরে কখনো বাঁচে না ।
পোকার স্বভাবে পোকা, মানুষ মানুষ,
পোকাদের অভিযোগ নেই প্রতিবাদ নেই ওরা ভয় পায়,
পোকারা পালায় নির্দ্বিধায় সব মেনে নেয়
পোকারা গর্তের জীব সহজে রাগে না, পোকারা বিবেকহীন।
মানুষ তা নয়। অতএব পোকা হয়ে বেঁচে থাকা
মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এ পর্যন্ত বেশ বোঝা যায়।

তবু কথা থাকে । যদি বিপরীত প্রক্রিয়ায় মানব শরীরে
ক্রমিক সংক্রমণ ঘটে পোকার স্বভাব ও অভ্যাস
তখন মানুষ ঠিক কতটা মানুষ আর কতখানি পোকা
এবং পরিবর্তনের পর দুয়ের সহাবস্থান কতটা সম্ভব—
এইসব প্রশ্ন থেকে যায়।

ক্ষমা করবেন মিঃ কাফ্‌কা আপনি মহান লেখক,
তবুও আমায় বলতেই হবে গ্রেগর সামসাকে মেরে ফেলা
আপনার উচিত হয়নি, ভুল হয়েছিল।
আসলে অপনিতো শুধু সম্ভাবনাটাই ভাবছেন
আপনি তো সত্যি দেখেননি, আপনি কি করে জানবেন?

আমি আপনাকে অনুরোধ করছি মিঃ কাফ্‌কা
একবার এইখানে এসে দেখে যান
এই মানুষের দেশে বিনা প্রতিবাদে সব মেনে নিয়ে
আমরা মানুষ কেমন চমৎকার
একটু একটু করে পোকা হয়ে গিয়েও
আশ্চর্য্য, দিব্যি বেঁচে আছি।

কৃষ্ণা বসু

রক্ত-সহোদরা

ছোট এক বোন ছিল আমাদের, চকচকে নুনের পুতুল;
সে বড় সুন্দর ছিল, না ঠিক সুন্দর নয় ততো,
প্রাণের মঞ্জরী হয়ে ফুটেছিল বাড়ির বাগানে।
মাধবী লতার মত মঞ্জুরিত ছিল তার উদ্ভিন্ন যৌবন;
দুই বুকে বেজে উঠেছিল শাঁখ, সমুদ্রের স্বাদ।
চোখে এসে বাসা বেঁধেছিল তার অদ্ভুত ফাল্গুন!
কারা তাকে শিস দিয়ে ডেকে নিয়ে গেল অন্ধকার আমবনে?
কারা তাকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেল মরণের দিকে?
তার সমূহ অস্তিত্ব ছিল মৃত্যুর বিরোধী গান।
বর্ণময় পতাকার সারি ডাক দিয়ে
বাতাসকে আনন্দ জানাত তার রোজ,
সে যে কেন ঢুকে গেল মৃত্যুর অধিক চোরা ঘরে?

ওই পুরোনো বাড়ির বিশাল উঠোনে তাকে শোয়ানো হয়েছে,
উঠোনেই কেন? তার সফেদ শোবার খাট ফাঁকা পড়ে আছে,
সেই নরম বিশ্বাসী শয্যা ছেড়ে কঠিন উঠোনে
ওকে কেন শোয়ানো হয়েছে? গলায় কীসের মালা?
মরণের সঙ্গে তার বিবাহের মালা?
চোখে মুখে চন্দনের অভিমান মাখা?

মাগো, ও আমার ছোট বোন, হায়, রক্ত-সহোদরা,
বাড়ির বাগান থেকে মাধবী লতাটি ছিঁড়ে নিয়ে
আগুন-উৎসবে মেতে উঠেছিল কারা?
কারা তাকে ডেকে নিয়ে গেল মরণের হিম-ঠাণ্ডা চোরা ঘরে?
এরপরে, মা গো, এরও পরে আমরা
'সুসভ্য সমাজ' — এরকম শব্দ সমাবেশ রেখে দেব ফের—
ব্যাকরণে, অভিধানে, সভা সমাবেশে!

একটি সামান্য চিঠি

শ্রী চরণ কমলেষু মাগো,
কেমন রয়েছ তুমি কিছুই জানি না।
আমি ভাল নেই কিছুমাত্র ভাল নেই।
আমি কি সমস্ত ছেড়ে চালে যাবো, মাগো?
কার কাছে যাবো, বলো কে রয়েছে আমাকে নেবার।
তুমিও আশ্রিত জানি দাদার সংসারে।
'জুতিয়ে বেঁকিয়ে দেব মুখ' — বলে তোমার জামাই
কাল রাতে গর্জন করেছে, চড় মেরেছিল জোরে
না, মা, সত্যি জুতো মারেনি এখনো
তবে,
মারবে বলেছে কোনদিন।
কেন বিয়ে দিয়েছিলি মা রে?
দাসী খাটাবার জন্য কেন তুমি আমাকে পাঠালে
চেলি বেনারসী কনে চন্দনের সস্নেহ সুঘ্রাণে?
আজ পনের বছর ধরে ঘর করে,
সেবা করে, সেবা করে, মুখ বুজে থেকে
তার কাছে সত্যি কথা জানতে চেয়েছি,
মাইনের সব টাকা কোনখানে যায়?
স্বাভাবিক অধিকারে জানতে চেয়েছি সব কিছু;
তখনই জুতিয়ে বেঁকিয়ে দেব মুখ বলে আমাকে শাসায়।

মাগো, আমি কার কাছে যাবো,
ছোটন, তোতন খুব ছোট আছে আজও,
ওরা কোন নির্ভরতা দিতে পারে বলো?
বিয়ের পরের বাড়ি, বিয়ের আগের বাড়ি
বলো, কোন বাড়ি আমার নিজের অধিকারে?
মাগো, আমি কার কাছে যাবো?
নাকি, মুখ বুজে, মার খেয়ে, রান্না করে
সেবা করে, 'রমণীরতন' হয়ে জীবন কাটাবো?
মাগো, বলো, আমার নিজের বাড়ি কোনখানে আছে?
মেয়েদের নিজের বাড়ি থাকে কোন দিন?

অজিত বাইরী
খাজনা

দলিলে সব নিকা আছে, দেখে দেন গো বাবু
খাজনা মুকুব হবে কিনা!
কোঁচড়ে কি এনেছিস? ঘুস নিই না,
তা ব'লে তো এমনি এমনিও হয় না।
বড় গরীব গো, বাবু, নুন আনতে পান্‌তা ফুরোয়
তোমরা বাবুলোক, বড় লোক, দেখে দেন গো বাবু, দেখে দেন
খাজনা মুকুব হবে কিনা? জলে নামি গো বাবু
কলমি তুলি, গায়ে হেলে দুলে ওঠে সাপ
কোমরে জড়ায় ঢ্যামনা।
ঘুস নিই না; কিন্তু দিবি, কিছু ভেট তো দিবি।
ঘরেতে আছে একখানি ঘড়া, ছেঁড়া কাঁথা, আধফালি
কাপড় যা আছে পরনে।
কিছু দিবার নাই গো বাবু।
তুই, তুই-ই তো আছিস;
মহাজনের মত তোর ওই দেহের জমিন
তাও দিবি না?

সরোজ দত্ত
রবীন্দ্রনাথ

তোমার কাব্যের বীজ পাথরে পড়িয়া যদি
ফুলে-ফলে না হয় সফল,
পড়িতে পথের পরে পথিক দলিয়া যায়
খেয়ে যায় খুঁটে খাওয়া পাখি,
হাজার আগাছা সাথে মহামূল্য কোন চারা
দূর করে ফেলে দেয় কেহ, —
সে দোষ তাদের যারা দাঁড়ায়ে মাটির পরে
মাটিরেই দিতে চাহে ফাঁকি।
দু'বেলা তাদেরি সাথে দুমুঠো অন্নের লাগি,
আমাদের অশ্লীল সংগ্রামে,

কদর্য কলহে মাতি অন্ধকারে হাতাহাতি,
দীর্ণ দেহ, ছিন্ন বহির্বাস।
তোমার কায়ারে তাই ছায়া ভেবে হেসে উঠি,
তোমার সুধারে বলি সুরা,
জ্বরের বিকারে ঘোরে তোমারে চিনিতে নারি
গালি দিই, করি উপহাস।
তুমি হেসে ঢেলে দাও বলো, "পার ফেলে দাও
মোর কাজ আমি করে যাই,
গানহীন এই দেশে এনেছি গানের গঙ্গা
মানি নাই জুহ্নুর শাসন, —
রোগের দুঃস্বপ্ন আর যন্ত্রণার গর্ভ হতে
আরোগ্যের প্রসন্ন-প্রভাতে
যেদিন জাগিবে তুমি জ্বর-দগ্ধ হে দুর্ভাগা,
পোড়ো তুমি আমার ভাষণ।"
অনাগত মানুষের মগ্ন চেতনার মাঝে
সংখ্যাতীত ভগ্নাংশ তোমার,
কি সৌরভে কি গৌরবে কিভাবে বাঁচিয়া রবে
কোন্ ফুলে হবে কোন্ ফল
সে কথা জানি না আজ, সে কথায় কিবা কাজ,
স্নিগ্ধ হবে কোন প্রয়োজন!
'তোমারে বাঁচাতে হবে' — এই শুধু বুঝিয়াছি
এইটুকু করেছি সম্বল।

শুভ দাশগুপ্ত

আমি সেই মেয়ে

আমিই সেই মেয়ে।
বাসে ট্রেনে ট্রামে রাস্তায় আপনি যাকে রোজ দেখেন
যার শাড়ি, কপালের টিক, কানের দুল আর পায়ের গোড়ালি
আপনি রোজ দেখেন।
আর
আরও অনেক কিছু দেখতে পাবার স্বপ্ন দেখেন।
স্বপ্নে যাকে ইচ্ছেমতন দেখেন।

আমিই সেই মেয়ে।
বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামে দিনের আলোয় যার ছায়া মাড়ানো
আপনার ধর্মে নিষিদ্ধ, আর রাতের গভীরে যাকে বস্তি থেকে
তুলে আনতে পাইক বরকন্দাজ পাঠান আপনি
আর সুসজ্জিত বিছানায় যার জন্য অপেক্ষায় অধীর হয়
আপনার রাজকীয় লাম্পট্য
আমিই সেই মেয়ে।
আমিই সেই মেয়ে — আসামের চাবাগানে ঝুপড়ি কামিন বস্তি থেকে
যাকে আপনি নিয়ে যেতে চান সাহেবি বাংলোয় মধ্যরাতে
ফায়ার প্লেসের ঝলসে ওঠা আলোয় মদির চোখে দেখতে চান
যার অনাবৃত শরীর
আমিই সেই মেয়ে।

রাজস্থানের শুকনো উঠোন থেকে পিপাসার জল আনতে যাকে আপনি
পাঠিয়ে দেন দশ মাইল দূরে সরকারি ইঁদারায় — আর কুড়ি মাইল
হেঁটে ক্লান্ত বিদ্বস্ত যে রমণী ঘড়া কাঁখে ঘরে ফিরলেই যাকে বসিয়ে দেন
চুলার আগুনের সামনে আপনার রুটি বানাতে
আমিই সেই মেয়ে।

আমিই সেই মেয়ে — যাকে নিয়ে আপনি মগ্ন হতে চান গঙ্গার ধারে কিংবা
ভিক্টোরিয়ার সবুজে কিংবা সিনেমা হলের নীল অন্ধকারে, যার
চোখে আপনি এঁকে দিতে চান ঝুটা স্বপ্নের কাজল আর ফুরিয়ে যাওয়া
সিগারেটের প্যাকেটের মত যাকে পথের পাশে ছুঁড়ে ফেলে আপনার ফুল সাজানো
গাড়ি শুভবিবাহ সুসম্পন্ন করতে ছুটে যায় শহরের পথে —
কনে দেখা আলোর গোধূলিতে একা দাঁড়িয়ে থাকা
আমিই সেই মেয়ে।
আমি সেই মেয়ে — এমন কি দেবতারাও যাকে ক্ষমা করেন না। অহংকার
আর শক্তির দম্ভে যার গর্ভে রেখে যান কুমারীর অপমান
আর চোখের জলে কুন্তী হয়ে নদীর জলে
বিসর্জন দিতে হয় কর্ণকে। আত্মজকে।
আমিই সেই মেয়ে।

সংসারের অসময়ে আমিই ভরসা।
আমার ছাত্র পড়ানো টাকায় মায়ের ওষুধ কেনা হয়।
আমার বাড়তি রোজগারে ভাইয়ের বই কেনা হয়।
আমার সমস্ত শরীর প্রবল বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে।

কালো আকাশ মাথায় নিয়ে
আমি ছাতা হয়ে থাকি।
ছাতার নিচে সুখে বাঁচে সংসার।

আপনি
আপনারা
আমার জন্য অনেক করেছেন।
সাহিত্যে কাব্যে শাস্ত্রে লোকাচারে আমাকে
মা বলে পুজো করেছেন।
প্রকৃতি বলে আদিখ্যেতা করেছেন — আর
শহর-গঞ্জের কানাগলিতে
ঠোঁটে রঙ মাখিয়ে কুপি হাতে দাঁড় করিয়েও দিয়েছেন।
হ্যাঁ, আমিই সেই মেয়ে।
একদিন হয়ত
হয়ত একদিন — হয়ত অন্য কোন একদিন
আমার সমস্ত মিথ্যে পোশাক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
আমিই হয়ে উঠবো সেই অসামান্য!
খোলা চুল মেঘের মত ঢাকবে আমার খোলা পিঠ।
দুচোখে জ্বলবে ভীষণ আগুন।
কপাল-ঠিকরে বেরুবে ভয়ঙ্কর তেজরশ্মি।
হাতে ঝলসে উঠবে সেই খড়গ।
দুপায়ের নূপুরে বেজে উঠবে রণদুন্দভি।
নৃশংস অট্টহাসিতে ভরে উঠবে আকাশ।
দেবতারাও আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে বলতে থাকবেন
মহামেঘপ্রভাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভূজাং
কালিকাং দক্ষিণাং মুণ্ডমালা বিভুষিতাং।।
বীভৎস দাবানলের মত
আমি এগোতে থাকবো! আর আমার এগিয়ে যাবার পথের দুপাশে
মুণ্ডহীন অসংখ্য দেহ ছটফট করতে থাকবে—
সভ্যতার দেহ —
প্রগতির দেহ —
উন্নতির দেহ —
সমাজের দেহ —
হয়ত আমিই সেই মেয়ে! হয়ত! হয়ত বা।

চন্দনগাছ

বেলা হল অনেক,
রোদ্দুর ঢলেছে পশ্চিমে
কলকাকলির পাখিরা ডানায় মেখেছে সিঁদুর।
মা, আমি এবার ফিরতে চাই মা।
ঝকঝকে মাঁজা কাঁসার গ্লাসে ঠাণ্ডা জল,
সঙ্গে একটু বাতাসা,
বৃষ্টি ধোয়া রাতে চালে ডালে খিচুড়ির মহাপ্রসাদ,
জ্বরে অসুখে কপালে ঠাণ্ডা হাতের বরাভয়,
আঘাতে বিপদে উদ্বিগ্ন চোখের জল।
মা, আমি আবার এইসব মহার্ঘ আবহে
ফিরে আসতে চাই মা।
মাটির উঠোনের এককোনে তুলসীর মঞ্চ,
তার নিচে শান্ত বেড়াল ছানা,
কাঠচাঁপার ডালে লাল পিঁপড়ে, মৌমাছি।
কুয়োর অনেক নীচে বৃত্তাকার জলছবিতে
টুপটাপ পাতাঝরা ।
বাড়ির পিছনদিকের বাঁশঝাড়ে শৈশবের রাক্ষসী
পেত্নী ব্রহ্মদত্যি।
ঘুম ঘুম বেশি রাতে।
মা, আমি আবার ফিরে যেতে চাই
সেই সব সোনার খনিতে।
মা, আমি ফিরে যেতে চাই।
· তোমার ছায়ায়, তোমার আশ্রয়ে
আবার আমি ফিরে যেতে চাই।

কলকাতায় এঁটো থালা
ফেলে দেওয়া মাটির ভাঁড়ের মতো
বড় বেশী উপেক্ষায়
ফুরোল জীবন, কাটলো সময়।
বাবুদের বাড়ি ইলিশ রান্না হলে ঘ্রাণে
অর্ধেকের বেশী চেটে পুটে খাওয়ার
সপ্নে বিভোর কাজের মেয়েটির মতো
অতৃপ্ত ফুরোল দুপুর,

অভুক্ত রাত।
গলা ফাটিয়ে এই শহরের বিনিদ্র পথে পথে
কতবার বলতে চেয়েছি
সব ঝুট হেয়, সব ঝুট হেয়।
বলতে পারিনি মা।
সাহসে কুলোয় নি।
মোহিনী মুখোশের সামনে নত হয়েছি,
সেলাম ঠুকেছি।
মা, এখানে আর থাকবো না মা।
আমি ফিরে যাবো।
মা, তুমি বলেছিলে—
খোকন চন্দন গাছ হবি, তবে বড় হতে পারবি।
কাটলে ছিড়লে, কোপালে শব্দ করবি না,
কাঁদবি না। তবে হবি বড়।
চন্দনের গন্ধ শুধু ছড়াবি বাতাসে
অকৃপণ অকাতর কাঠুরিয়া সময়কে
দিবি অমূল্য সুবাস।
মা, আমি পারিনি মা।
চন্দন গাছ হতে পারিনি মা।
কথ দিয়ে কথা না রাখা মোহিনী চোখ
কত খুবলে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে
বুকের ভেতর থেকে রক্তমাখা গান,
অশ্রুময় কবিতা, ব্যথার নীল ছবি
বেচেছে চাঁদের হাটে।
খ্যাতি, অর্থ, সম্মানের নীলাজ মোচ্ছবে
আমি চন্দন গাছ হতে চেয়েছিলাম।
কিন্তু আমি হতে পারিনি।
ডালে ডালে পাতায় পাতায় তীব্র বিষ,
বড় জ্বালা।
কলকাতার বেশ্যারা, কলকাতার
বাউন্ডুলে ভিক্ষুকেরা,
কলকাতার বেপরোয়া মাতালেরা
চাদরের খুঁট থেকে বের করে দিতে
চেয়েছে কিছু স্নেহ কিছু মমতা।
আমি তাও নিতে পারিনি অঞ্জলি ভরে।

এ দু হাত সময়ের পদসেবায় ক্ষতবিক্ষত,
অনেক আলোর লোভে
অনেক আলোর জৌলুসে
ছুটে গেছি বার বার ।
মরিয়া পতঙ্গের মতো পুরে গেছে ডানা
আলোর মানুষেরা আলোই চেয়েছে
পাঁজর দিয়েছি খুলে।
সেই হাড়ের হাসিমুখে আগুন জ্বেলেছে।
সেই আঁচে ঝলসে ঠিক নিয়েছে
সাজিয়ে মহার্ঘ আহার।
খ্যাতি, অর্থ , প্রতিষ্ঠার মোগলাই খানা।
এবার আমি ফিরতে চাই মা।
দগ্ধ, ধ্বস্ত, শ্রান্ত আমি একটু ঘুমোতে চাই।
মা, তুমি কি এখনো আছো?
ঝিঁ ঝিঁ ডাক সন্ধ্যায় লণ্ঠনের দীন আলো হাতে,
এখনো কি দরজায় ক্ষীণ চোখে পথ চেয়ে থাকো?
এখনো কি খোকনের জন্য দাও রেখে,
নিজেকে অভুক্ত রেখে ভাত ডাল রুটি?
এবার আমায় ডেকে নাও মা।
চন্দনগাছ হয়ে ওঠা আমার হল না জীবনে।
বিষাক্ত কাঁটা গাছ,
তুমি তো মা, তুমি নাও ডেকে।
আমি জানি সারা পৃথিবীর বুকে একমাত্র
চন্দনগাছ তুমি।
তোমার আশ্রয়ের সুগন্ধে ফেরাও আমাকে মা।

জন্মদিন

আজ পয়লা শ্রাবণ।
খোকন, আজ তোর জন্মদিন।
তুই যখন জন্মেছিলি, আমরা তখন যাদবপুরে
নতুন গড়ে ওঠা কলোনীর টালির ঘরে।
তোর ইস্কুল-মাস্টার বাবা
সেই হ্যারিকেনের আলো জ্বলা ঘরেই

আনন্দে আর খুশিতে ঝলমলে হয়ে উঠেছিলেন—
তুই আসার পর। তোর নাম রেখেছিলেন — সুকল্যাণ।
মানুষটার মনটা ছিল শিশুর মত
অভাবে অনটনে, বেঁচে থাকার নানা দুর্বিপাকেও
ভেঙে পড়তেন না কখনও। সকলের ভাল চাইতেন মন থেকে।
বলতেন দেখো একদিন এই দেশের মানুষ
ঠিক খুঁজে পাবে মুক্তির পথ। শোষণ থেকে মুক্তি
দারিদ্র থেকে মুক্তি অশিক্ষা থেকে মুক্তি...
আজ পয়লা শ্রাবণ
খোকন আজ তোর জন্মদিন।
ছোটবেলায়, তোর মনে আছে? আমাদের ভাঙা মেঝেতে
বাক্স থেকে বার করা মেজমাসীর হাতে-তৈরী আসনটা
পেতে দিতাম। সামনে রাখতাম ঠাকুরের আসরের প্রদীপখানা
তুই বসতিস বাবু হয়ে চুপটি করে।
তোকে আমরা একে একে ধান দুব্বো মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করতাম।
বাবা বলতেন বড় হও, মানুষ হও।
তোর বাবার সেই বন্ধু — ঘোষ কাকু — তিনি বলতেন
বেঁচে বর্তে থাকো।
তুই জিগ্যেস করতিস — মা, বর্তে মানে কি মা?
আমি শুধু তোর মাথায় ধান দুব্বোই দিতাম।
বলতাম না কিছুই। শুধু মনে মনে বলতাম
ঠাকুর। আমার খোকনকে মস্ত বড় মানুষ করে তোলো
আমার খোকন যেন সত্যিই মানুষ হয়।
ওর যেন কখনো কোনো বিপদ না হয় — ঠাকুর
অভাবের সংসারে ঐ একটা দিন — পয়লা শ্রাবণ
কষ্টের পয়সার একটু বাড়তি দুধ নিতাম।
পায়েস রান্না করে দিতাম তোকে।
তুই খুব ভালবাসতিস পায়েস খেতে।
তোর বাবা বাসস্টাণ্ডের দোকান থেকে নিয়ে আসতেন
তোর প্রিয় মিষ্টি ছানার গজা।
সামান্য ইস্কুল মাস্টারিতে কীই বা আর হত!
ঘরে বসে ছাত্র পড়িয়ে আসতো কিছু।
দাউ দাউ অভাবের আগুনে সে রসদ পুড়তে সময় লাগত না।
তোর বাবার জামা সেলাই করতাম আর বার বার বলতাম ঃ
আসছে মাসে একটা জামা বানিয়ে নিও।

উনি হেসে উঠে বলতেন ঃ বাদ দাও তো, খোকন বড় হচ্ছে।
ওর জন্য ভাবছি দুধ রাখতে হবে আরো আধ সের—
দুধে শক্তি বাড়ে, বুদ্ধি বাড়ে। শক্তি আর বুদ্ধি না হলে
তোমার খোকন মস্ত বড় মানুষ হয়ে উঠবে কী করে?
ভাবছি আরো দুটো টিউশনি নেব।
ছাত্র পড়িয়ে পড়িয়ে মানুষটা দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে যেতেন।
বারান্দার ধার ঘেঁষে যখন রাতের অন্ধকারে জোনাকির ব্যস্ততা,
আর ঘরে তোর পড়া মুখস্থ করার একটানা সুর
আমাদের কলোনীর ভাঙাচোরা বাড়িটাকে জীবন্ত করে রাখতো—
তখন বলতেন আমায় ঃ খাওয়া দাওয়া একটু করো — তোমার চেহারাটা
বড় ভেঙে পড়ছে দিনদিন .. শাড়িটাও তো দেখছি বেশ ছিঁড়েছে—
কালই আমি ফেরার পথে একটা শাড়ি নিয়ে আসব। ধারেই আনব।
আমি বলতাম — ধুর। সামনে খোকনের উঁচু ক্লাস—
কত বই পত্তর কিনতে হবে — কত খরচ।
উনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে যেতেন।
জোনাকিরা নিঃশব্দে অদৃশ্য আলোর আলনা আঁকত
উঠোনের আগাছার ঝোপে।
আবহ সঙ্গীতের মত তুই ভেতর ঘরে বসে পড়া মুখস্থ করতিস
ইতিহাস, ভূগোল, গ্রামার।
ঈশ্বর আমাদের নিরাশ করেননি।
তুই কত বড় হলি।
সব পরীক্ষায় কত ভাল ফল হল তোর।
বাবা বললেন ঃ আরও পড়। উচ্চ শিক্ষাই উচ্চ সম্মানের
একমাত্র পথ। তুই আরও পড়লি।
তারপর ...
তোর চাকরি হল কত বড় অফিসে
মনে আছে খোকন? প্রথম মাসের মাইনে হাতে পেয়েই
তুই কত কী কিনে এনেছিলি?
তখন তো আমরা উঠে এসেছি শ্যামবাজারে।
দু কামরার বেশ সাজানো গোছানো বড় ফ্ল্যাট।
তোর অফিস থেকেই তো দিয়েছিল।
সেই বাড়ি সেই ঘর সেই ব্যালকনি — কত স্মৃতি কত ছবি!
ঐ বাড়িতেই তো
আশ্বিনের এক ঝোড়ো বিকেলে — তোর মনে আছে খোকন?
তোর বাবা যেদিনটাতে চলে গেলেন — মনে আছে?

তুই বাবার বুকের ওপর পড়ে যখন কাঁদছিলি হাপুস নয়নে
সদ্য স্বামী হারার আমি সেদিন তোর সেই অসহায় মুখ দেখে
আরো বেশি করে ভেঙে পড়েছিলাম।
তোকে বুকে টেনে নিয়েছিলাম ছোটবেলার মত।
বলেছিলাম —
কাঁদিস না খোকন। আমি তো আছি।
আজ পয়লা শ্রাবণ।
কলকাতা থেকে অনেক দূরে মফস্বলের এই বৃদ্ধাশ্রমে
আমি একেবারে একা, খোকন।
তোকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে রে।
তোকে, বৌমাকে আর ছোট্ট বিল্টুকে।
তোরা এখন কত দূরে—
সল্টলেকের মার্বেল বসানো ঝকঝকে বাড়িতে।
আজ তোর জন্মদিনে নিশ্চই খুব বড় পার্টি হচ্ছে—
তাই না রে খোকন? লোকজন, হৈচৈ খাওয়া দাওয়া।
খুব ভাল। খুব ভাল।
খোকন। আজ পয়লা শ্রাবণ।
আমার বড় মনে পড়ছে — যাদবপুরের ভাঙা ঘরে রাত্তিরে
তুই আমার পাশে শুয়ে মাঝে মধ্যে হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে
জড়িয়ে ধরতিস আমাকে। আমি বলতাম, ভয় কীরে?
আমি তো আছি। মা তো আছে খোকনের যার মা থাকে
তাকে কি ভূতে ধরে?
তুই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তিস আমার বুক জুড়ে।
তোর আধুনিক সংসারে
এই বুড়িটার একটু ঠাঁই হল না রে?
প্রতিমাও তো মা। ওর তো আছে আমার খোকনেরই মত
কোল আলো করা এক চাঁদের টুকরো!!
কিন্তু সময়ের কী আশ্চর্য পরিবর্তন!
খোকন!
তুই বোধহয় আর এখন পায়েস খাস না — তাই নারে?
তুই জানিস না খোকন
আজ আমি সকালে পায়েস রান্না করেছি। হ্যাঁ
তোরই পাঠানো টাকায়।
সারাদিন সেই পায়েসের বাটি সামনে নিয়ে বসে আছি রে।
এখানে এই বৃদ্ধাশ্রমে

আমার একলা ঘরে
আর কেউ নেই।
তুই একবার অসবি খোকন
একবার ... শুধু
একবার।

জয় গোস্বামী
মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়

বেণীমাধব, বেণীমাধব তোমার বাড়ি যাবো
বেণীমাধব, তুমি কি আর আমার কথা ভাবো
বেণীমাধব, মোহন বাঁশি তমাল তরুমূলে
বাজিয়েছিলে, আমি তখন মালতী ইস্কুলে
ডেস্কে বসে অঙ্ক করি, ছোট্ট ক্লাসঘর
বাইরে দিদিমণির পাশে দিদিমণির বর
আমি তখন নবম শ্রেণী, আমি তখন শাড়ি
আলাপ হলো, বেণীমাধব, সুলেখাদের বাড়ি
বেণীমাধব, বেণীমাধব লেখাপড়ায় ভালো
শহর থেকে বেড়াতে এলে, আমার রঙ কালো

তোমায় দেখে এক দৌড়ে পালিয়ে গেছি ঘরে
বেণীমাধব, আমার বাবা দোকানে কাজ করে
কুঞ্জে অলি গুঞ্জে তবু, ফুটেছে মঞ্জুরী
সন্ধ্যেবেলা পড়তে বসে অঙ্কে ভুল করি
আমি তখন নবম শ্রেণী, আমি তখন ষোলো
ব্রিজের ধারে, বেণীমাধব, লুকিয়ে দেখা হলো
বেণীমাধব, বেণীমাধব, এতদিনের পরে
সত্যি বলো, সেসব কথা এখনো মনে পড়ে?
সেসব কথা বলেছো তুমি তোমার প্রেমিকাকে?
আমি কেবল একটি দিন তোমার পাশে তাকে
দেখেছিলাম আলোর নিচে অপূর্ব সে আলো।
স্বীকার করি, দুজনকেই মানিয়েছিলো ভালো
জুড়িয়ে দিলো চোখ আমার, পুড়িয়ে দিলো চোখ

বাড়িতে এসে বলেছিলাম, ওদের ভালো হোক।
রাতে এখন ঘুমোতে যাই একতলার ঘরে
মেঝের উপর বিছানা পাতা, জ্যোৎস্না এসে পড়ে
আমার পরে যে বোন ছিলো চোঁড়া পথের বাঁকে
মিলিয়ে গেছে, জানিনা আজ কার সঙ্গে থাকে
আজ জুটেছে কাল কী হবে? — কালের ঘরে শনি
আমি এখন এই পাড়ায় সেলাই দিদিমণি
তবু আগুন, বেণীমাধব, আগুন জ্বলে কই?
কেমন হবে আমিও যদি নষ্ট মেয়ে হই?

টিউটোরিয়াল

তোমাকে পেতেই হবে শতকরা অন্তত নব্বই (বা নব্বইয়ের বেশি)

তোমাকে হতেই হবে একদম প্রথম
তার বদলে মাত্তর পঁচাশি!
পাঁচটা নম্বর কেন কম? কেন কম?
এইজন্যে আমি রোজ মুখে রক্ত তুলে খেটে আসি?

এই জন্যে তোমার মা কাক ভোরে উঠে, সব কাজকর্ম সেরে
ছোটবেলা থেকে যেতো তোমাকে ইস্কুলে পৌঁছে দিতে?
এইজন্যে কাঠফাটা রোদ্দুরে কিং প্যাচ প্যাচে বর্ষায়
সারাদিন বসে থাকতো বাড়ির রোয়াকে কিংবা পার্কের বেঞ্চিতে?

তারপর ছুটি হতে, ভিঁড় বাঁচাতে মিনিবাস ছেঁড়ে
অটো-অলাদের ওই খরাপ মেজাজ সহ্য করে
বাড়ি এসে না হাপিয়ে আবার তোমার পড়া নিয়ে
বসে পড়তো যতক্ষণ না আমি বাড়ি ফিরে
তোমার হোমটাস্ক দেখছি — তারপর আঁচলে মুখ মুছে
ঢুকতো গিয়ে ভ্যাপসা রান্নাঘরে?
এইজন্যে? এইজন্যে হাড়ভাঙা ওভারটাইম করে
তোমার জন্য আন্টি রাখতাম?
মোটা মাইনে, ভদ্রতার চা জলখাবার
হপ্তায় তিনদিন, তাতে কতখরচা হয় রে রাস্কেল?
বুদ্ধি আছে হিসেব করবার?

শুধু ছোট কালে, নয়, এখনো যে টিউটোরিয়ালে
পাঠিয়েছি, জানিস না , কীরকম খরচাপাতি তার?
ওখানে একবার ঢুকলে সবাই প্রথম হয়! প্রথম, প্রথম!
কারো অধিকার নেই দ্বিতীয় হওয়ার।

রোজ যে যাস, দেখিস না কত সব বড়
বাড়ি ও পাড়ায়!
কত সব গাড়ি আসে, কত বড় গাড়ি করে
বাবা মারা ছেলেমেয়েদের নিতে যায়?
আর ওই গাড়ির পাশে পাশে না পিছনে — ওই অন্ধকারটায়
রোজ দাঁড়াতে দেখিস না নিজের বাবাকে?
হাতে অফিসের ব্যাগ, গোপন টিফিন বাক্স, ঘেমো জামা, ভাঙা
মুখ—
দেখতে পাস না? মন কোথায় থাকে?
ওই মেয়েগুলোর দিকে? যারা তোর সঙ্গে পড়তে আসে?
ওরা তোকে পাত্তা দেবে? ভুলেও ভাবিস না! ওরা কত
বড়লোক!
তোকে পাত্তা পেতে হলে থাকতে হবে বিদেশে, ফরেনে!
এন. আর. আই হতে হবে! এন. আর. আই . এন. আর. আই!
তবেই ম্যাজিক দেখবি
কবিসাহিত্যক থেকে মন্ত্রী অব্দি একডাকে চেনে!
আমাদেরও নিয়ে যাবি, তোর মাকে, আমাকে,
মাঝে মাঝে, রাখবি নিজের কাছে এনে।

তার জন্য প্রথম হওয়া দরকার প্রথমে!
তালেই ছবি ছাপবে খবর কাগজ
আরো দরজা খুলে যাবে, আরো পাঁচ, আরো পাঁচ,
আরো আরো পাঁচ...
পাঁচ পাঁচ করেই বাড়বে, অন্য দিকে মন দিস না,
বাঁচবি তো বাঁচার মতো বাঁচ!
না বাপী না, না না বাপী, আমি মন দিই না কোনোদিকে
না বাপী না, না না আমি তাকাই না মেয়েদের দিকে
ওরা পাশেই বসে, কেমন সুগন্ধ আসে, কথা বলে, না না বাপী,
পড়ার কথাই
দেখি না, উত্তর দিই, নোট দিই নোট নিই, যেতে আসতে পথে ঘাটে
কত ছেলেমেয়ে গল্প করে
না বাপী না, না না আমি মেয়েদের সঙ্গে মিশতে যাই না কখনো
যেতে আসতে দেখতে পাই কাদা মেখে কত ছেলে বল খেলছে মাঠে

কত সব দুষ্টু ছেলে পার্কে প্রজাপতি ধরছে চাকা বা ডাঙ্গুলি খেলছে
কত ছোটলোক
না আমি খেলতে যাই না কখনো, খেলতে যাইনি না আমার বন্ধু নেই
না বাপী না, একজন আছে অপু, এক ক্লাসে পড়ে...
ও বলে যে ওর বাবাও বলেছে প্রথম হতে, বলেছে কাগজে ছবি,
ওর বাবা ওকে...
হ্যাঁ বাপী হ্যাঁ, না না বাপী, অপু বলছে পড়াশোনা হয়নি একদম
বলেছে ও র‍্যাঙ্ক পাবে, র‍্যাঙ্ক পেলে ও বলেছে, বাড়িতে কোথায়
বাথরুম সাফ করার অ্যাসিড রয়েছে জানে,
হ্যাঁ বাপী হ্যাঁ, ও বলেছে
উঠে যাবে কাগজের প্রথম পাতায়....

সুবোধ সরকার
শাড়ি

বিয়েতে একান্নটা শাড়ি পেয়েছিল মেয়েটা
অষ্টমঙ্গলায় ফিরে এসে আরো ছটা
এত শাড়ি একসঙ্গে সে জীবনে দেখেনি।

আলমারির প্রথম থাকে সে রাখল সব নীল শাড়িদের
হালকা নীল একটাকে জরিয়ে ধরে বলল, তুই আমার আকাশ
দ্বিতীয় থাকে রাখল সব গোলাপীদের
একটা গোলাপীকে জড়িয়ে সে বলল, তোর নাম অভিমান
তৃতীয় থাকে তিনটে ময়ুর, যেন তিন দিক থেকে ছুটে আসা সুখ
তেজপাতারং যে শাড়িটার, তার নাম দিল বিষাদ।
সারা বছর সে শুধু শাড়ি উপহার পেল
এত শাড়ি সে কি করে এক জীবনে পরবে?

কিন্তু বছর যেতে না যেতে ঘটে গেল সেই ঘটনাটা
সন্ধের মুখে মেয়েটি বেরিয়েছিল স্বামীর সঙ্গে চাইনিজ খেতে
কাপড়ে মুখ বাঁধা তিনটি ছেলে এসে দাঁড়াল
স্বামীর তলপেটে ঢুকে গেল বারো ইঞ্চি
ওপর থেকে নিচে। নিচে নেমে ডানদিকে।

পড়ে রইল খাবার, চিলি ফিস থেকে তখনো ধোঁয়া উঠছে।
এর নাম রাজনীতি বলেছিল পাড়ার লোকেরা।

বিয়েতে একান্নটা শাড়ি পেয়েছিল মেয়েটা
অষ্টমঙ্গলায় ফিরে এসে আরো ছটা
একদিন দুপুরে, শাশুড়ি ঘুমিয়ে, সমস্ত শাড়ি বের করে
ছ'তালার বারান্দা থেকে উড়িয়ে দিল নিচের পৃথিবীতে।
শাশুড়ি পড়িয়ে দিয়েছেন তাকে সাদা থান
উনিশ বছরের একটা মেয়ে, সে একা।

কিন্তু সেই থানও একঝটকায় খুলে নিল তিনজন, পাড়ার মোড়ে
একটি সদ্য নগ্ন বিধবা মেয়ে দৌড়চ্ছে আর চিৎকার করছে, বাঁচাও
পেছনে তিনজন, সেকি উল্লাস, নির্বাক পাড়ার লোকেরা।
বিয়েতে একান্নটা শাড়ি পেয়েছিল মেয়েটা।

ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট

মাকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রেখে বেরিয়ে এলাম
আমার কাঁধে এসে বসল একটা প্রজাপতি।

টাকা তুলতে বেরোলাম, অফিস বলল, রাইটার্স থেকে
লিখিয়ে আনুন, রাইটার্স বলল, মন্ত্রীকে বলুন,
মন্ত্রীর পি.এ. বললেন, আজ সকাল দশটায়
মন্ত্রীকেই ইনটেনসিভ কেয়ারে দিতে হয়েছে, পরে আসুন।

কিন্তু মাকে বাঁচাতে হলে টাকা দরকার।
প্রজাপতি এসে আর একটা কাঁধে বসল
ভাই প্রজাপতি, তুমি কিছু বলবে?

চেয়ারমান বোস একটা ঠিকানা দিয়ে বললেন—
এই মহিলার কাছে যান, ইনি মুমূর্ষু মায়ের
যুবক ছেলেদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন
হাতে ঘন্টা দুয়েক সময় নিয়ে যাবেন।

চেয়ারম্যান বোস বললেন, বয়েস হয়েছে আপনার মায়ের
কিছু মনে করবেন না, ডাক্তারকে বলে
ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের সুইচটা বন্ধ করে দিন।
ঠিকই বলেছিলেন তিনি, কিন্তু রাইটার্স থেকে বেরিয়ে মনে হল
শুধু রাইটার্স নয়, সেন্ট্রাল এভিনিউ নয়, এপাশে হাওড়া ওপাশে শিয়ালদা
দুটো ক্ষয়ে যাওয়া ফুসফুস নিয়ে, গোটা কলকাতা একটা
বিরাট ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের মধ্যে ধকধক করছে।

ঘাড়ে বসে থাকা প্রজাপতিকে বললাম, ভাই কিছু বলবে?
সে বলল, আমি আগে বিয়ে না হওয়া ছেলেমেয়েদের
আশেপাশে ঘুরঘুর করতাম। এখন মুমূর্ষুর কাঁধে বসে থাকি।
নগর উন্নয়ন মন্ত্রী খপ করে প্রজাপতিটাকে ধরে বললেনঃ
নিউইয়র্ক নয়, মস্কো নয়, টোকিও হংকং নয়
একমাত্র কলকাতাতেই এখনো প্রজাপতি পাওয়া যায়,
একমাত্র কলকাতাতেই।
এটাই হবে আমাদের পরবর্তী বিজ্ঞাপন।
আমি চোখ মুছে বললাম, ইনটেনসিভে শুয়ে থাকা আমার মায়ের কী হবে,
আমার মায়ের?

মল্লিকা সেনগুপ্ত
নান্দী মুখ

মাটি জল বায়ু অগ্নি এবং মানুষ
ভারতবর্ষ তোমাকে প্রণাম করেই
সেই ইতিহাস কোণঠাসা নারী আমরা
শুরু করলাম কথামানবীর ভাষ্য

আমি জিভ কেটে নেওয়া খনার বচন
সাগরে পাহাড়ে আকাশে
যুগ যুগ ধরে পথে পথে আমি হাঁটছি
আমি কল্পনা চাওলার থেকে কুন্তি
সীতা থেকে রূপ কানোয়ারে আমি, আমরা
আমার বুকেই আনারকলির কান্না
সরস্বতীর তীর থেকে আমি মেধা পাটেকর লড়ছি
আদিমানবীর নাভিকুণ্ডলি থেকে সারোগেট জননী

আমি দ্রৌপদী, রূপান বাজাজ আমরা
আমার বস্ত্রহরণ চলছে হস্তিনাপুরে, হাওড়ায়
বুক ফাটে মুখ ফোটে না আমার এখনও
পার্টি তাড়িত পঞ্চায়েতের নেত্রী
গর্ভে নিহত কন্যাভ্রূণের রক্ত
বছর বিয়োনি মুক ও বধির ঘরণী
বৃষ্টি আমিই আগুন আমরা প্রজ্ঞা
আইনে শিশুর অভিভাবক না আমরা
এই দেশটাকে গর্ভে ধরেছি তবুও
আশ্লেষে বুকে জড়িয়েছি এই মাটিকে
এর ঔরসে জন্মেছি ভুমিকন্যা
আমার দুঃখ দহন ভিতরকণিকা
ভালবাসা জলে আমার স্নানের আর্তি
শোনাতে এসেছি জনতার সভাকক্ষে
নারীর ভাষ্য কথামানবীর ভাষ্য
তোমাকে প্রণাম করেই ভারতবর্ষ।

হ্যাঁ আমি কথামানবী। ঋগ্বেদ থেকে একুশ শতক পর্যন্ত আমার বিচরণকাল। ইতিহাসের ছাই এবং ভস্মের মধ্যে নারী নামক যে আগুন চাপা পড়ে আছে আমি তারই ভাষ্যকার। আমি আগুনের আত্মকথন। আমি কান্না পড়ি, আগুন লিখি, নিগ্রহ দেখি, অঙ্গার খাই, লাঞ্ছিত হই, আগুন লিখি। এই আগুন বেদনার প্রতিবাদের, আত্মমর্যাদার, ভালবাসারও। আগুন মরে গেলে মানুষ মরে যায়। আগুনের কথাকারকে মানুষ সহজে মেনে নিতে পারে না । আমাকেও পারে না। মেয়েদের মুখ থেকে কঠিন কথা শুনতে অনেকে অস্বস্তিতে পড়েন। তাদের সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়। তারা আমাকে আজব চিড়িয়া ভাবেন। দেখা হওয়ার পর, মেলামেশার পর তারা বলেন ওমা তুমি তো দেখছি টিপও পড়। খোঁপাও বাঁধ! কি আশ্চর্য! আমি তোমাকে অন্য রকম ভেবেছিলাম ।
বলেন, বাঃ তুমি তো বেশ ছেলের যত্ন কর! কি আশ্চর্য । তোমার লেখা পড়ে মনেই হয় না! বলেন, আপনারা তো দেখছি, যাকে বলে, বেশ 'হ্যাপি কাপল্'! তাহলে আপনি ওরকম সব রাগী রাগী লেখা লেখেন কেন!
বলেন, তুমি তোমার লেখার ঠিক উল্টো, নরমসরম কথা বল, দেখেও নরম মনে হয়, অথচ লেখ গরম গরম।
আচ্ছা, আপনারাই বলুন তো, কথামনবী কি কোনোদিনও লিখেছে যে প্রতিবাদ করতে হলে টিপ পরা চলবে না, কারও যত্ন করা যাবে না, কাউকে ভালোবাসা যাবে না! আমি তো বলি ভালোবাসলেও যুদ্ধ করুন, দেখতে নরমসরম হলেও লেখাটা

যেন গরম হয়। না হলে তো সমানে সমানে টিঁকে থাকা যাবে না। হে পুরুষ, হে আবহমানের সঙ্গী, যদি জিজ্ঞেস কর, তোমার কাছে কি ব্যবহার আশা করি, আমি বলব মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার, যেরকম পুরু বলেছিলেন আলেকজান্ডারকে, রাজার সঙ্গে রাজার ব্যবহার, তোমরা আমাদের ভালবেসেছ, পীড়ন করেছ, মানুষ কিন্তু ভাবনি, আমি তো প্রতিবাদ করবই। তখনও করেছিলাম, সেই যখন আমার নাম ছিল, কৃষ্ণা, দ্রৌপদী, যাজ্ঞসেনী ....

দ্রৌপদী জন্ম

হস্তিনাপুরের এক গৃহবধূ, সেই আমি আবার জন্মেছি
ভারতবর্ষের দিকে যে মেয়েটি এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিল—

স্ত্রী কে পণ রাখবার অধিকার কে দিল স্বামীকে?
তার মত প্রতিবাদী হাজার বছর ধরে কখনও দেখেছ !

সেই দিন নেহাগ্রস্ত রাজা যুধিষ্ঠির
ভারত কাপানো সেই কু প্রস্তাব পেশ করলেন

যিনি নন অতিখর্বা, অতি কৃষ্ণা, কৃশা বা রক্তাভ
পদ্মপলাশ চোখ সেই নারী দ্রৌপদীকে পণ রাখলাম...

পৃথিবী তখনও কিন্তু ধ্বংস হয়ে যায়নি মানুষ!
ভারতের ইতিহাসে বাকি ছিল আরও দুর্ঘটনা

সভাঘর ক্ষুব্ধ হল, বৃদ্ধেরা ধিক্কার দিল, ভীষ্ম হতবাক
সেইদিন, আপনারা জানেন, বিদুর এবং গুরু দ্রোণাচার্য

দু'হাত মাথায় দিয়ে চুপচাপ মোহগ্রস্থ বসে রইলেন
খুশি গোপন না করে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, কে? কে জিতল? কে?

পিনপতনের শব্দ শোনা যায়, সভাঘর এমন নীরব
দুই পক্ষ উদগ্রীব। শকুনির পাশা বলে উঠল— জিতেছি

উল্লাসে পাগল কর্ণ হেসে উঠলেন আর ওই দুর্যোধন
বললেন, প্রাতিকামী, দাসী দ্রৌপদীকে নিয়ে এস সভাঘরে

আমার প্রথম স্বামী অধোমুখ, দ্বিতীয়ের অবরুদ্ধ ক্রোধ
শান্ত করেন তৃতীয়। ফাল্গুন তুমিও এত ক্লীব ছিলে হায়!

আমি প্রশ্ন পাঠালাম —'প্রাতিকামী, জেনে এস প্রাজ্ঞদের কাছ থেকে
নিজেকে না দ্রৌপদীকে, ধর্মরাজ কোন বাজি আগে হেরেছেন!

উত্তর এল না কোনও। পরিবর্তে ধর্মরাজ বলে পাঠালেন
রজঃস্বলা একবস্ত্রা, কাঁদতে কাঁদতে তুমি শ্বশুরের সামনে দাঁড়াও

টেনে ধরলেন চুল দুঃশাসন এসে, সেই মেঘবর্ণ চুল
যেখানে ফাল্গুন তুমি মুখ গুঁজে শুয়েছিলে নরম নিশীথে

কন্দর্প নিন্দিত কান্তি ভীমসেন এই চুলে খেলা করতেন
এই চুলের সুগন্ধে স্নায়ু শান্ত রাখতেন রাজা যুধিষ্ঠির

মাতৃহারা সহদেব এবং নকুল এই চুলের রহস্যে
ভুলে থাকতেন শোক। স্বয়ং জননী কুন্তী এই চুলে খোঁপা বানাতেন

দুঃশাসন সেই চুল টানতে টানতে এনে প্রকাশ্য সভায়
দাঁড় করালেন এক অসূর্যম্পশ্যা মহিষীকে।
তোমরা পুরুষজন, বাঁ হাতে নারীকে ঠেলে অন্দরে পাঠাও
ডানহাতে তোমরাই গা থেকে কাপড় টেনে খুলে নাও উন্মুক্ত বাজারে

তোমরা বিধান দাও, তোমরাই বোবা হয়ে থাক
পুরুষে পুরুষে যুদ্ধ, প্রতিশোধ রমনীর শ্লীলতাহানিতে

স্খলিত বসনে সভা ঢেকে গেল, দ্রৌপদীর শাড়ি খুলল না
তন্তুর কৌশলে আমি প্রমত্ত কৌরবঘরে লজ্জা রাখলাম

ওরে দুঃশাসন শোন, শত দেবতাও এসে তোকে বাঁচাবে না
মহাযুদ্ধে পাণ্ডবেরা প্রতিশোধ নেবে এই দারুণ লজ্জার

ধিক কুরুবৃদ্ধগণ, ধিক্ ঠুঁটো জগন্নাথ ভারতবাসীকে
আপনারা চুপ চাপ বসে দেখলেন এই অধর্মের জয়!

শাড়ি শাড়ি আর শাড়ি রেশমের সাতরঙে ঢেকে গেল কৌরবের সভা
তবু গিঁট খুলল না, লজ্জা বস্ত্রটুকু তবু থেকে গেল দুঃসপ্ন শরীরে

শরীর দুঃসপ্ন কেন? লেলিহান এ শরীর ছুঁতে চেয়ে পুড়ে গেছে নগর বন্দর
এই মুখ চুম্বকের মতো টেনে এনেছিল নদীতীরে অসংখ্য তরণী

আমার মতোই এক অভিশপ্ত রূপসী না আমিই স্বয়ং?
কে যেন আমার মুখ দেখে বলেছিল থেমে থাকা ইতিহাস!

তোমার সৌন্দর্য দেখে অন্য সব নারীদের বানরি লাগছে—
কে বলেছে? বলেছিল জয়দ্রথ বনবাসে তাড়া করে এসে—

হে পুরুষ!
রূপ দেখলেই কেন হাতের মুঠোয় চাও জ্যান্ত মানবীকে!
না পেলে তারই শাড়ি টেনে ধরে অশ্লীল হাসিতে

তার মুখ কালো করে দিতে চাও। বলো —
দ্রৌপদীর বহু পতি, বেশ্যা অতএব

আমি যদি বেশ্যা হই, তুমিও পুরুষ বেশ্যা কর্ণ মহামতি!
তোমারও শয্যায় আসে বহু পত্নী, বিবিধ স্ত্রীলোক

তুমি যে নিয়মে চল সে নিয়মে অধিকার আমারও থাকুক
তোমরা যে গ্রন্থ লেখ সেই গ্রন্থ আমরাও ঠল্টে দিতে পারি

শোন কর্ণ, শোন সভাজন
তোমাদের ছাঁইপাশ বিধিনিষেধের দিকে একটি বঙ্কিম প্রশ্ন আমি

যখন আমি প্রশ্ন করি
তোমরা ভয় পাও
ভীষ্ম পিতামহ আমার
তুমিও মুখ লুকাও!

ধৃতরাষ্ট্র বলুন, আমি
কলঙ্কের যোগ্য কিনা আজ
শৃগাল গাধা উঠল ডেকে
অশুভ সব শব্দ মহারাজ

দুর্যোধন উরু দেখান
উরুর নীচে শানিত অপমান
হতচেতন যুধিষ্ঠির
বোঝেন না তো কিছুই মহাপ্রাণ!

ঝড়ের মতো ফুঁসে ওঠেন
একাই ভীমসেন
অর্জুনের আঙুল তাকে
শান্ত রাখছেন

এত সকল কাণ্ড শেষে
ধৃতরাষ্ট্র আসরে নামলেন

বলেন তিনি, কৃষ্ণা তুমি
কি বর চাও বল

তারপর আমি দু'টিমাত্র বর চাইলাম। প্রথম, হে পিতা, যদি প্রসন্ন থাকেন তো এই বর দিন যে সর্বধর্মচারী যুধিষ্ঠির যেন দাসত্ব থেকে মুক্ত হন। দ্বিতীয় বরে দাসত্বমুক্ত হোক বীরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। বর চেয়েছিলাম করজোরে, দাঁতে দাঁত চেপে, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম আর অর্জুনের গাণ্ডীবের প্রতি আমার সমস্ত সন্দেহ অপ্রকাশিত রেখে। বিশ্বন্দিত স্বামীদের প্রতি আমার ক্রোধ ও সন্দেহ তো প্রকাশ করা যাবে না, সভাজনের কাছে তারা হাস্যাস্পদ হবেন। ধৃতরাষ্ট্র তৃতীয় বর তারা নিতে অনুরোধ করলেন। আমি নিলাম না । কারন হে, সভাজন, লোভে ধর্মনাশ হয়। বৈশ একবর, ক্ষত্রিয়াণী দুই বর, রাজা তিন বর এবং ব্রাহ্মণ একশত বর নিতে পারেন। আপনাদের মহাগ্রন্থে এই বিধান আছে। যে রাজ্যপাট যুধিষ্ঠির নিজদোষে হারিয়েছেন অমি তৃতীয় বর চেয়ে সেই রাজ্য ফেরত চাইব না। রাজ্য উদ্ধার করবেন আমার পৌরুষগর্বী স্বামীরা, কারণ আপানাদের মহাগ্রন্থে রাজত্ব বিস্তারই পৌরুষের শর্ত। আমার এই আশ্চর্য সিদ্ধান্তে সভা হতবাক হল। শুধু কর্ণ বললেন, দ্রৌপদী দুঃখ সাগরে ডুবে থাকা পাণ্ডবদের নৌকার মতো পার করলেন। ইতি পূর্বে আর কোনও নারী এরকম কাজ করেছেন বলে শুনিনি। আমার স্বামীরা মাথা নিচু করে বসে থাকলেন।

এছাড়া আর কিইবা আমি করতে পারতাম!
অনেক পরে আমার ক্রোধ বিস্ফারিত হল
যেদিন বনবাসের ঘরে কৃষ্ণ এসে সামনে দাঁড়ালেন
কৃষ্ণ তুমি এসেছ যদি শোনো আমার কথা
আমার কোনও যুধিষ্ঠির ভীমার্জুন নেই
আমার কোনও পুরুষ নেই দয়িত নেই
বন্ধু নেই পিতা বা ভ্রাতা নেই
আমার কোনও সমাজ নেই পায়ের মাটি নেই
মধুসূদনতুমিও নেই তুমিও পাশে ছিলে না সেই দিন

আমাকে যারা শোণিতময় দেখেও হেসেছিল
আমাকে যারা কলুষ হাতে স্পর্শ করেছিল
এখনও তারা পৃথিবী জুড়ে দাপটে বেঁচে আছে
এবং আমার স্বামীরা আজ সন্ধি চাইছেন!
ধিক আমার বেঁচে থাকার দুঃখ-ইতিাসে

তাহার পদ্মকোষের মতো দুই হাতে মুখ ঢেকে আমাকে কাঁদতে দেখে কৃষ্ণ বললেন, ভাবিনী, তুমি যাদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছ তারা ধ্বংস হবে অর্জুনের শরে আচ্ছন্ন হয়ে

মাটিতে শোবে। তুমি রাজমহিষী হবে। যদি আকাশ পতিত হয়, হিমালয় শীর্ণ হয়, পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হয়, সমুদ্র শুষ্ক হয়, তথাপি আমার বাক্য ব্যর্থ হবে না।

আমার অপমানের ক্ষতে
সেই প্রথম মলম পড়েছিল
আমার মরুভুমির বালি
সেই প্রথম অশ্রু শিখেছিল
কৃষ্ণ তুমি আমার মনে
সেই প্রথম বন্ধু হয়েছিলে
সেই প্রথম ভারতভুমি
তোমার পায়ে প্রণাম করেছিল
এইভাবে কৃষ্ণ তো দেবতা হলেন।

দ্রৌপদীর চোখে তিনি তো রীতিমতো হিরো, হিম্যান। কিন্তু ভাবুন তো বেচারা রাধার কথা। তার তো যত সর্বনাশের মুলে কৃষ্ণ স্বয়ং। বন্ধু - বন্ধু থাকা বেশ ভাল, কোনও টেনশন হয় না, যেমন দ্রৌপদী আর কৃষ্ণ। সখী দ্রৌপদীর জন্য যেভাবে জান লড়িয়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণ, সেরকম রাধার জন্য তো করেন নি! ঐজন্যই তো মুশকিল। বন্ধুরা হুটহাট করে প্রেম নিবেদন করে বসলেই সাড়ে সব্বেনাশ। প্রেম গ্রহণ করলেও বিপদ, উল্কার মত জ্বালিয়ে দেবে। আর প্রেম গ্রহন না করলে তো আরও বিপদ, যাকে ফিরিয়ে দেব তার পুরুষতান্ত্রিক ইগো জেগে উঠবে। অ্যাসিড বাল্ব ছুঁড়বে। এসব দেখলে শুনলে বড় মন খারাপ হয়। তখন মাঝে মাঝে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে থাকি। গঙ্গা কি সুন্দর। এখনো কি সুন্দর। এখনও কলকাতার সেরা অভিজ্ঞতা গঙ্গাবক্ষে লঞ্চ ভ্রমণ। লঞ্চের ডেকে বসে দেখুন একবার, পুরো বাংলার ইতিহাস উঠে আসবে সামনে,পুরো গঙ্গামাতৃক ভুখণ্ডের ছবি। এত যে সুন্দর আমাদের গঙ্গা, তাকেও কালি ছোঁড়ে লোকে! ওফ্ দমবন্ধ হয়ে আসে ভাবলে। মনে হয় যেন আমার গায়েই কালি ঢেলে দিচ্ছে কেউ। আমারই মুখে বাল্ব মারছে কোন দুষ্টু প্রেমিক।

জয়দেব বসু

ভয়

আজকাল আমি তার মুখটিও মনে করতে ভয় পাই, মাধবী গাছ, যদি আকাশ আবার ছিঁড়ে পড়ে যদি আবার শ্বাস আটকে যায়, যদি গ্রাস মুখে তুলতে গিয়ে দেখি ভাত নয়, — রক্ত জমে আছে ড্যালাড্যালা .... ভাবতে ভাবতে ওয়াক উঠে আসে মাধবী গাছ, চারপাশে কেবলই মৃত্যুসংবাদ শুনি, আমার খুব ভয় করে, আমি রোগা হয়ে যাচ্ছি দিন দিন, নির্জন হয়ে যাচ্ছি, কোথাও যাই না আর, বন্ধুদের বাড়ি না, মা-বাবার কাছে না,

রাস্তা পার হতে গিয়ে আচম্‌কা ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পরি আর শিঁড়দাঁড়া হিম করে ছুটে যায় ট্রাক.... মাধবী গাছ, সে তো খুব ভালো আছে, সপ্নমগ্ন রেস্তোরাঁর কোণের টেবিলে বসে আছে চায়ের পেয়ালা আর ছেলেটিকে নিয়ে, যেতে আসতে প্রত্যেকেই তাদের কুশল দিয়ে যায়... মাধবী গাছ, রাত দুটো বেজে যায়, আমার ঘুম আসে না, ভয়ে বুক শিরশির করে ওঠে, আমি তোমাকে এসব কথা বলব বলে রাস্তায় ছুটে যাই, তীক্ষ্ণ হর্ণ বেজে ওঠে, চোখের মধ্যে ঢুকে যায় হেডলাইটের আলো ...মাধবী গাছ আমার কী হবে?

'ভারত এক খোঁজ'

বিশেষ কারণে এতবছর পর আমি অযোধ্যা এলাম, মাননীয় বিচারক,
এলাম আমার মায়ের জন্মভূমি খুঁজতে।
না,আমার কী ধর্ম আমি জানি না,
জানি না আমার বাবা কে,
আমার মা-ও জানত না এসব।

আমার মা — মুন্নাবাঈ, জন্মেছিল এখানেই এক ঝোপড়ায়,
কোন্ পুরুষের ঔরসে তার জন্ম তা ঠাহর করে
বলতে পারেনি আমার দাদীও, সেক্ষেত্রে জাতপাতের কথা তো ওঠেই না
মা শুধু জানত কে তার মা, মাননীয় বিচারক,
একে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলা যায় কিনা ভেবে দেখবেন,
যদিও পরিবার শব্দটার অর্থই আমার কাছে পরিষ্কার না।
বরং শুনুন, বালক বয়সে বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ে বসার আগে
কী আমি দেখেছিলাম?

ভালো মনে নেই আমার, তবু সেই জলহীন, আলোহীন,
পয়ঃপ্রণালীহীন ঘুপচি ঝোপড়া,
ভিখিরি, জোচ্চোর, দাগী, মাতাল.... আর
কোনো কোনো মধ্যরাতে আচমকা হুইশ্‌ল....
ঘরে ঢুকে পড়তে পেটমোটা উন্মত্ত থানেদার...
মুখে মদের গন্ধ ... পান খাওয়া কুৎসিত হাসি...
মা আমাকে ঠেলে বার করে দিত — সেই রাত,
সেই অসংখ্য নক্ষত্রের রাত, সোনালী হ্যালোজেনের রাত
আমি কাটিয়ে দিতাম রাস্তার পাশে দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে,

অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারতাম
ঠিক কতদিন পর থেকে মা আবার শুরু করবে বমি....

বাস্, এই তো সব। অযোধ্যা ছেড়ে আসার পর আমি কী কী করি
তা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। মাননীয় বিচারক,
আমি শুধু শুনেছিলাম, যৌবন থাকতে থাকতেই ঝোপড়া থেকে দালান,
তা থেকে শীষ্‌মহাল পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিল আমার মা।
তারপর, জীবনের লাথ্ খেতে খেতে সেই ঝোপড়ায়
ফিরেই সে মরে।
চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে ওঠার জন্য মাফ করবেন,
কিন্তু এত বছর পর মায়ের জন্মভূমি খুঁজতে এসে
কী আমি দেখলাম?
কেউ বলছে — এখানে জন্মেছিলেন তাদের এক পৌরণিক রাজা।
কেউ বলছে — এখানে এসেছিলেন মধ্যপ্রাচ্য থেকে তাড়া খাওয়া এক বাদশা।
আমি জানি না পৌরাণিক কোনো চরিত্রের পক্ষে
জন্ম নেওয়া আদৌ সম্ভব কিনা, আমি জানিনা অতদিন আগে আসা
কোনো সেনানীর পদচ্ছাপ এতটাই নিশ্চিত কিনা,
কিন্তু, আমি জানি আমার মা এখানে জন্মেছিল — এখানেই,
কেননা, আমিও যে জন্মেছি এখানে।

আমার এন্তেকালের ভয় নেই, আখেরাতের লোভ নেই,
মন্দার বা অমৃত আমাকে আকৃষ্ট করে না,
শুধু এই ঝোপড়ার জন্য — এই জন্মভূমির জন্য আমার রোজা — আমার উপবাস
অষ্টপ্রহার প্রার্থনা — পাঁচওয়ক্ত নমাজ,
মাননীয় বিচারক,
রহম্ করুন, আমার মাতৃভূমি আমায় ফিরিয়ে দিন।
ফিরিয়ে দিন আমি মরীয়া হয়ে ওঠবার আগেই।

সুনেত্রা ঘটক
বিজয়া দশমী

শ্রীচরণেষু মাকে —
চারিদিকে বিসর্জনের বাজনা বাজছে। সক্কলে জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বলছে, 'মাগো, আস বছর আবার এস'। আমিও বলেছি। বলতে বলতে আমার দু গাল বেয়ে জলের ধারা নেমে এসেছে। লোক থইথই মণ্ডপ থেকে আমি এক ছুট্টে পালিয়ে এসেছি। আমাদের এই ছোট্ট ফ্ল্যাটের চারদেওয়ালের মধ্যে, একা।
মাগো, মা দুর্গাও তো বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়িতে ফেরেন। মাত্র চারদিনের জন্য তাঁর ঐ চত্বরে আসা। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে সেই যে তুমি চলে গেলে আর এলে না কেন? বাবা তোমার সঙ্গে যদি দুষ্টুমি করেই থাকে আমি তো করিনি।
আমি ঠিক জানি, তুমি আমার ওপর মোটেই রাগ করনি। আমিও ঠিক বাবার মতো ততটা দুষ্টুমি করিনি কখনও যে তুমি ছেড়েই চলে যাবে।
আমি একদিন বাবাকে জিজ্ঞেস ও করেছিলাম, জান তো মা। 'বাবা কী এমন দুষ্টুমি করলে যে মা চলে গেল!' 'সে একটা দারুণ দুষ্টুমি বাবা, তুমি বুঝবে না। বড় হও বলব।' 'কেন করলে? দ্যাখ তো এখন কত কষ্ট হচ্ছে।' 'বড্ড ভুল হয়ে গেছে।' এভাবেই বাবাতে আমাতে কথা হয়েছিল।
মা, তুমি কি লবের হাত ধরে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলে? ঠাকুর দেখতে বেবিয়ে আমার কথা পড়ছিল কি তোমার মনে? লব কি আমার কথা বলে মা? ও কি আমার নামটা এখনও 'কুছ' বলে না ঠিকঠাক বলতে পারে?
আমি তোমার সঙ্গে থাকব মা। সীতা কি কেবল লবকে নিয়েছিল! সে তো কুশকেও তার সঙ্গেই রাখত। তুমি কেন পারবে না মা! তোমার নাম সীতা নয় বলে! তোমার নাম শর্মিলা তাই?
আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকবই। কিন্তু তোমার সঙ্গে চলে যাব না। তুমি থাকবে আমাদের সঙ্গে। আগে আগে দশমীর দিন ঠাকুর ভাসান চলে গেলে আমি যখন কাঁদতাম, তুমি বলতে 'কেঁদো না বাবা, মা দুর্গা ছেলেপুলে নিয়ে কৈলাসে না ফিরলে মহাদেবের যে কষ্ট হয়। তাই তো দুর্গা থাকেন না, ফিরে যান। মহাদেব একা একা থাকবেন কী করে!' মাগো, বাবাকে ছেড়ে তাই তো আমিও যেতে পারব না। বাবার একা থাকতে কষ্ট হবে, আমি জানি। বাবা একা থাকতে পারবে না মা। বাবা আমাকে কোথাও পাঠায় না আজকাল। কারুর বাড়িতে। আমার স্কুল আর বাবার অফিস বাদ দিলে সারাক্ষণ আমরা একসঙ্গে থাকি। মাঝে মাঝে মনে হয়, কেন আমি ঠাম্মার বাড়ি যাব না। কেন যাব না মামার বাড়ি, পিসিমণির বাড়ি, তানিমাসির বাড়ি, যেসব জায়গায় আগে আগে আমরা কত্ত যেতাম! কিন্তু তখনই মনে হয়, বাবা যেতে পারবে না যে! বাবা যে তাহলে একলা হয়ে যাবে! এক্কেবারে একলা!
মা, তুমিও কি বাবার মত একলা হতে ভয় পাও আজকাল! লবকে কি তুমি কোথাও

পাঠাও না? লব কি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না, ঠিক আমারই মতো? মাঝে মাঝে মনে হয়, ভাগ্যিস্ আমরা দুজন, তোমরাও দুজন, একজন হলে কী হত! কিংবা তিনজন হলে। তুমি যদি একটিবার আস মা, তোমাকে কিন্তু আমি বেঁধে রাখব মা। তোমাকে আর লব ভাইকে, কী দিয়ে বল তো? তুমি ভাবছ আমাদের ঐ স্কিপিং রোপটা দিয়ে! কিংবা আর কোনো শক্তপোক্ত দড়ি দিয়ে! মোটেই না। বলতে পারলে না তো! সেই ছবিটা দিয়ে। আমার পড়ার টেবিলের টেবিল কাভারের তলায় যেটা আমি লুকিয়ে রেখেছি। যার নিচে লেখা আছে, 'বিজয়া দশমীতে আমরা। বাবার হাতের লেখায়। ছোট্ট লব বাবার কোলে। তোমার কোলে আমি। মাঝখানে মাটিতে বসে হরিশদাদা। বাবা সব ছবি কী করে যেন সরিয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে। বাবা নিশ্চয়ই ভাবে, তোমার কথা লবের কথা ভেবে আমি মন খারাপ করব। ছবি দেখলেই। বাবা কি জানে আমার কত মন খারাপ। তুমি কি জান মা? জানে বোধহয় শুধু ঐ ছবিটা। ঐ ছবিটার সঙ্গে আমি কত কথা বলেছি। আমার চোখের জলে কতবার ছবিটার এখানে ওখানে ভিজে উঠেছে।
মাগো, মা দুর্গা ফিরে যায়, মহাদেবের জন্য, তুমি ফিরে এস আমার জন্য,
তুমি ফিরে এস মা। তোমরা ফিরে এস।
তুমি এলে তোমায় প্রণাম করব। লবকে দেব অনেক আদর আর ভালবাসা।

ইতি তোমার আদরের
কুশুবাবু।
বিজয়া দশমী।
(সংক্ষেপিত)

মন্দাক্রান্তা সেন

অর্জুন কৃষ্ণচূড়া কথা

অর্জুন গাছ একা ছিল ঐ মাঠে
আর্যপুরুষ — আভিজাত্যের দম্ভ
নতজানু হল সব গাছ তার কাছে
এইটুকু শুধু আরম্ভ কাহিনীর।।

কোথা থেকে এল কৃষ্ণচূড়ার বীজ
যুবতী হল সে কয়েকবছর পরে
সাঁওতালি মেয়ে, খোঁপায় তীব্র লাল
অর্জুন তাকে চাইল আপন ক'রে।।

নতজানু হবে এমন মেয়ে সে নয়,

বসন্তে সে তো একাই নিজেই সাজে,
আর্য পুরুষে আসক্তি নেই তার
ব্যস্ত আছে সে ফুল ফোটানোর কাজে।।

খোঁপা থেকে খসে গতরাত্রির ফুল
ঝিরঝিরে পাতা পোশাক বুনেছে তার
অর্জুন, সে যে আর্যপুরুষ। ভাবে—
সব সুন্দরে একা তার অধিকার।।

অর্জুনগাছ চেয়ে দ্যাখে দূর থেকে
কৃষ্ণচূড়ার হৃদয় ঝরছে রোজ,
রূপ দেখে তার ধাঁধায় দু'খানি চোখ
ভাবে, কবে পাবে ঐ হৃদয়ের খোঁজ।।

কাহিনী এবার শেষ করি তাড়াতাড়ি
কৃষ্ণচূড়ার জেদখানি বড় বেশি—
অভিমান সেও বিকাবে না কারও কাছে
বরঞ্চ হবে বন্ধু, বা, প্রতিবেশী।।

যদিও কাহিনী এমন সহজ নয়
অর্জুনে শুধু বাকল ঝরেছে, ঝরে
সাঁওতালি মেয়ে রক্ত ঝরাতে জানে—
আর্য পুরুষ হার মানে অন্তরে।।

পরের জন্মে অর্জুন গাছ হয়ে
কৃষ্ণচূড়ার বন্ধুর মতো দেখো—
আমাকে চিনতে ভুল করো না হে ঋজু,
রক্ত ঝরালে বাকল খসিয়ে ডেকো।।

অরুণ কুমার চক্রবর্তী

রবিঠাকুর, পেন্নাম হই

অ রবিঠাকুর হে —
তুকে ই বোশেখে গেরামে লিয়ে যাব্-অ
শহর তুকে লাচায় কোঁদায়
বিরিজ বানিয়ে শোয়া করায়
রাস্তা বানিয়ে রোদে পুড়ায়
সি যাত্না আর না সহিব-অ, অ রবিঠাকুর হে—

তুকে ই বোশেখে গেরামে লিয়ে যাব্-অ
গেরাম তুয়ার লাইগ্বেক ভাল্-অ
মানুষ মুরা কাল-অ কাল-অ
মাটির উঠান ঘরকে চল্-অ
শহর পানে আর যাইতে নাই দিব্-অ,
অ কবিঠাকুর হে—
তুকে ই বোশেখে গেরামে লিয়ে যাব্-অ
তুকে সাহস দিব্-অ, পিরিত দিব্-অ
কাঁঠালপিঁড়ি পেইতে দিব্-অ
ঘিজিংঘিনা মাদল দিব্-অ, করমফুলের মালা দিব্-অ
সিগুনফুলের টুপর দিব্-অ, শালমউলেরছায়া দিব্-অ
ঠাকুর, পেন্নাম হই, কুনো কথা আর না শুইন্ব্-অ
অ কবিঠাকুর হে—
তুকে ই বোশেখে ঘরকে লিয়ে যাব-অ।

শ্রীজাত
জুতো

তুমি যে জুতোটা পরতে, এখন তোমার দিদি পরে
আমি রোজ ছুঁয়ে দেখি — ভালবাসা ঝরে কি না ঝরে

অবাক খয়েরী রঙ, প্রায়ই বারান্দায় রাখা থাকে
আমি চিনতে পারি, কিন্তু তারা আর চেনে না আমাকে

অথচ একদিন এরা সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরেছে অনেক —
রবীন্দ্রসদন, বকুলবাগান, ঢাকুরিয়া লেক...

এরাই তো বুঝিয়েছিল, তুমি হাঁটতে পারবে না যে আর
দিদির পায়ের বেশে আজ ফিরে এসেছে আবার...

দিদি তো সমস্ত জানে, মুখে তবু বলে না কিছুই
আমি তার বন্ধু, আমি তাকে খুব দূর থেকে ছুঁই

তোমাকে ছোঁবার বেলা যে পরশ গেছে, তাকে খুঁজি
নতুন জুতোয় তুমি ফের হাঁটতে বেরিয়েছ বুঝি?

লেখা চলছে, পাঠ চলছে, চলছে সব টুকিটাকি কাজ
পাল্টে গেছে শুধু সেই পরিচিত পায়ের আওয়াজ

আওয়াজ কোরো না আর। ভালোবাসা ঘুমোচ্ছে ভিতরে...
তুমি যে জুতোটা পরতে, এখন তোমার দিদি পরে।

সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণ
মধ্যরাত্রে স্বাধীনতা

আমার দেশের বুকে স্বাধীনতা এসেছিল
মধ্যরাত্রে একথা বলছি না, তবু—
আজ প্রশ্ন জাগে, বুকে হাত দিয়ে টের পাই
কোথায় সে সোনালী স্বাধীনতা!
নাকি সব ভুলে গেছি কোথায় রেখেছি তারে!

ঘরের তোরঙ্গ ঘেঁটে চলে যাই সদর রাস্তায়
যেখানে অনেকদিন ধুলে মাটি গায়ে মেখে
আমাদের যৌথ শৈশব হেঁটেছিল; তার মুখ বদলে গেছে
কেন না দেশের বুকে স্বাধীনতা এসে
নড়বড়ে আশাগুলো বদলে দিয়েছে অন্তত কিছুটা।

আমি সেই অবকাশে শান্তি ও সুখের কথা
পরস্পর বলতে চাই আর খুঁজি সেই স্বাধীনতা
যেখানে শীতল ছায়া সারাদিন রৌদ্রে মাখে তাপ
অথবা সূর্যের মতো লালাভায়
ধুয়ে ফেলি অমানিশা জেগে সারারাত।

এভাবেই বার বার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়
আর সেই বাসি স্বপ্নে লেগে থাকে
মানুষের গায়ে ম্লান গন্ধ তার।
অনেক জ্বলন্ত ফাঁসি আর রক্তাক্ত বুলেট
এক করে দেখি আমি স্মৃতি-বন্ধে কেটে যায় বেলা।
তাই দীর্ঘ দিনের পর বার বার ছুটে যেতে হয়

আমাদের যৌথ প্রাণের প্রান্তরের রোদে
যেখানে চেঁচিয়ে বলি; ঐক্য চাই, ভালবাসা চাই

আর মনে হয় নিজের বুকের জন্য ভিক্ষা চাই;
তাহলে কি স্বাধীনতা আমাদের সকলের তরে

মধ্যরাত্রে এসেছিল? তাই কি হরণ করি মানুষের অন্ন জল?
মধ্যরাত্রে স্বাধীনতা যেমন হরণ করে
ভালবাসা সব মানুষের।

বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী
পারাবতী

অনেক দৃশ্যের জড়োয়া জড়িয়ে এখন তুই অনেক
কিছু পারিস পারাবতী
তোর কুয়াশায় দাঁড়ানো গাছগুলোর ভেতর দিয়ে এখনো
আগের মতই রীতিমতো সূর্যোদয় হয়, রোদ মাখা জলে
তেমনি হাঁসুলির মতো বেঁকে যায় হাওড়া, শ্রাবণের মেঘ
ভরা আকাশের মাঝে হঠাৎ পাওয়া রোদ কিশোরীর
মত ঝিলিক দিয়ে ওঠে। দুপুরে দীঘির জলে গলে পড়ে
উজ্জয়ন্তের জলছবি। গোধূলির রাঙা সূর্য মুখের দিকে
তাকিয়ে ঠোটে হেসে আবির ছুঁড়ে দেয় একরাশ,
রবীন্দ্রনন্দিত সেই পুরাকালের বীরচন্দ্র থেকে রাধাকিশোর
ছুঁয়ে বীরবিক্রমের উজ্জ্বল উপস্থিতি মহিমা ছড়িয়ে সেজে
গুজে বসে, ত্রিপুরেশ মজুমদারের কামান চৌমুহনীর
মোড়ের দোকানের কলের গানের দিনগুলো থমকে
দাঁড়িয়ে থাকে, হাওয়ায় ওড়ে সায়েবালীর লোকগীতির
ছেঁড়া টুক্‌রো, খাঁ সাহেবদের ছড়ে নামে দরবারী সন্ধ্যা,
স্থির হয়ে থাকে অনিলকৃষ্ণের ঐকতান বাদন সমিতির
ঝংকৃত স্পন্দন, বালকের বিস্ময়ে শোনা সুজন নাইয়া
চাঁদের ডিঙি ধ'রে কর্তার ডিস্কে, পাড়ায় পাড়ায়
হোলির গান ধরা তরুণ তরুণীর প্রতিযোগী কণ্ঠ ভেসে
আসে, ঈদের নমাজে মিয়া মসজিদের পোরসেলিনের
সন্ধানে সূর্য ওঠে ঝিক্‌মিকিয়ে, বুদ্ধ মন্দিরের গেরুয়া
ডাকে নিমেষহীন শান্ত কণ্ঠে, দীঘির জলে ছায়া দেখা
মন্দির মালায় সন্ধ্যার ঘন্টা বাজে, পাহাড়ী প্রান্তরে জাগা
সরল গম্ভীর গির্জা টুপ্‌টাপ্‌ শিশিরে ভেজে,

তুই কি সেই নীল মলাটে সোনার জলে ছাপা অনঙ্গমোহিনীর
অকপট শোকগাথা, নাগর কবি সলিলকৃষ্ণের
জল তরঙ্গের অনুচ্চ সরগমে বাঁধা অস্ফুট
কবিতা, বুকের ভিতরের বড় ঠাকুর সমরেন্দ্রের রেসিয়ার
খাগরা কিংবা বাহাদুর শাহের।

করবী দেববর্মণ

আং কক সাই মানঅ

বহুদিন লোকটা বোবা ছিল
আধ কাটা জিভে গুঙিয়ে গুঙিয়ে কি বলতো
কেউ বুঝতে পারতো না
কেউ অবাক হতো — কেউ হাসতো
তার নাকের পাটা দুটো ফুলে উঠতো
কপালের শিরা দপদপ করতো
কখনো চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তো নোনা
কিছু বলতে চেষ্টা করতো বলতে পারতো না
এভাবেই সে ক্ষেত-খামার করেছে
বাজার-সাজার সেরেছে
ছেলেমেয়ে বড়ো করেছে
সেসব ছেলেমেয়েরাও সার ধরে বোবা-ই জন্মেছে
কথা না বোঝাতে পেরে অভিমানে অপমানে
মুখ লুকিয়ে চলে গেছে ঘরের ভিতর অন্ধকারে
আরো অন্ধকারে আরো ভিতরে
এভাবেই একটা বোবা কলোনী গড়ে উঠেছে দীর্ঘকাল ধরে
কারণ মুখ না থাকলে কি হবে হাত পা নাক গলা
অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
সবইতো নিঁখুত ছিল — ঠিকঠাক
তাই মেহনতের ময়দানে হেঁটে গেছে ঠিক
তবু যেদিন মেঘ সরে আকাশে রোদ উঠেছে
অন্যেরা বলেছে — দেখো কী চমৎকার দিন হেসে উঠেছে
সেও এমনি কিছু বলতে চাইতো, তার কথা কেউ বুঝতো না

সবাই হেসে উঠেছে রোদের সঙ্গে
যখন কালো মেঘে আকাশ ভরে যেত
বাতাস ছোটাছুটি করতো মহিষের মতো —
তার বুক অপার আনন্দে ভরে যেত
সবার সঙ্গে সেও বলতে চাইতো কিছু — বোঝাতে পারতো না
শুধু চোখ থেকে একরাশ মেঘ একান্তে ঝরে পড়তো
মানুষ অবাক হয়ে দেখতো বারবার
এভাবেই সে বেঁচে ছিল — বেঁচে থাকতো
কিন্তু তার ফাটা কপালেও একদিন হলো সূর্যোদয়
এক যাদুকর দয়াপরবশ তাঁর যাদুদণ্ড ছুঁইয়ে দিল
একেবারে তার চেরা জিভের ডগায়
বললো 'নে তোর কাটা জিভ জুড়ে দিলাম
প্রাণভরে কথা বল্ — কথা বল্ সবাই' —
সে খুশিতে হাবুডুবু গড়িয়ে পড়ে —
ঝর্ণার মত কথাস্রোত বেরিয়ে আসে
তার গলা চিরে
আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার দিয়ে সে বলে
আমা- আমা — আং কক সাই মানঅ
মা- মা- আমি কথা বলতে পারছি
মুহূর্তে রঙ বদলে যায় চারপাশের
সে এবং তার বাচ্চারা ক্ষেতের পাশে বয়ে যাওয়া
নদীর মতো কলকলিয়ে ওঠে —
তাদের সেই যূথবদ্ধ বাক্যালাপ
এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে
প্রতিধ্বনিত হয়ে চলে — চলবে চিরকাল।

সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়
এই ত্রিপুরার চা-বাগানে

তোমার অমন সুকণ্ঠস্বর মিশিয়ে আছে
এই বাতাসে
এইখানে এই ফটিকছড়ায় চা-বাগানে
আলতো গানে

দুলছে যারা তুলছে পাতা
চায়ের পাতা
শুকনো শরীর তৈরী করছে শুকনো পাতা
যেমন তেমন শরীরগুলি আগুন ভুলে
পাতাবাহার চায়ের পাতার জল ধুয়ে খায় বাহারি জল
এই ত্রিপুরার আকাশ বাতাস জল ধুয়ে খায়
বাহারি জল পাহাড়ি ছল
তোমার অমন সুকণ্ঠস্বর আল্‌তো গানে
ফটিকছড়ার চা-বাগানে
উঁচুনিচু টিলা জুড়েই এমন খেলা
হাড়মাস সব চিবড়ে নিচ্ছে পেটের ঠেলা।

মিহির দেব

মুখ দেখাদেখি নেই

গঙ্গায় পদ্মায় আর মুখ দেখাদেখি নেই
এবার পুজোয় আর প্রবাসীর সওদার ঝুলিতে ঢুকে
কোলকাতা হয় না হাজির
গোয়ালন্দ চাঁদপুরে ডগমগ হাসিমুখে বৎসরের প্রতীক্ষার পর
প্রিয়জন মিলন আশায় প্রতীক্ষায় থাকে না কেউ
স্বামী-পুত্র ভ্রাতা-বন্ধু আসার সময় ভেবে।
কি খুড়ো কেমন আছেন? চাচা যে! হাটের থেকে?
আপনার বাতের মালিশ এনেছি তো,
রাত্তিরে দিয়ে আসবো
ইরফানকে বলবেন বাড়ী থাকে যেন।
কি পালা ধরেছিস এবার বলনা হৃদয়, কিরে? কথা বল্‌
ঘাট মানছি বাপু, ঠিক আছে! বাঁশীটা তাহলে —
কি যে কও! তোমার উপর রাগ! সীতার পাতাল প্রবেশ —
তোমাকেও পাট কত্তে হবে, লক্ষ্মণের রোল!
কিরে নাতি কখন এলি? একি? নানী!
অন্ধকারে তুমি কেন এলে?
এমনিতেই চোখে কম দ্যাখো। আমি তো যেতামই।

চোখে জল কেন? নুরু চাচা ভালো আছে—
তোমার নাতিটা জানো
কি সুউন্দর হয়েছে দেখতে। কার্তিকে হয়তো আসবে—
এখন কিছুতেই ছুটি পেল না যে। এই দ্যাখো, কি সুন্দর
বাঁধানো হুকো পাঠিয়েছে, দ্যাখো। একি! আমসত্ব দেখি!
এখনো তোমার নানী এতো মনে থাকে!

গঙ্গায়-পদ্মায় আর মুখ দেখাদেখি নেই।

কল্যাণব্রত চক্রবর্তী

গৃহযুদ্ধ

একসঙ্গে সবাই আর্তনাদ করে উঠল
ঐ ওরা এদিকেই আসছে
দমকলে একটা খবর দাও
নিরাপদে বাইরে নিয়ে যাও
শিশুদের, সাবধান —
হাতিয়ার যেন খসে না যায়

ঠিক এমন সময় খুব কাছেই
দুম্ দুম্ শব্দ, কোলাহল —
কারা যেন এই মাত্র মৃত্যুকে পরাস্ত
করতে চায়, হাঁক দিয়ে বলছে
ছেলেটাকে আমাদের হাতে দে —

শিশুরা হয়ত শেষ রাতে ফিরবে
নিরাপদ, ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে কেউ নেই
কিন্তু ভোরের আগেই ধ্বসে পড়বে
আকাশ ও চন্দ্রাতপ
ওরা মায়ের গর্ভে
বিষাক্ত গোলাপ আর
বর্শাফলক লুকিয়ে রেখেছে।

অনিল সরকার
ব্রাত্যজনের কবিতা

আমার সমস্ত শরীরে মাগো
আজন্ম বয়ে চলেছি আমার জন্মের যন্ত্রণা
তবু তুমি বার বার কেন জানি না বোঝাও
আমি নাকি রাজপুত্র, সুখী হব কোনোদিন
ফিরে পাব রাজদন্ড, ভূমি ও বিশাল তালুক
আমি বুঝি না, শুধু বুঝি
আমার কালো চামড়ার নিচে এক লাল নদী
দুঃসহ জ্বালাবাহী ক্রন্দনের স্রোতে ভরা,
আমি বুঝি, আমার জননী দাসী কন্যা এক
আমার জন্মদাতা পিতা অনার্য চন্ডাল ছিলেন,
জন্মাবধি ব্রাত্য আমি তাই।
কেন?
কোনো উত্তর নাই স্বর্গীয় বিধান ছাড়া।

কত করুণার সিন্ধু শুকিয়েছে আমার জন্যে,
প্রভুদের ফুলের উদ্যানে আগাছার মতো
মৃত্তিকার উর্বর জঠরে আমার জন্ম,
ব্রাত্যজন আমি, মন্দিরে নিষিদ্ধ তৃণপুষ্প যথা।
মাগো, আমি বুঝি না তবুও তুমি বলো,
আমার ললাটে নাকি রাজলেখা আছে,
আমি শুধু জানি জন্মের মুহূর্তে এই জাতকের শিরে
প্রভুদের অলৌকিক পবিত্র ঈশ্বর
রেখেছিলেন শ্রীচরণ কমল দুখানি,
সেই হাতে লেখা হল মোর ভাগ্যলিপি।

মাগো, তুমি শুধু বলো,
আমি নাকি একদিন রাজসূয় যজ্ঞের অশ্ব চড়ে
যাব দিগ্বিজয় হৃত ভূমি ও বাণিজ্য দখলে,
আমি বুঝি না, কেন বুঝি না মাগো।
শুধু ভাবি, তোর গর্ভে জন্মের যন্ত্রণা
কেন মোরে দিলি জননী,
আমৃত্যু বয়ে যাব তাই যত অসম্মান।

অথচ আমার ঘামে সোনা ফলে
ধরিত্রী উর্বরা হয়,
কলে কারখানায় চলে চাকা,
আর বিনিময়ে আমি খাই বাসি রুটি,
বকশিশ শুধু জন্মের যন্ত্রণা, আমি হীনজাত।

মাগো জন্ম যদি দিলি এই দেশে
কেন দিলি না অভিশাপ নির্বোধ হবার।
আমার চামড়ায় অভিজাত রঙ নেই
শিরায় অনুপস্থিত নীল রক্ত
তাই আমরা আমৃত্যু হৃদপিন্ডে ধরে রাখি
নীরব কান্নার ক্রোধ,
বংশ পরম্পরায় রেখে যাই স্বজনের জন্যে
এই সুদীর্ঘ বিষাদ,
রক্তে ও অনুভবে জড়তা ছাড়া এসব ভুলি কীভাবে?

মাগো, কবে আমাদের রাজসূয় যজ্ঞ হবে?
কবে আমাদের রাজ অভিষেক?
কারা কবে হরে নিল আমাদের
গঙ্গা যমুনা পদ্মা মেঘনা
কৃষ্ণা কাবেরী সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র
সমুদ্র পর্বত নদী অরণ্য আর
দিগন্ত জড়ানো শস্য ক্ষেত্রের দখল,
কবে লোপাট হয়েছে মা তোমার
সিন্দুকের চাবি?

বলো কবে আমার কপালে
রক্ত চন্দন লেপে মা তুমি বলবে,
"বালক, যুদ্ধে যারে তুই
রণ-রক্তে লেখা আছে তোর অভিষেক।"

আরো বলবে
"তোমার রক্তে রেখেছি আমি
জয়ের নেশা, জননীর চির-আশীর্বাদ,
প্রভুদের দাস হওয়া প্রভুদের জন্যে,
তোমার জন্যে থাকুক রাজদন্ড শুধু
যুদ্ধে যাও, যুদ্ধে যাও তুমি।"

হীরাসিং হরিজন

ঐ অনন্ত আকাশে চিরকালই আছে
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা
অথচ এই বালকের পূর্বপুরুষেরা কোনো কালেই
চন্দ্র কিংবা সূর্য বংশে জন্মের সাহস পায়নি,
বালক এসব জানে না, দরকারও নেই।
এই দেশে চিরকালই ছিল কিছু চেয়ার অথবা কুর্সি
বসবার মত উঁচু স্থান, উঁচু যাঁরা বসেন,
বালক দেখেছে পাঠশালে মাষ্টার মশাই বসেন,
ছাত্রকে বেত্রাঘাত করে ধমকান,
কান মলে দেন কখনো।
চেয়ারে বাবুরা বসেন সাহেব বসেন
অফিসে তার বাবাকে শাসান
চোখ রাঙান, পয়সা কম দেন।
বাবা ঘরে ফিরে কাঁদেন, বউকে মারেন
দুধের শিশুকেই শালা বলে ধমকান বিনা কারণে।
বালক এসব দেখে দেখে একদিন ভাবে
আমিও চেয়ারে বসব, মাগো আমায় কুর্সি এনে দে।
মা দিয়েছেন ধমক
বাবা বলেছেন, আমরা মেথর বেটা
কুর্সিতে বসা পাপ।
বালকের মাথায় এসব ঢোকে না, কাঁদে
তাই খেলার সময় মাটির ঢিবিতে বসে
নিজেই সাহেবের মতো হাসে, হুকুম দেয়
চড় মারে ছোটো বোনের গালে, যেন না কাঁদে।
সেদিন বাংলোয় বাবার সাথেই এসেছিল সে
শুনেছে, বাংলোয় এসেছেন
এক নতুন সাহেব, বড়ো মিনিস্টার
ছোটো বালক এসেছিল, সাহেব দেখতে
তার বাবা এসেছিল ঝাড়ু হাতে অবনত চোখ
বিনীত শরীরে দাসত্বের ছাপ,
ঘর দোর, ল্যাবাটরি, কার্পেট সাফ করে।

হীরা সিং হরিজন। বয়স ছুঁয়েছে ছয়।
শৈশবের চোখে তার ঈশ্বরের ছায়া

স্পষ্ট অস্পষ্ট কথায় যেন ফুল ঝরে
এক হাতে বাঁশরি অন্য হাতে ছিল শিশুপাঠ্য ছড়া
লাজুক মুখে তার লজ্জা টলোমলো।
বালকের ললাটে যেন
চাঁদের কপালে চাঁদ বসে আছে
অদ্ভুত কৃষ্ণাঙ্গ বালক, লোভনীয় গালে তার
এখনো চুম্বনের দাগ,

ভালে চন্দনের লেখায় মা দিয়েছেন এঁকে জয়ের তিলক,
কোনো দিনই তারা চন্দ্রসূর্যবংশে জন্মের সাহস পায়নি
অথচ কপালে তার যেন বসে আছে চাঁদ।
আমরা তো জানি, বালকের কাঙালিনী মা
কখনোই বাটি ভরা দুধ অথবা
রুই-কাতলের লোভহীন মুড়ো দিয়ে চাঁদ কিনে
এই বালকের কপালে বসায়নি,
তবুও বসে আছে চাঁদ চাঁদের কপালে আহা!

কিশোর বালক এক
হীরা সিং হরিজন নাম তার,
সূর্য বংশে জন্মে যাঁরা, এমন সাহেব দেখতে
এসেছিল, সঙ্গে তার বাবা, বাংলোর ঝাড়ুদার।
সাহেবেরা চিরদিন জন্ম নেন চন্দ্রসূর্যবংশে
তারা রাজা হন উজির নাজির সাহেব বেগম।
কাছে ডেকে বলেছিলাম, কোন্ ক্লাসে পড়?
পড়ে টরে কি করবি বেটা?
নির্দ্বিধায় বলেছিল — সাহেব হমু।
কেন?
চেয়ারে বসব
নরম ঠোঁটে কী ভীষণ জোর!
হীরা সিং হরিজন, সবেমাত্র অংকুরিত বীজ
সম্ভবত রক্তে আছে প্রপিতামহের ক্রুদ্ধ পবিত্রতা
কোনো এক সম্রাটের সঙ্গীতের পরাজিত বিলাপ
না হলে এমন অবোধ বালক, এত কঠিন কথা বলে কেন?
এই ছোট বালক কি জানে,
তারই আত্মীয় এক জোর করে স্কুলে যেত
পড়ার সময় পেত না আসন

কারণ সে বালকও ছিল হীনজাত, ব্রাত্যজন।
তবুও লেখা পড়া সেরে সেই বালকই
একদিন জোর করে বসেছিলেন
রাষ্ট্রীয় চেয়ারে,
সেই বালকই একদিন কালো সাহেব হলেন
কালো মানুষের প্রিয়জন বাবা সাহেব।
হীরাসিং হরিজন শোনো
আমারা তো তোমাকে চেয়ার দেবো না,
তুমি
বড়ো হয়ে
জোর করে
বসো।

স্বপন সেনগুপ্ত

আধোজাগ্রত অঙ্গার

আসলে কী সুখ বলো কবিতা লিখিয়া—
লেখা ভালো উকিল নোটিশ।

প্রেমিকাও নিরাপত্তা চায়, ছাত চায়
ভাত চায়, বীমা
যেন মায়াবনবিহারিণী হরিণী—
আমি জানি।

যাবে যাও, ধুলোমাখা পিঁড়িতে একাকী কবি
থাকি আমি সপ্তর্ষির ডালে
কালিদাসও লজ্জা পেতেন একথা শুনিলে।

নিসর্গেও পরিপাটি ভুবন-শৃঙ্খলা
কবি শুধু একা,
শ্বেতমুখ ফিটকিরি পালিশ—
কোন আগাছা ও অট্টহাস্য নেই।

তবু কী সুখ বলো কবিতা লিখিয়া
লেখা ভালো উকিল নোটিশ।

কে খায় বাদামী ইট, বেগম আখ্‌তার,
স্তন্যপায়ী প্রাণীসব ভুলে গেছি দুধের আস্বাদ।

কী তুমি দিতে পার?
দিতে পার প্রাত্যহিক শান্তি ও উষ্মার বিকার?
দিতে পার নতমুখ শস্যের ঝাড়?

তোমার পকেটে শুধু দাহ, আধোজাগ্রত অঙ্গার।

রাতুল দেববর্মণ

ফুল বৃত্তান্ত

দুয়ারে দাঁড়িয়ে হাতের ছোঁয়ায়
ফোটাতে চেয়েছি ফুল
সূর্য হেসে তাই দূর থেকে বলে
ভাবনা তোমার ভুল।

বুকে তুলে নিই তোমার সুবাস
চোখের মণিতে মালা
চোখ সয়ে নিয়ে দেখতে গেছি
কেউ যেন বলে পালা।

কোন সে মানুষ ক্ষত নিয়ে মুখে
চেয়ে থাকে নত চোখে
চেয়েও দেখেনা ফুলের রন্ধ্র
নিয়ে তার নিজবুকে।

সাদা কী লাল রঙের বাহার
সব আছে তার গন্ধে
মানুষ বোঝেনা কোনটা নেবে
পড়েছে ভীষণ ধন্ধে।

মুখোসের আড়ালে মানুষের মুখে
মরসুমি ফুল ফোটে

কোথা থেকে এসে মানুষের দল
ছিঁড়ে ফেলে সব লুটে।

তবু বাজে গান বুকের কোণে
ছড়ানো মালার ফুল
পলকের ঘ্রাণে অবশ হয়ে যায়
মন ভাঙ্গা উপকূল।

ফুল নিয়ে দোলে প্রিয় নজরুল
হাতে প্রিয় তার বুলবুল
রবি ঠাকুরের ফুলের ডালি
ভরে দিয়ে যায় তাদের মালি।

সব দুয়ারে ফুল নেই তাই
সব উঠোনে বাগান
কেউ কী দেখেছে বুকেরই ভেতর
রয়েছে ফুলের সোপান।

দিব্যেন্দু নাগ
আগুন থেকে উঠে এসে

আগুন থেকে উঠে এসে
তোমার সামনে দাঁড়াবো
কবর থেকে উঠে এসে
তোমার সামনে দাঁড়াবো।

বলো, আর কোথায় নিয়ে যাবে!
বলো, বালিয়াড়ি জেগে থাকলে
ঝাউবনে— পুরোনো বাতাস কারে কি কয়।
নিরবধিকাল নদীর কাছে যাবো
নদীই জানে মানুষের ম্লান মূর্খতার কথা,
আজ বিকেলের এই শব্দাবলী
তোমার কাছে নিয়ে গেলে
গোদাবরী, মেঘনা, গঙ্গা, গোমতীর কাছে

আগুনে পোড়া শিশুটি ভেসে যাবে?
ভেসে যাবে জামরুল মানুষের
আবরণ বন্ধুতা।

আরেকবার উঠে আয় নির্বোধ নাবালক
কবিতা-কবিতা খেলার কথা।
আর বলো না।
সব নদী চুপ করে থাকে না
সব বালিয়াড়িই নিথর স্বপ্নের কাছে
হাঁটু গেড়ে বসে
এই কথা — হাওয়ায় ভাসিয়ো না।

জেগে উঠছে ভোর
বেলফুল, সবুজ ঘাস
আর পুরোনো দিনের
মায়াময় ভালোবাসা।
এই ভালোবাসা—
এই বিকেলে তোমার জন্য
হিরণ্ময় চন্দনবাক্সে রেখে গেলাম।

শক্তি দত্তরায়

প্রচ্ছন্ন মানুষ

আগরতলা বছরটাকে বলে শরণার্থীর বছর,
আকাশে লোহা গলানো রোদ
শহরে কেবলই ঢুকছে ছাইরাঙা সব মানুষ।
মানুষ কি আর, তাড়া খাওয়া পশু।
ধানের খোসার মত খস্‌খসে চামড়ার মেয়েরা,
গেরস্ত বাড়ীতে কেউ বাসন মাজে,
কেউ অন্যের খিদে মিটিয়ে বাচ্চার দুধ কেনে।
মুখে পুড়ে যাওয়া ধান খেতের গপ্পো।

পুরুষগুলো কাজ পায়না,
শিবিরে বসে ঘোলা চোখে তাকায়,

তেষ্টা পেলে ব্রাহ্মণবাইড়ার মাঠার ঢেকুর তোলে
তাদের একজনের ভিক্ষের ভাত ভালো লাগেনি।
জুতো পালিশের কাজ নিয়েছিল।
বাবা, আপনার মনে আছে?
হাভাতে লোকটা একদিন আমাকে বলল,
বৌদি, এককাপ চা হবে?
আপনি বেরোচ্ছিলেন সমাজ সেবার কাজে,
কিছু বলেননি। রুপো বাঁধানো ছড়ি
মাটিতে ঠুকেছেন—নিষেধে অভিজাত ভঙ্গী।
হা-ভাতে বেয়াদপ,
বাড়ীর বৌ এর কাছে চা খেতে চায়?
বাড়ীর বৌ বলে কথা, বৌ এর তো বাড়ী নয়।
কেঁপে উঠলুম আ-শির পদনখ।
কবে এক পূর্বানারী গান বেঁধেছিলেন,
"বাপের বাড়ী ব্রাহ্মণ বাইড়া শ্বশুর বাড়ী চাতলপাড়,
মামার বাড়ী সিরাজগঞ্জ, নিজের বাড়ী নাই আমার।"
আজকে পঁচিশ বছর পরে,
খস্‌খসে চামড়ার উদ্বাস্তু তরুণেরা অনেকেই চকচকে প্রৌঢ়।
ঘর হয়েছে প্রায় সবার।
জবর দখল হোক্, কিংবা টিলার জমি।
কিন্তু, যাদের ঘরনী বলে,
যারা ঘর নিকোয়, রোজগারের পয়সায় কেনে—
বাচ্চার দুধ, অথবা শখের টেবল্‌ল্যাম্প।
তাদের একটু ঘর কে দেয়।
বিদ্যাসাগরের চোখের জলে তারা ঠাণ্ডা হয়নি।
আম্বেদকর কি দিয়েছেন জানেও না।
এদের গর্ভের সন্তানেরা কৃতঘ্ন খুব।
ছোট বড় সব বাড়ীর এরা আশ্রিত
ছোট বড় অপমানে খচিত গহনা,—
কানে গলায় মনিবন্ধে,
বাড়ীর মা, মেয়ে বউ কিন্তু বাড়ী এদের নয়,
বাবা, অপনি যাবার আগে,
এদের জন্য কিছু ভাববেন কি?

অসীম দত্তরায়

ভাঙা নৌকার গান

কলিমুদ্দিন আর কতো দিন
ঘরের দাওয়ায় ভাঙা নৌকার মতো
উবু হয়ে বসে থাকবে
আকাশে শকুনের মতো ভাসে রোদ
অথবা রোদের মতোই শকুন
আগুনের ফুলকি ছড়ায়
ঘর পোড়ে, মাঠ পোড়ে
পোড়ে আমিনা বিবির কপাল
খরার তীক্ষ্ণ নোখ ফালা ফালা
করে কেটে যায় চতুর্দিক
বিবির গোড়ালীর মতো এই জমি
একদিন গাভীন ছিল রস ছিল
ছিল ফসলের আনত সৌন্দর্য

কলিমুদ্দিন ভাঙা নৌকার মতো আর কতো দিন
কাকে তুমি মা বলেছিলে
এই মাটি, এই জমি
তুমি কি জানো না
রূপোর চাকতিতে বাঁধা
গঞ্জের বেশ্যার মতো
মহাজনের বন্ধকী খাতায় বাঁধা বিবি হয়ে থাকে
ফি সন শরীরের নোনা ফেলে
গায়ে হাতে কাদা মেখে
তুমি পাও দশ পুরা ধান
আর মহাজন
মরশুম শেষে পশমী চাদর গায়ে
চোখ মটকে দাঁড়ায় যখন
এই মাটি — বান্দার মা, তারে দেয়
হেসে খেলে বিশ পুরা ধান
তারে তুমি কি ভেবে মা ডেকেছিলে
ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ মহাজনের ঘরে
তার পাঁচ আঙুল সাঁতার কাটে দুধের বাটিতে

আর তোমার কোলের ছেলেটি হাসিম
তিন রাত তিন দিন
জ্বরের বিকারে কেঁদে কেটে
ক্ষুধার আকাশ বুকে নিয়ে
চলে গেছে দু'হাত কবরে
তার রক্ত মাংস হাড়
তোমার স্বপ্নের সাথে গলে গলে পড়ে
শুধু ঘরের কোণায়
ভাঙা ঝুমঝুমিটি ঈদের চাঁদের মতো
জ্বল জ্বল করে চমকায়
তার জন্য আসেনি কোন শোকবার্তা
পৃথিবীর তাবৎ ছাপাখানায় তার জন্য
রাখা নেই কোন শোকার্ত হরফ
সারা দিন কথার বানিজ্য করে
রাত শেষে যে লোক ছুঁড়ে দেয় পাঁচফদা বাণী
তার জন্য আকাশবাণীও কাঁদে
হায়! কলিমুদ্দিন আর কতো কাল

কলিমুদ্দিন আর কতো দিন
ভাঙা নৌকার মতো কাটাবে বসে
চেয়ে দেখ বাসি রুটির মতো ভাসে মেঘ
খরাতেও ভয়   মেঘেতেও ভয়
খরায় জামিন ফাটে   মেঘে ভাসে ঘর
সারা রাত এক কোণে
জেগে কাটে মিঞা ও বিবিতে
তবু একবার ঘর থেকে বের হয়ে দেখ
বকনা গাভীর মতোই এই মেঘ
বেঁধে রাখো তোমার জমিনে।
যে তোমাকে বলেছিল নিয়ে যাবে সুখের বেহেস্তে
পাহাড়ী নদীর মতো ধনেখালি শাড়ী পরে
সে ঘোরে সমুদ্র পর্বতে
তাকে একবার জিজ্ঞাসা করো
পঁয়ত্রিশ বছরেও তোমার ক্ষেতে
আসেনি কেন পাম্পসেট
দু'বেলা দু'মুঠো ভাত, দশ হাত কাপড়

কলিমুদ্দিন গাঢ় কুয়াশায় ঢেকে আছে চারদিক
সেই কোন সাত-সকালে
হাসিনা বিবিও গোঁসা করে
ধান ভানতে গেছে মালিকের কলে
যাবার সময় বলেছিল —
'যে পারেনা এক মুষ্টি ভাত দিতে
তার অতো তেজ কেরে?'
সেও জানে তার ইজ্জত মালিকের হাতে
দড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া
ইরাণী মেয়ের মতো কাঁপে
গেল সনে হারানের বউ
ধান কলে গিয়ে ফেরেনি তো ঘরে
ক্ষুধারে তালাক দিয়ে
গেছে সে বে-ইজ্জতের ঘরে
তবু ক্ষুধা বড় বেশরম লাজলজ্জাহীন
প্রতিদিন ভাতের সঙ্গে আশনাই করে তৃপ্ত হতে চায়
কলিমুদ্দিন এইভাবে আর কত দিন
এই সনে ভাঙা নৌকা মেরামত করো   হাল ধরো
তারপর ভাসায়ে চলো
এই নদী পার হয়ে যাই।

প্রদীপ সরকার

একবিংশের ফরমান

অনেক যুদ্ধ হয়েছে যুদ্ধবাজ!
এবার প্রস্তুত হও শেষ যুদ্ধের জন্যে
হিংস্র নখরে রক্তাক্ত করেছো—
সুদূর প্রশান্তের নীল
আনবিক তেজে ঝল্‌সে দিয়েছো
শুভ্র শঙ্খচিল।
মিসিসিপি থেকে ভলগার বুকে
ডেকেছে শোণিতের স্রোতে
উন্মত্ত ঘোড়ার খুরে বিধ্বস্ত নগর

বিচূর্ণ করেছো বিজিতের শির—
আকাশ জুড়ে উঠেছে কুণ্ডুলি
বিষাক্ত আণব ধূলির।
বর্শার তীক্ষ্ণ ফলাকে বিদ্ধ করেছো
কুমারী মাটির বুক
জীবনের ভ্রুণ ছিন্নভিন্ন মাটির গর্ভ দেশে
তাই আজ দেখি বিবর্ণ পৃথিবী
বীভৎস আণবিক ত্রাসে।

তারপরও দেখি
বিধ্বস্ত হিরোশিমায়
স্পন্দিত প্রাণ সবুজের গালিচায়
থরে থরে ফোটে গোলাপের কুঁড়ি
ওড়ে গাঙচিল প্রশান্তের বুকে
স্নিগ্ধ চাঁদের জোছনায়।

তারপরও মানুষ প্রতিরোধ গড়ে
বজ্র কঠিন হাড়ে, পিতৃঋণ শোধে।
প্রস্তুত হও যুদ্ধবাজ!
সামনে শেষ যুদ্ধের দিন!
বিংশ শতাব্দীর গর্ভ-যাতনা—
রক্তে করে স্নান
একবিংশের কণ্ঠে শোন
শেষ যুদ্ধের গান।

আগামী দিন দানবের নয়, মানবশিশুর জন্যে
ঘোষিত হবে অযুত কণ্ঠে
তোমার মৃত্যুর ফরমান।

নন্দকুমার দেববর্মা
জনৈক ধৃতরাষ্ট্রের

যুদ্ধ কি শুরু হলো
এত কোলাহল
বল তো সঞ্জয়?

আমি সম্রাট
অন্ধ যথার্থ
তত্ত্ব প্রসূত

আমি পিতা
নির্বিকার
লজ্জাভূখ
আমি কান দিয়ে দেখি আবহমান

পরম্পরা দ্রৌপদী ধর্ষিতা
সূচ্যগ্র ভূমি ছাড়বে না
পরজীবী দুর্যোধন — বেশ করেছে
শত্রু-মিত্রে ভাগ করেছে বাসস্থান

আচ্ছা সঞ্জয়, তুমি কোন্ দলে
স্ব-ভূমি হারা পঞ্চপাণ্ডব,
না ঐ শত ভ্রাতার অহংকারী কৌরবে ?

তবে এতো প্রশংসা কেন
একমুষ্ঠি পাণ্ডবের
অপব্যাখ্যা করেছো নিশ্চয়ই
আমার মঘাগ্রস্থ উত্তর পুরুষের
তোমাকেও আমার সন্দেহ

অন্ধরা করে না কখনো
সত্য মিথ্যা যাচাই-এর পাঠ
তুমি পোষ্য ধারাভাষক
শুধু বাক্যেই আমাকে তৃপ্ত করো

রক্তের নদীও অদৃশ্য ঘোর তমিস্রায়।

নকুল রায়
দোলা লন্ঠন

দু'দিকে দুলে ওঠে লন্ঠন, শীর্ণ হাত আমার মা, দাঁড়িয়ে দেখতেন আমার চাওয়া,
ফিরে গিয়ে বলবো অপর্ণাকে, বলবো আমার ছেলে শিন্টুকে

মা'কে রেখে গেছি একা, আঁধার রাতের জ্বলন্ত হ্যারিকেন হাতে আমার
পরম পূজনীয়া, যার গর্ভধার ছুঁয়ে আছি ভবিষ্যতের দিকে

দূর থেকে দেখা যায় আরো দূরের তারারাও চলছে লণ্ঠনের মিছিলে, আমি
টের পাই, বাবার ছোঁয়া, বাবার মৃত্যু আমাকে তাড়িত করে, বাবাকেও
যেন খুঁজে পাই অজস্র জনস্রোতে, আমার ছেলে যেমন আমাকে অদৃশ্যেও
খোঁজে, বড়ো কাছাকাছি এই সংসার, সুখ

দুঃখের জন্যে কোন প্রার্থনার প্রয়োজন নেই, সে এমনি-ই আসে,
না-চাইলেও আসে, দুঃখ প্রাপ্তি মানুষের জন্মগত অধিকার, কিন্তু
সুখ, তার জন্যে পেতে হয় কতো না দুঃখ কতো না যন্ত্রণা

দু'দিকে দুলে ওঠে লণ্ঠন, এটা অস্তিত্ব, যখনই টের পাই ঘুমেও
আমার শরীর মাধ্যাকর্ষণেই আছে, খারাপ লাগে, ঘুমন্ত মনের কোন
মাধ্যাকর্ষণ নেই, ভারহীন এক তারার মিছিলের যাত্রী, শরীরের
মনে দুঃখ হয়, দিনান্তে দু'মুঠো অন্ন বেকারের মুখে বিষবৎ,
রোজগারহীন স্ত্রী ও পুত্র, এরা ক্রমে হয়ে উঠেছে আমার নিম্নগামী
সহচর, প্রবোধে সান্ত্বনায় খোদাই ক'রে দিই তাদের আকাঙ্ক্ষা,
প্রত্যেকেরই পাওনা আছে আমার কাছে, আমার না-দেয়ার
অক্ষমতাই আমাকে ক'রে তুলেছে পরাশ্রয়ী, বেকার এবং পদার্থহীন সময়ের ছাল-বাক্‌লা,
আছি আমি এক রঙীন স্বপ্নের কারিগর

আমি যাচ্ছি, মা এগিয়ে দিচ্ছেন, মা'র হাতে দুলে ওঠে লণ্ঠন,
দূর যায়, বহু দূর যায় তার চোখের মণি, যতোই সামনে
বাড়াই পা, পেছনের পায়ে জড়িয়ে পড়ে মায়ের স্নেহ, কোন
ভুল নেই এই ভালোবাসায়, সন্তানের মুখে ভাত জোটে না, তাই
তোমাকে আগে ভাত জোটাতে হবে, মা বলছেনঃ আমি দাসী,
তুমিও দাস, তোমার বাবাও ছিলেন একজন ক্রীতদাস, ভারতের
প্রতিটি সড়ক চলে গেছে ভিক্ষুকের আন্তঃকরণে, যে দাতা
সে-ও দুনম্বরি, বুক খুলে কেউ দেয় না, মুখ খুলে সবাই খায়,
অন্যের মাপের জুতো পরে হাঁটে ক্রীতদাসেরা, কারণ তাদের
কোন নিজস্ব মাপ-জোঁক নেই, বাবুদের পোষাকই তাদের
কাছে রেডিমেড, যখন যে যা দেয় তাই তুমি পরো

রেষ্টুরেন্টের টেবিল থেকে ছিটকে আসে সুখের পরিবেশনের গন্ধ,
তার পাশে দিয়ে যেতে যেতে, এই অন্ধকার শহরের এক কোণে
মনে পড়ে, আমার স্ত্রী ও সন্তান না-খেয়ে আমার মুখ চেয়ে বসে আছে,
আমার মা'র হাতে ঘন ঘন ঝাঁকানি, আরো একটু উপরে তোলেন লণ্ঠন, দেখেছেন ভবিষ্যত।

সন্তোষ রায়
তাঁকে প্রদক্ষিণ করে

না, আর কিছু বলছি না আমি
এবার আপনারা বলুন কেমন বলেছি এতোক্ষণ
আর কী-ই বা বলার ছিল আথবা কোথায় আমার
প্রণাম ছিল, কোথায় উদ্ধত ফলা, কোথায় রক্ত মুছে
আঁতাত ছিল আড়ালে।
কোথায় জলছবি ছিল, কোথায় শুধু কথা ছিল কোন্‌খানে
অন্তত কিছু বলুন সকলে।
আগুন দিয়ে আগুন ঢাকার এখন এক শান্তির ক্ষণ
দেয়ালে দেয়ালে অজস্র প্রতীকে ঢাকা দুঃসময়, এইতো সময়
আপনাদের কিছু বলার। বলুন। আপনার পূজারী ঘরের
দুয়ারে হাজির।
এই উৎসব থেকে আরো কিছু স্বজন ফিরবে না জেনেও
পুষ্পের ডাল ধরে বসে আছি।
হে নিরপেক্ষ বৃক্ষরাজি কিছু বলো
কিছু বলো অসাম্প্রদায়িক নদী-মানচিত্রের ভেতর
আরো কতো মানচিত্র ছড়াচ্ছে চর্মরোগের মতো অথবা
আসন পিছু কতোটা প্রাণ নিবেদিত হলো বিনা শব্দে
বলো শকুন
বলো কুকুর
বলো শ্রদ্ধেয় ঘাতক ভাই
    বোবা মানুষকে বলো
    কালা মানুষকে বলো
    ব্যঙ্গ করে বলো
    গর্ব করে বলো—
তুমি কোন্ কাপুরুষের নপুংসক কার্তুজ।
আমার দুয়ারে কালো মেঘ
জানালা শিকে প্যাঁচিয়ে আছে বিদ্যুৎলতা
এই সময় আমার মুদ্রা, তোমার বলো পোষাক ভাই,
বলো ব্যবহৃত চশমা, রুমাল বলো আমার গোপন দৃষ্টি অথবা
মুখ চাপা কথা

কেউ কথা বললে না।

পোষাকের পর পোষাক খুলে আমার নগ্নতা পেলাম না।
সবুজের দেশে জল ভেঙ্গে যাচ্ছে নৌকো
লতায়-পাতায় শেকড়হীন আলপনা

স্বদেশের ব্রত আজ কোন্ রীতিতে ?
মাটির গান কেড়ে নেয় কোন্ উপকণ্ঠ?

আমি বৃষ্টির পর আবার বলবো কথা
এখন শুধু ভাববো বসে প্রশ্নের শেষে কি প্রশ্নই থেকে যায়?
না, কি ঢেউয়ের পর দেখা যাবে চরের প্রদেশ।
কতোদিন যেনো ফেরার হয়ে আছি।
সূর্যাস্তের পর চোখ খুলে আকাশটাকে দেখি
মাটির টানে চলে আসে নক্ষত্র
ব্যাঙ ডাকে স্বস্তির আশায় চারপাশে

বৃষ্টি হলে উরুর তিল ডুবিয়ে ঢুকে যাবে জল। ধকুনের মতো বাঁকা
হয়ে হঠাৎ তীরগতিতে ছুটে যাবে গলুই নিয়ে স্রোত
ছুটে আসবে জলরক্ষী মহাযান
— "হল্ট, পরিবেষ্টিত তুমি, হাতিয়ার রেখে দাও শীঘ্র"
আমি গলুই থেকে নেমে চলে যাবো নির্দ্ধিধায়
আমার হাতে কোন অস্ত্র নেই
আছে কিছু দৃশ্য দেখা, আর না বলা কথা
যা দিয়ে অনায়াসে গড়ে তুলতে পারি যে কোন মানবিক অস্ত্র
যদি পারো তুলে নিতে পারো সব
নয়তো সাময়িক বন্ধ করে দিতে পারো দরোজা কপাট,
তার চেয়ে বেশী হলে মিশিয়ে দিতে হবে
এ দেশের মাটিতে রক্ত আমার
এ আমাদের দেশ
এ দেশ সরকারী নয়
নয় কারো ব্যক্তিগত
সবারই ব্যক্তিগত, সবারই ব্যক্তিগত,
রক্ত আমি দিতে পারি, কিন্তু কোন যুদ্ধে দেবো না তেল।
যুদ্ধ করো অলঙ্কার নয়, অহঙ্কার কারো করো
আসন পেতে যারা দখল নিয়েছো ক্ষেত্র
শোন, এদেশ নয় কারো ব্যক্তিগত
সবারই ব্যক্তিগত, সবারই ব্যক্তিগত ।
অরণ্যের ডালে-আবডালে যারা বিছিয়েছো অস্ত্র,
শোন, এদেশ অধিকৃত নয়, সবারই স্বীকৃত, সবারই স্বীকৃত।
বহুকোষী দেশ, দৃশ্য, সবল
মাথার 'পরে পাহাড়, পায়ের নীচে জল
পূর্বে-পশ্চিমে দু'বাহু জড়ায়ে
বুকে মানুষ স্বজন।
যুদ্ধ যদি করো সৈনিক, তবে, আগে

মানুষকে দখল করো
এ মাটির চেয়ে বিশাল এক ভূমি আছে তার ভেতর
অস্ত্র রেখে তাকে প্রদক্ষিণ করো
তাকে প্রদক্ষিণ করো
তোমার কোন আলো নেই বলে
তুমি প্রদক্ষিণ করো
তুমি প্রদক্ষিণ করো
যে-নক্ষত্রের মাংস পিণ্ড ছিটকে তোমার সৃষ্টি,
সে তোমার ভাই
পৃথিবী, চাঁদ অথবা আরো কোন গ্রহদের মতো
প্রদক্ষিণ করো।
তাঁকে প্রদক্ষিণ করো।
ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে একবার দেখাও বক্ষ, একবার দেখাও পিঠ।
এ-ভাবেই নিরস্ত্র রাত দিন, ভালোবাসাময় পূবের সাগর থেকে,
সুউচ্চ পশ্চিমের চূড়া থেকে উঠে আসবে।
তিথি ভেঙ্গে একবার নিঃস্ব হবে
তিথি জুড়ে সুপুষ্ট হবে একবার
সোনাতনের বৌ আতঙ্কে প্রসব আর আটকে রাখবে না কোন দিন
যুদ্ধ যদি করো সৈনিক তবে আগে
মানুষকে দখল করো
এ-মাটির চেয়ে বিশাল এক ভূমি আছে তার ভেতর
অস্ত্র রেখে তাকে প্রদক্ষিণ করো
তাকে প্রদক্ষিণ করো।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

ফিরে এসো

শাখান থেকে ফিরে এসো বন্ধু
গোপন ভূমিতে আর কাটাবে কতোকাল
নেমে এসো খোলামেলা ঢালু জমিতে
এসো আবার নেচে উঠি গড়িয়া আর গাজনে

ফিরে এসো বন্ধু, কালাশনিকভ বন্দুক ছেড়ে
হাতে তুলে নাও চম্‌প্রেঙ্
আরো বড়ো শত্রু রয়েছে ঘরে ও বাইরে

এসো তাকে সনাক্ত করি, টুটি চেপে ধরে বলি
ফিরিয়ে দাও সব জুমের কাহন
চাই অবাধ অরণ্য
নিরাপদ বসত আর স্বপ্নময় ঘুম
ফিরে এসো বন্ধু তুমি বৈরী
জুমের আগুন দগ্ধ হতে হতে
পুড়ে খাক্ হয়ে যাক সব
পুরাতন পাপ, এসো গোমতীর
জলে উদোম স্নান করি,

ঘরে বসে আছে গড়ন্তী রিয়াং
আছে গুধক আর চাখই
ফিরে এসো, শুনি এক স্বপ্নিল চেথুয়াং

চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং
পরিত্যক্ত জুমের টং-এ সর্প ডাকে

ততেমার জন্যে এক চোঙ মাছ আনব বলে
ঝরণার জলে খুঁজে খুঁজে
জলের ধারে জীবন সয়ে গেল।
ততের জন্যে এক চোঙ মাছ আনব বলে
ছড়ায়-নালায় ঘুরে ফিরে
নদীর বুকে পা-টা ঠেকে গেল।

এ নদীর শেষ কোথায় কেউ বলে না —
নৌকার মাঝি শুধু ওপারের গল্প আনে বয়ে,
আমি জানি অরণ্য টং -এর যত কাহিনী।
প্রতিক্ষণে হাতছানি কতো দেয়
পরিত্যক্ত জুমের টং-এ যে বেঁধেছে ঘর —
রূপকথার অজগর।

এখন ঘাটে বসে মাঝিকে যখনই ডাকি,
অজগর আমায় ডাকে পাহাড়ের ওপর থেকে
সে তো জানেনা আমি নই তার প্রেমিকা।

দিলীপ দাস

উদ্বাস্তু সংলাপ

যারা যেতে চায় তারা চলে যাক।
আমি আর কোথাও যাবো না।
আমার সন্তানেরা যদি দূরে যেতে চায়
তারাও যাক। আমি
এখানেই থাকবো। এই টিলা-লুঙ্গা ছড়ার দেশে
কাঁঠালপাতার ঘরে একান্ত আপন মনে
ধ্বনি-প্রান্তর মুখরিত ষষ্ঠি পোকাটির মতো —
ব্যাধের রক্ত নেশা আমি দেখিনি তা নয়
মানুষ কেমন করে মুহূর্তে জানোয়ার হয়ে যায়
সে দিনগুলোও তো খুব পুরনো নয়
এখন তো প্রতিদিন খোঁয়াড়ের ব্যবসা
কেমন জমে উঠেছে তা অসহায়ভাবে দেখছি —

মাঝে মাঝে তাই মনে হয় এখান থেকে পালাই
কিন্তু পালিয়ে কোথায় যাবো
একই তো আকাশ
সব সমুদ্রেই তো ঝড় ওঠে
সব নদীই তো পার ভাঙে
তাহলে পালাব কোথায়
পালিয়ে কি নিস্তার মেলে?

আমি আর কোথাও যাবো না।
বনে আলু খেয়ে যারা এখনো বাঁচে
তারা তো আমাকে যেতে বলে না
ব্যাধের ভয়ে আমি কেন পালাবো?

আমি এখানেই থকবো।
এই টিলা-লুঙ্গা-ছড়ার কিনারে
বয়ে যাওয়া ছোট নদীটির মতো তির্‌তির্‌
যদি পারি খরার দিনগুলোতে
এক অঞ্জলি তৃষ্ণার জল দিয়ে যাবো—
সেইসব ভূমিপুত্রদের বলে দাও
সেইসব ব্যাধ আর খোঁয়াড় ব্যবসায়ীদের বলে দাও

আমি এখানেই থাকবো —
এই ছড়া— এই টিলা— এই লুঙ্গা—এই বাঁশবন
আমায় যতদিন না ছাড়ে

যারা যেতে চায় তারা চলে যাক।
আমি আর কোথাও যাবো না।

বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী
আগরতলা

আগর ফা এর আগরতলা নাগর পায়ে হাঁটে
হাতে গোণা কয়খানা ঘর কয়টা দোকান পাটে
বসত বাজার গোলবাজারে, মেলার মাঠে, মেলায়
এখন কলেজ পড়ায় তখন সাত সন্ধ্যে বেলায়
নামত হাতি বুনো শেয়াল হালুম হুলো বাঘের
দাঁত কাঁপুনি, হাড় কাঁপুনি, শীত কাঁপুনি মাঘের
কাঁপতে কাঁপতে জ্বলত ঘরে চেরাগ নাকি কুপি
মগ ডালেতে ঝুলত বাঁদর একলা চুপি চুপি।

জংলা জমি ঝোপ ঝাড়েতে সেদিন আগর-তলে
ঘাসের মাথায় জোঁক কিলবিল, রাতে জোনাক জ্বলে,
দুর্গা কামান চৌমুনিতে এখন জমে বাজার
তখন শেয়াল গাইত খেয়াল্ পাখি হাজার হাজার।
পাগলা গণেশ ভয় মাখানো ঘুম ভাঙানো রাতের
টিন বাজানো মশাল জ্বেলে হল্লাটি এক সাথের।
হল্লা মানেই ছুটত হরিণ উড়ত পাখি ধনেশ
মা বলত ঘুম্নো খোকা আসছে পাগলা গণেশ।

বাঁদর নাচা ভালুক নাচা রোদ সুনসান দুপুর
তাকুড় নাকুড় পুজোর ঢাকে ঘুম কাড়ত খুকুর।
ঘোড়ার গাড়ি গরুর গাড়ি পাল্কি চড়ে বরের
সেদিন ধনী গরিব কুলীন শোভা কনের ঘরের।
মেলায় মেলায় বিকেল বেলায় তখন পুতুল বাঁশি

একটু পাওয়ার মাঝেই ছিল মুখটি হাসি হাসি।
পায়ে ঘুঙুর রিনিঝিনি ভানুমতীর খেলায়
বাদাম ভাজা জিলিপিতেই মন হারাত মেলায়।

বাঁশ বাগানের বনের ভেতর চাঁদ হারানো জলে
ভাসত ছবি হরিণ ছানার এবং পাখির দলের
একলা একা হাঁটত নদী পাতার ফাঁকে ফাঁকে
কলার মোচা সিঁদল পোড়া বড্ড কাছে ডাকে।
এই তো ওষুধ ম্যালেরিয়া, হাড় কাঁপানো জ্বরের
দারুণ জ্বালা পালা পালা, সব ক'টা গ্রাম ঘরের।
তবুও আগরতলায় ছিল, উজাড় করা প্রাণ
বাইরে বাউল একতারাতে শচীন দেবের গান।

আশ্রয়

নিঝুম রাত জোনাক জ্বলছে দূরে
বিদায় বাঁশি উঠলো বেজে ছোট্ট রসুলপুরে
হালিম চাচার সঙ্গে ছিলাম আমি
চলতে চলতে পিছুর টানে একটু আধটু থামি।
ডাইনে আমার স্কুলের বাড়ি বাঁয়ে খেলার মাঠ
খালের পাড়ে বটের ঝুড়ি শনিবারের হাট

লেবু দিয়ে খেতাম চানা
লঙ্কা দিয়ে মুড়ি
এই মাঠে রোজ দাঁড়িয়ে বাঁধা
ওই মাঠে রোজ ঘুড়ি।

ফেলে যাচ্ছি চুপি চুপি
আমার সকালগুলি
দুঃখ ভরা মনের ভেতর
ছবি আঁকছে তুলি।

আঁধার রাতে ঘর পালিয়ে
দুঃখেতে মন ভাসে

জন্মভূমি ছেড়ে আমি
যাচ্ছি পরবাসে।

মন খারাপে ভাসছে শহর
মন খারাপে গ্রাম
চোখের জলে নৌকো বেয়ে
গঞ্জে পৌঁছুলাম।

আঁধার তখন মাথার উপর
আঁধার তখন মাঠে
গা ছম ছম ঝিঁঝিঁর ডাকে
কে যেন ওই হাঁটে।

সূর্যি ওঠার অনেকটা পথ বাকি
বুটের আওয়াজ পরনে সব খাঁকি
যেই দেখেছি আসছে হেঁটে
একটা লম্বা একটা বেঁটে
অমনি ভয়ে পাতার ফাঁকে
আড়ালে গা ঢাকি।

একটু বাদেই হালিমচাচার
আবার ডাকাডাকি।

রাতটা বেড়ে মস্ত বড় আজ
মাথার উপর তারার সেকি মিস্টি কারুকাজ
একটা জ্বলে একটা নেভে একটা মিটি মিটি
মা বলেছেন, পৌঁছে কিন্তু আমায় দিবি চিঠি

কু-ঝিক ঝিক রেলের গাড়ি
আঁধার কুরে খায়
বন কাঁপিয়ে মন কাঁপিয়ে
দৌড়ে ছুটে যায়।

কোথায় যাচ্ছে রেলের বাঁশি
অনেক ঘুরে ঘুরে
বুকের ভেতর যা ছিল তোর
হারায় কি সব দূরে।

ভালোবাসার সুরমা তিতাস
মেঘনা ধলেশ্বরী

ফেলে আসতে লাল পাহাড়ে
ডাকলো কোন ঈশ্বরী।

ঈশ্বরী নয় ঈশ্বরী নয়
ঝাউ এর লতাপাতা
তাল সুপুরী গাছের ফাঁকে
আকাশ তুললো মাথা।

আকাশ ডাকে দু'হাত তুলে
বাতাস ডাকে নেচে
আমার জন্যে ঘর খুঁজতে
পাহাড় ছুটে গেছে।

পাতায় ঘেরা বনবীথি আর
বনবালিকার ঠোটে
ভালোবাসার পদ্মবেলি
হঠাৎ জেগে ওঠে।

তারই চোখে দু'চোখ রেখে
গাড়ি থেকে নামি
কখন যেন আপন হলাম
তার কাছে এই আমি।

লক্ষ্মণ বণিক
তেল বিষয়ক

তেল আর পেরে উঠছে না
আমাদের সবার স-তেল ছোটাছুটি
রান্নাঘর থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে তেল চলে যাচ্ছে
অমুকের মাথায় তমুকের মাথায়
ঘর, পাড়া, রাজ্য ও দেশের গণ্ডীর ভেতরে শুধু নয়
আন্তর্জাতিক স্তরেও তেলের ওঠ বোস আকছার
সর্ষের তেল, তিলের তেল, বাদাম তেল, রেপসীড
সানফ্লাওয়ার, পোস্টম্যান, ভাইটাল, কডলিভার আরো
আরো কত ইত্যাকার তেলে তেলে দেশের বাজার ছয়লাপ

এছাড়াও তেল উপচে পড়ছে রাগে ও খুশিতে
গৃহিনীর, গৃহকর্তার, কাজের মেয়ের, বাসন-কোসনের
হাঁস মুরগির, গরু মোষ ছাগলের।

এতসব সত্ত্বেও এখন এক বিন্দু নির্ভেজাল তেল বাজারে মেলা ভার
গলায় ব্যাঙ বাঁধলে বাঘের দুধ বরং মিলতে পারে।

তবুও কিছু তেল রয়েছে যা চোখে দেখা যায় না
কেবল ব্যবহারে টের পাওয়া যায়।

কিশোররঞ্জন দে
অর্চনা শিবাজীকে এপ্রিল ফুল করেছে

একসঙ্গে বড় হয়েছে তো, একজন আরেকজনের
পেছনে লাগে খুব। (অবশ্য একসঙ্গে বড় হলেই যে পেছনে লাগতে হবে এমন কোন
তীক্ষ্ণ কথা রামায়ণে লেখা নেই)

ছেলেবেলায় একসাথে তারা স্পর্শ করেছে
রঙ আর জলাশয়, তাদের হৃৎপিন্ড একসঙ্গে বেড়েছে
একটামাত্র বৃষ্টির ফোঁটা দুজনের গাত্রচর্ম ভেদ করে
চলে গেছে অথৈ গভীরে।

আজ না হয় ছেলেদের মেয়েদের কলেজ আলাদা
তবু রাস্তা তো আছে, এতো কষ্ট করে মানুষ রাস্তা
গড়েছে কেন? হয়তো শিবাজী একা, হাতে তার খাতা আর বইয়ের ভার
অন্য হাত ব্যস্ততায় মাঝে মাঝে ঠিক জায়গায় ঠেলে দেয়
শক্তিশালী চশমার ফ্রেম। ঐ চশমা কি কোনদিন
ঠিকমতো ঢাকতে পারে তার মন্দির মন্দির চোখ?
অর্চনার সঙ্গে তখন অন্য মেয়েরা।
হলে কী হবে? মেয়েটা এমন পাজি
শিবাজীকে দেখলেই বলবে শুনিয়ে শুনিয়ে
'এস্ এইচ ই শী, শী মানে সে, মহিলা
আর বাজী? এবার অনেক বাজী পোড়াবো বুঝলি দেওয়ালিতে'

তখন আঠারোটা মেয়ে একসাথে বেজে ওঠে হি হি হি হি
রাগে গা জ্বলে শিবাজীর, গা জ্বলে
পায়ের গতি দ্বিগুণ বাড়িয়ে তবেই নিষ্কৃতি।

আর অর্চনা একা থাকলে একেবারে পূজারিণী যেন
তার শান্ত পদক্ষেপ আলতো করে ছোঁয় পৃথিবীর বুক
একেবারে ভাল মানুষ! কে বলবে ও মেয়ের মগজে
এতো শয়তানি? শিবাজী ছাড়বে কেন?
বন্ধুদের উপদেশ দেবে বিজ্ঞের মতো
'ও রচনা ওভাবে লেখা ঠিক হয়নি রে
পুজো-অর্চনার কথা বাদ পড়ে গেছে।'
ছেলেদের চেয়ে জোরে হাঁটতে কি অর্চনা কোনদিন পারে?
সেদিন কলেজ থেকে বাড়ি সারা রাস্তা তার জন্য অনেক লাঞ্ছনা থাকে।

কী একটা বই নিতে অর্চনা এসেছে আজ শিবাজীর কাছে
এমন বোকা না ছেলেটা, এমন বোকা, একেবারে মনে নেই তার
আজ যে পয়লা এপ্রিল। চোখ দুটোকে আরো বেশী
মন্দিরের মতো করে অর্চনাকে বলেছে
'তোমার কবরীতে দেখো সাদা গোলাপ ফুটেছে।'
আরে মূর্খ, সাদা কোথায়, তোর কথা শুনে
অর্চনার গালে লাল মেঘ জেগে ওঠে, দেখ।

এফ ডাবল ও এল ফুল, ফুল মানে বোকা
ওদিকে দেখো ছেলেটাকে বোকা বানিয়ে মেয়েটারও
স্বস্তি নেই একেবারে, শিবাজীর পড়ার ঘরে পোষা তোতাটা আছে যে
এমন খারাপ পাখি। কী লজ্জা! এতো জোরে এক কথা
বার বার বলে কেন?
'অর্চনা শিবাজীকে এপ্রিল ফুল করেছে।'
ছেলেরা বেহায়া হলে কি হবে? অর্চনার কি লজ্জা নেই?
বাধ্য হয়ে আরো ঘনিষ্ঠ হতে হয় তাকে
'এই শিবাজী, লক্ষ্মীটি! পাখিটা এতো জোরে জোরে বলে কেনো!
থামাও না ওকে, এই।'

কৃত্তিবাস চক্রবর্তী
শেষ স্তবকের খসড়া

আজ আমি শেষতম স্তবকটি লিখছি
প্রিয় বন্ধুরা, খোঁপায় ফুল গোঁজা নারীরা
হে প্রভু আর ক্রীতদাস যত
শোনো, এই শুকনো মাঠে ফসল না ফলার কাহিনী
রসদ ফুরনো এই বিশ্বসংসারে আমি পেতেছি হাত
এই অমেয় ব্রহ্মের কাছে, এই অসীমান্তিক নক্ষত্র-প্রদেশে
এই অযুত-নিযুত প্রাণের কাছে অমি হাত পেতে আছি

আমার করতলে উপেক্ষার আগুন অপেক্ষার বিষ আর বিচ্ছেদের দাহ
আমি দেখছি স্বপ্নহীন মানুষ বেরিয়েছে দিশাহীন, সমাপ্তিহীন পথে
শেষ স্তবকে তার পরিণতির কথা নেই, নেই নিয়তির কোন পূর্বাভাস
সম্পূর্ণ ধসে যাবার আগে এক পায়ে ফুল ঘেঁটে
অন্য পা চাক্ষুষ নরকের কাদায় ডুবিয়ে এক অন্য পথে আমিও গন্তব্যহীন
এক পায়ের রেখায় আমার উত্তরসুরীর পথ
অন্যটিতে কলঙ্কিত অধ্যায়ের দাগ রেখে গেলাম।

আমি দেখেছি যুদ্ধের মাহেন্দ্রক্ষণ, দাঙ্গা পরবর্তী মাটির রঙ
দেখেছি খণ্ডিত শরীরে শাসনের উপদংশ নিয়ে
জাহান্নামের পাশ দিয়ে নির্বিকার চলে যাওয়া কিছু মানুষের বোকামি

বন্ধু, কেবল এদেশেই ঈশ্বরের চাষ হয়
লাঙলে বিক্ষত ধর্মক্ষেত্রে বীজ বোনে শ্যাম ও করিমের বশংবদ
হাজার বছরেও অন্ধের ঈশ্বরদর্শন হলো না
এই অন্তিম স্তবকের খসড়ায় লোভী ও তস্কর দুনিয়ার
যত চক্ষুষ্মানদের চোখের জল পড়ুক
তারাও অঝোরে কাঁদুক যারা তথাগতর চিরস্মরণীয় শিল্পকে
ধুলিসাৎ করে বীরত্ব দেখিয়েছে।

আমার এই অন্তিম স্তবকমালার শেষতম শব্দটি হোক—'ভালোবাসা'
সবচেয়ে ঘৃণ্য বাক্যটির পাশে তোমরা বসিয়ে দিও — 'লজ্জা'
যদি প্রেমের পংক্তি কিছু থাকে তাতে একবার ঝরুক বেলফুলের হাসি
মনুষ্যতর করে রাখা মহাপ্রাণ মানুষকে স্তবকের চূড়ায় রেখে
যত ইতরপ্রাণের পাশে বসিয়ে দিও — 'দয়া'
প্রেম হোক, প্রেম হোক, প্রেম হোক স্তবকের শেষ উচ্চারণ।

প্রত্যুষ দেব
স্বাধীনতার পঞ্চাশ ও ভারতভূষণের গল্প

আজ থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে
স্বাধীনতা নামে এক কিশোরীর সাথে দেখা হয়েছিল
দিকশূন্যপুরের ছেলে ভারতভূষণের
ভারতভূষণ তখন বাইশ বছরের যুবক
দুরন্ত ঘূর্ণির মতো স্বাধিকার বোধে
উদ্ধত বন্দুকের মুখে বুক পেতে দাঁড়িয়ে
স্বাধীনতা নামের সেই কিশোরীকে
ভালোবাসার দুরন্ত সব সংগীত শোনাত সে
আসলে, স্বাধীনতা নামের সেই কিশোরীকে নিয়ে
ভারতভূষণের তখন অনেক স্বপ্ন, আনেক কল্পনা

দিকশূন্য পুরের ছেলে সেই ভারতভূষণ
এখন বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ
স্বাধীনতা নামের সেই কিশোরীকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত
তার আর ঘর করা হয়ে ওঠেনি
সে কথা সবার জানা

ভারতভূষণ এখন
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য বরাদ্দ
চার আনা ছ'আনার ভাতা প্যয়
ভাত কাপড়ের জন্য,
অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগে তার স্ত্রী গত হয়েছেন
বেশ কয়েক বছর আগে
ভারতভূষণ এখন নিজেই রোজ দু'বেলা
মোটা কাচের চশমা চোখে
রেশনের চালের কাঁকর ও পোকা বেছে
পরমান্ন রান্না করেন, খান।

ভারতভূষণের তিন ছেলে, এক মেয়ে
বড় ছেলে অনির্বাণ প্রগতিশীল রাজনীতি করত
এবং এই অপরাধেই কয়েক বছর আগে
সে খুন হয় বিরুদ্ধ রাজনৈতিক দলের সভ্যদের হাতে
মেজ ছেলে কিশলয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র হয়েও

একটা চাকরির জন্য দরজায় দরজায় ঘুরে
ব্যর্থ হয়ে অবশেষে আত্মহত্যা করল
ছোট ছেলে ঐক্যতান গত সপ্তাহে নিষিদ্ধ ঘোষিত
বৈরীদের হাতে অপহৃত হয়
তার মুক্তিপণ পাঁচ লক্ষ টাকা
আর ভারতভূষণের একমাত্র মেয়ে, জ্যোতির্ময়ী
প্রকাশ্য দিনের আলোয় গণধর্ষণের পর
মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে এখন শুধু
কালো কালি দিয়ে অন্ধকারের ছবি আঁকে

এতসব ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনার পরেও
বৃদ্ধ ভারতভূষণ কাপড়ের খুঁট দিয়ে
চশমার কাচ মুছতে মুছতে
পড়ন্ত বিকেলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে
ভাবতে থাকে, আজ থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে
স্বাধীনতা নামে এক কিশোরীর সাথে
তার দেখা হয়েছিল।

মাধব বণিক

হে বালক, এখানে ঘুড়ি ওড়াবে না

দেবদাসীরা পায়ে ও গায়ে লেগে থাকলে, কীরকম হয়?
ভাবতে ভাবতে সুধাংশুরঞ্জনের চুল এখন শীত-সকালের শেফালিতলা।
রাজনীতি ও ইকনমির ব্রহ্মাণ্ডবাদ
লালকেল্লা থেকে দ্রুত নেমে আসছে ব্রহ্মপুত্র হয়ে গোমতীর বালিভূমিতে।
গৃহের দুই সাবালিকাকে দেশের নাগরিক বাজেটের ঠিক কোথায় রাখা যায়?
রিলায়েন্সের দূরভাষ সেবা কিংবা মারুতীর নিউ মডেলে চড়ে
দেশ এগোয়,
ভাত মেখে বসে থাকে কালাঝারির ভাগ্যবতী।
বেস ক্যাম্প কী? কোথায় পাওয়া যায়?
তার প্রশ্ন কেমন আন্‌-কমন মনে হয়
এমন প্রশ্ন করতে নেই মা।

সকাল দশটায় টাইম বম্ বাধা থাকে মাথায়
মাধুরী দীক্ষিত দৌড়ে পার হন বটতলা ব্রীজ
রবিবাবুর শেষের কবিতা নয়, এখন হ্যারি পটারের স্পীড
কিংবা দিল্লীর কানেকশান, লবণ হ্রদে আপনার প্লট
কে আটকায় ঠাকরুণ?
ইরাকের শরণার্থী শিবির থেকে নব্ ঘুরিয়ে
রবীন্দ্রকাননের জ্যামিতিক ধাপ হয়ে
তুমি যাজ্ঞসেনী রায় ধুপ আর ল্যাভেন্ডার ডিউ-এর
মাঝে বছর গুনলে শুধু।
মেঘ এলে আকাশ ভাঙবে,মাছের পোনারা দল বেঁধে
রাইমার ছায়ায় সরমার দিকে ছুটে যাবে
তুমি হে বীরপুঙ্গব, থ্রি-নট-থ্রি নিয়ে মাছের কেলি দেখছো?

এখন ছায়ার স্বপ্ন নয়
বেলা পড়ে আসছে, জলাভূমিতে ট্রাক নামছে, মাঠ বাড়ছে।
ইট সুরকি সিমেন্টের কারখানায় ছাড় দিচ্ছে রাজ্য।
পাড়াতুতো দায়িত্বপ্রাপ্তরা কমন মিনিমাম প্রোগ্রামে এক, ঐক্যবদ্ধ
অয়দিপাউস-ইনজিওরি থেকে দ্রুত সেরে উঠছেন জেলাভিত্তিক দাদা
আমরা সতর্ক সিদ্ধ নির্ভুল
হামলা হলে গুজরাট রোল মডেল

রাষ্ট্র বলছে ভাঙাই জীবন, চালাই গতি, পদার্থবিদ্যার মূল থিম
কোটি কোটি বছর ধরে ব্রাহ্মাণ্ড ভাঙছে গলছে আবার ভাঙছে, তাই
ভাতেব দানা ম্যাকডোনাল্ডের পিৎজা হয়ে ফিরে আসছে
বোমা বর্ষণের পর পর চলে আসছে অ্যাম্বুলেন্স
হে মধ্যমবর্গের চতুর্থ সন্তান, মায়ের চোখে কী খুঁজছিস বল্?
বৃদ্ধ পিতার ক্লান্ত মুখ? নাকি শুকনো থালায় পেটের গ্যারান্টি?
টিকটিকি নিভৃতে বসে থাকে, শিকার ধরে, গিলে খায়
রাজবাগানের কবি কলমের নিবে অ্যাকোয়াগার্ড লাগিয়ে ফরেন ট্যুরে যান
আজ থেকে এই আকাশ এই বাতাস এই দূরচক্রবালের মালিক
হন্ডা পেপসি ওনলি বিমল
হে বালক, এখানে ঘুড়ি ওড়াবে না
ফড়িঙের পিছু ছুটবে না
মাঠে গোল্লাছুট একদম না
তাহলে বাতাস বন্ধ করে দেবো, সূর্যের আলো আটকে দেবো
এখন ভাঙার সময়—ভেঙে যাও, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ধুলো হয়ে যাও
এখানে পশু নেই মানুষ নেই সবাই নৃসিংহ
কার্টুনের প্রহ্লাদ ডি ডি চ্যানেলে তোর বুকিং আছে?

পল্লব ভট্টাচার্য
বিবাদির উকালতনামা

সত্য কথা বলবো হুজুর, হাত রেখেছি গীতায়,
কালকে রাতে আগুন আমায় ডেকেছিলো চিতায়।
শুতে চাইলেই কাড়তো আদর, শুই নি শুধু ভয়ে
চিতার ভেতর হাড়ের রেখা যাচ্ছিলো তার ক্ষয়ে।

হুজুর এমন জটিলতায় কেউ ডাকে নি আমায়,
যাওয়ার আগেই বুকের কাছে দু'হাত ধরে থামায়,
দেখায় বুকের কোনখানে ঘাঁ, কোথায় রাখা লবণ
কোন সফেদে পুড়ছে চাওয়া, কাফের কালো যবন।
জ্বালায় খাঁজের অগ্নি। আগুন জ্বলছে কতটুকু?
চোখের কোলে ঝিলিক মারে দশ বছরের খুকু।
হুজুর, আমার নষ্ট হওয়ার ইচ্ছে ছিলো পুরো,
পুড়িয়ে দিয়ে ছাই করেছি কানাই বাঁকা চূড়ো।
দেখতে পাওয়া সুখে আমার হৃদয় জোড়া চোখ,
নিবিড় হলো, বধির হবে, অন্ধ হলে হোক।

তবু হুজুর পোড়ায়, আমি পালিয়ে যেতে গিয়ে
দেখতে পেলাম জড়োসড়ো দশবছরের টিয়ে;
চোখে আমার চোখ ছিলো না, বুক ছিলো না বুকে,
দু'হাত দিয়ে আড়াল করে, দাঁড়িয়ে ছিলাম ঝুঁকে —

সর্বগ্রাসী আগুন, আরো আগুন খেতে চায়,
তীব্র দাহে সবুজতা পুড়ছিলো তার পায়।
দাঁড়িয়েছিলাম.ঝুঁকে হুজুর, দিই নি পেরেক ঠুকে
লক্ষ্যভেদী কৌতূহলে তীর বিঁধি নি বুকে,
উড়ে যাওয়ার পালক-পাখা ছাড়াই নি মাংসাশী,
দেখেছিলাম, আগুন হওয়া আগুন জ্বালা বাঁশি—
পুড়ছে হুজুর, পোড়াচ্ছে ও, পুনর্জাত চিতায়।
সত্যি কথা বলতে চেয়ে হাত রেখেছি গীতায়।

আগুন ছিলো ভেতরে তার, সেই আগুনে ঢাকা
সিঁথির রক্তে কপাল জুড়ে সিন্দুর টিপ আঁকা
বিলাসবতী সতী ছিলো, সেই খেয়েছে মা-কে।
হুজুর, আমি খুন করি নি। খুন করেছি কাকে?

পুষ্পল চক্রবর্তী

তোমায় আজও জানা হলো না

রবিঠাকুর তোমায় আমার
আজও জানা হলো না।
পঁচিশে বৈশাখের পুণ্য প্রভাতে
তোমার ছবিতে মালা দিয়ে
ছোট ছোট ছেলে মেয়ের দল
নাচে গানে মেতে ওঠে,
আর আমরা তখন একমুঠো
ভাতের সন্ধানে গলা ধাক্কা খাই।
তুমি নাকি বিশ্ববরেণ্য,
কত কি লিখে গেছ —
গল্প, উপন্যাস, গান, কবিতা।
আমাদের তো বর্ণ পরিচয়ই হলো না।
আমরা যারা ফুটপাথে থাকি।
তোমার লেখা তো নোবল্ প্রাইজ আনে
আমার মায়ের একটুকরো কাপড়
এনে দিতে পারে না?
তোমার জন্ম তিথিতে রবীন্দ্রসদন আর
জোড়াসাঁকোতে ভিড় উপছে পড়ে
আমরাও ছুটে যাই সেখানে
তবে অনুষ্ঠান দেখতে নয়, পেটের তাগিদে।
তোমার ছবিতে মালা দিয়ে
ধূপ দীপ জ্বালা হয়,
এক পুজো পুজো গন্ধে মেতে ওঠে চারদিক।
ছোটবেলায় কতদিন বসে থেকেছি
শেষ পর্যন্ত —
পেট পুরে প্রসাদ খাওয়ার লোভে।
একে একে সবাই বাড়ি ফিরে গেছে
আগামী বছরের সংকল্প নিয়ে।
ক্রমে ফুটপাথে ফাটল ধরেছে
বেড়েছে আগাছা
কিন্তু রবিঠাকুর, তোমাকে আমার
আজও জানা হলো না।

পীযূষ রাউত

প্রতিবাদহীন অস্থিরতা

রাত্রির অঘোষিত প্রস্তাব মেনে নিয়ে
সবান্ধব হুল্লোড় করা গেল। তবু আত্মার অস্থিরতা
হ্রাস পেল না কিছুই।
চরিত্র হীনতার পিচ্ছিল পথে যেতে যেতে কতবার যে
পা হড়কে পড়ল, তার লেখাজোখা নেই।

কোন্ কুক্ষণে জননীর জঠর থেকে আবির্ভূত হলো
পাপ, কোন্ কুক্ষণে বর্ণবোধ হস্তে পাঠশালায় গেল
বালক - সমর্পিত হলো সরলতা
তার হাতে, যে হাত —
কূট ষড়যন্ত্র লিপ্ত আছে বহু বহু কাল।

রাত্রির অঘোষিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কে দাঁড়িয়ে রুখে?
হারাধনের দশটি ছেলেই একে একে
শেষ হয়ে গেছে।

হিমাদ্রী দেব

গো বল

রাইতে আইলেন ক্যান্, চুপিচুপি আন্ধার পিঞ্জিরায়
পাতলা ঘুমের মধ্যে জাইগ্যা থাকি — সবই যে ঘুমায়
রিজিয়ার মা কইতো 'মঞ্জিলাগো এত হাসিস্ ক্যান্
কার সাথে কত কথা, শব্দে করিস ধ্যান'।।
একদিন সে চইল্যা গেলো হইলো দেশান্তরী
ওঝায় কয় ধইর‍্যা নিছে আজব দেশের পরী।।
মন চইল্লো আগে আগে বন চইল্লো পিছে
মনের এক বান্ধব ছিলো সে উঠিল গাছে।।
চাইতে চাইতে দিন গেলো দিনরে খাইলো রাইত্।

মগজ খাইলো মেজাজ খাইলো করল না আর বাইত্।
খরার গুণে গুঁড়া হইল প্রজাপতির পাখা
যাইতে যাইতে শেষ হয়না পথ কেবলই আঁকা।
বানাইন্যা ঘর শূন্য হইলো — নদীতে নাই জল
কোথায় যাইবো, কোথায় পাইব, মঞ্জিলা গো বল।।

সনজিৎ বণিক
বর্ণমালা

কালরাতে জ্বলেনি আগুন উনুনে,
আন্ধকার গিলে খেয়ে কেটেছে গতরাত আমার সন্তানের;
পৃথিবীর যাবতীয় বর্ণমালা চিবিয়ে শব্দের উদ্‌গীরণ ছাড়া
এদেশের মাটিতে ফলে না কোনো সুষ্ঠু বন্টন
দুমুঠো ভাতের আয়োজন,
মেলেনা মানুষের ভালোবাসা মেলবন্ধন।

ভিক্ষা দেবে কে? কতোদিন বুকের অসুখ নিয়ে
ভিখিরির ঝুলি কাঁধে এঘর ওঘর?

কালরাতে ছেঁড়া ছাউনিতলে জ্বলেনি কোনো বাতি,
উপোসী শরীরে স্বপ্নের ঘোরে দেখেছি —
বাতি হাতে ফ্লোরেন্স নাইটএঙ্গেল;
শিয়রের পাশে বসে কানে কানে বলে গেলো—
'আমি আছি'
আমি আছি সারা রাত পাহারায়
আমার সোনার যাদু ঘুমঘোরে কেঁদো নাকো আর।'

কালরাতে ঘুমিয়েছি অলস আবেশে
বর্ণমালা চিবিয়ে কেটে গেছে সারারাত-ই।

আকবর আহ্‌মেদ
চাঁদ, মুলিবাঁশ ও বনফুল

অধিক যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠছে বনভূমি, ঘুম ভাঙছে,
এতোকাল প্রজন্মের বাইরের শিশুটি ভয়ংকরভাবে জন্ম নিচ্ছে,
উল্লাসে নেচে উঠেছে মৃৎপাত্র, নেচে উঠেছে লাংগি ও মদ,
নেচে উঠেছে কোলাহল মুখর সন্ধ্যা, যা ক্রমশই রাত্রিগামী
এ ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন রাতটাই ঠিক, না পৌষ মাসের মৃত্যু-উপত্যকা
শূন্য আকাশ অতলে চোরাস্রোতের জমাট বালি!

তবে এ নিমগ্ন রাত্রি তার ব্যাঙ্গমার অভ্যন্তরীণ স্বপ্নের বীজখেত
লতা, গুল্ম ও প্রজনন রেনুর চেতনার বিবর্ধিত প্রত্নতত্ত্বে
এ এক বিচ্ছিন্ন কংকাল, হাড়িকাঠের অবয়ব।
অনাবিষ্কৃত তৃপ্তির পথে অবাঞ্ছিত যৌনতায় রক্তাক্ত
খারপানি মাখানো এক কুমারী-শরীর।
এ নগ্নতাই নিরুৎসাহিত করে নদীটিরে

যে স্বপ্ন যে প্রেমে প্রলম্বিত হয় হাজার বর্গ-মাইল পথ
ঢেউয়ের গান শোনা যায় সমুদ্রে,
এ তো সেই স্বপ্ন নয়

এ যন্ত্রণায় একদিন মাথার উপর ঢলে পড়তেই পারে
চাঁদ, প্রিয় মুলিবাঁশ ও বনফুল।

প্রবুদ্ধসুন্দর কর
পুনর্লিখিত

সারাজীবন একটি অলৌকিক শিশুর রহস্যচ্ছায়া, ক্রীড়াচ্ছল ও তার বিশ্বলয়, আমাদের হতবাক করে রাখে। যে অন্তঃপ্রকৃতি আমাদের ভেতর উদ্যান হয়ে আছে, সেই উদ্যানের চারদিকে আমরা উঁচু প্রাচীর তুলে শিশুদের প্রতিহত করে রাখি। আমাদের বন্ধুত্ব, যৌনতা, মৃত্যুর ভেতর যে একটি শিশুই লতিয়ে উঠে, তা টের পাওয়ার আগেই, বরফ, তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি ও উত্তরের ঝড়ো বাতাস নিয়ে নেমে আসা চিরশীত সবকিছু তছনছ করে দেয়।

এভাবে অনেকদিন কেটে যাওয়ার পর, একদিন অজস্র শিশু আর বসন্তপ্রকৃতি, অনুতপ্ত উদ্যানের ঘাসে পা রাখে। শুধু সেই রহস্যময় শিশুটি, আমাদের ভেতর সংশয় ও কুয়াশা রচনা করে কোথায় যেন হারিয়ে যায়।
সমূহ সৃষ্টির দ্বারা রক্তাক্ত হয়ে, হাতে ও পায়ে পেরেকের দাগ নিয়ে, একদিন সে ফিরেও আসে। অলৌকিক অন্ধকারে, সেই শিশু তার স্বরাট উদ্যানে, আমাদের নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব রাখে।
আবহমানকাল, আমাদের নিষ্ঠুরতা আর স্বার্থপর আচরণের আড়ালে লুকিয়ে থাকা একটি দৈত্য, শিশুদের দ্বারা উন্মোচিত হতে থাকে, যার অপচ্ছায়া, কূটচ্ছল ও ধ্বংসলয়, স্যর অস্কার ওয়াইল্ডকে হতবাক করে রাখে।

বিমল চক্রবর্তী

নৌকা বৃষ্টি

বিষণ্ণ প্রেমের মতো সারাদিন ভাবি
গোমতীঘাটে কখন গোলাঘাটির
পোড়া বিপ্লব ভেসে যাবে...

কখন সরে যাবে পিত্রাছড়ার নিষিদ্ধ জল
কিল্লার ব্যথিত সময়
যে সময় আমার বসত ঘরের
প্রতিটি বাঁশ বেতের কারুশিল্পে
ধুলো হয়ে জমে আছে

আমি ভাবি গোমতীতটে
একদিন না একদিন
কথা বলবেই পিলাকের বুদ্ধমূর্তি।

এখন মানুষ
'অরণ্য ও বায়ুপথকে' —
সুস্থ রাখার
যন্ত্রণা দেহকোষে, জমে থাকুক।
বয়ে আনুক নৌকা বৃষ্টি।

ঝিঁ ঝিঁ আমপোকার ডাক
যদিও তোমার মন ইদানীং
এ বিষয়ে সচেতন থাকে না —
তবু ও এক গাঢ় কান্না
রয়ে যাবে
আহত মৎস্যকন্যার স্বপ্ন
ভেসে আসবে প্রিয় জঙ্গলে।

অশোক দেব

চোর

প্রায়-ই পিঠে ঝোলা নিয়ে ভাঙা বোতল, টিনের বাক্‌সো, তালা,
ফ্যালনা প্লাস্টিকের পুতুল, চেয়ারের গদি ইত্যাদি কুড়োতে
আসে হাড়-জিরজিরে কিছু ছেলে, তাদের অধিকাংশের চোখ
আয়ত ও মায়াবী, অধিকাংশের পোষ্টাপিস খোলা, তারা
কখনো অনুমতি নিয়ে বাড়িতে ঢোকে না।
অনুমতি নেয়না বলে আমার হিসেবী বাবা, প্রগতিশীল
মেজোকাকা, স্নেহময়ী মা এবং বিপ্লবী ছোটভাই সকলেই
তাদের চোর ভাবে, এবং তাড়িয়ে দেয়।
ওরা চলে যায়। ছড়ানো ছিটানো ফালতু জিনিসগুলো
নিজের নিজের জায়গায় থেকে অভিশাপ দেয়।

আমাদের সবকিছু তাই তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়।

আমার ছোট্ট শিশুকন্যা তার ছোট্ট পুতুলের চুল আঁচড়ে দেয়,
আদর করে চুমু খায়।

আমাদের রাতের আদর শেষে, আমরা নিরীহ দম্পতি, সে'দিন
দেখলাম আমাদের একমাত্র পুতুল-কন্যা'র হাত পা
আলাদা আলাদা হয়ে গেলো।
দরোজা খুলে ঘরে ঢুকলো একটি ছেলে, তার আয়ত চোখ,
পোষ্টাপিস খোলা
পিঠের ঝোলায় সে তুলে নিলো ফ্যালনা মেয়েটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
অনুমতি নিলোনা।

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

আস্তিকতা বিষয়ক কয়েক পংক্তি

মাঝে মাঝে মনে হয় ঈশ্বর নামক কেউ একজন থাকলে
বড়ো ভালো হত।
যখন, মাঝে মাঝেই আমার মন-খারাপ হয়
তখন মন-খারাপের যাবতীয় দায়ভাগ আমি
ঈশ্বরের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে
দিব্যি কাপাস তুলোর মতো ঘুরে বেড়াতাম।

কিংবা ধরা যাক, মানে ভাবা যেতে পারে
যে-সব দুর্ঘটনার জন্য আমি আদৌ দায়ী নই
কিংবা প্রকারান্তরে আমি-ই দায়ী
যেমন মহারাষ্ট্রের ভূমিকম্প কিংবা অন্তঃরাষ্ট্রীয় ডাঙ্কেল প্রস্তাব
কিংবা অনন্তবাবুর সেরিব্রাল অ্যাটাক অথবা ইত্যাদি
সব এবং সব কিছুর জন্যই ঈশ্বরকে দায়বদ্ধ রেখে
আমি আমার ফুরফুরে পালক ঝেড়ে
বুদ্ধমূর্তির সৌম্য হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে রাখতে পারতাম।

আমার মাঝে মাঝে খুবই মরে যেতে ইচ্ছে করে
আবার মাঝে মাঝে খুবই বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয়
রাত্রিবেলা এক আকাশ তারার দিকে তাকিয়ে
আমার ঈশ্বরের সঙ্গে সদালাপ করতে
খুব, খুবই ইচ্ছে হয়।

আমাদের পাড়ায় একজন ঈশ্বরবাবু ছিলেন
তিনি বৃদ্ধ বয়েসে একেবারে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন
তার অন্ধকার চোখের দিকে তাকালে
আমার কেবলি মনে হতো যে
এক অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে
একটু আলোর স্বপ্ন জাগিয়ে রাখার নামই
আস্তিকতা।

মা ও বাবার গল্প

আমার মায়ের কথায় বাবা কোনদিন কান দেয় নি
আর বাবার কথা মা কোনোদিন বুঝতে চায়নি
অথচ, মা ও বাবার মতো নিবিড় প্রেমিক-প্রেমিকা
আমাদের জানা-শোনা ভূ-ভারতের মধ্যে
খুঁজে-পাওয়া অসম্ভব ছিল।

আমার বাবা আমাকে বলতো, সাহসী হ
আর মা বলতো, মানুষ হ
আমি দু'দিকেই সমান তালে মাথা নেড়েছিলাম ব'লে
সাহসী কিংবা মানুষ
কোনোটাই হতে পারিনি।

আমার বাবা বলতো, অন্যায়কে ঘাড় ধরে শায়েস্তা করবি
আর মা বলতো, সহ্য করে যা
এমন উল্টোপাল্টা উপদেশের মধ্যেও
আমি দু'দিকেই সমান বিনীত ও বাধ্য ছিলুম
এবং তার জন্যই হয়তো বা
আমি এখন অন্যায় দেখলে কুঁকড়ে যেতে শিখেছি
আর নিরীহকে তর্জনী উঁচিয়ে বলছি, সাবধান!
আমার বাবা ও মা আরো অনেক কথাই বলেছিল
আমার বাবা ও মা আরো অনেক কথাই বলেনি
আমার বাবা যুক্তির কথা বলেছিল
আমার মা বিশ্বাসের কথা বলেছিল
বাবা ও মা দু'জনেই জীবনের কথা বলেছিল
বাবা ও মা দু'জনেই মৃত্যুর কথা বলেনি
আর এখন আমি বলা ও না-বলার মধ্যে
এক অদ্ভুত সহাবস্থান মেনে নিয়েছি।

উনিশে মে—১৯৬১ —শিলচর

দশটি ভাই চম্পা আর একটি পারুল বোন
কলজে ছিঁড়ে লিখেছিলো, "এই যে ঈশান কোণ—
কোন ভাষাতে হাসে কাঁদে কান পেতে তা শোন।"

শুনলি না? তো এবার এসে কুচক্রীদের ছা
তিরিশ লাখের কণ্ঠভেদী আওয়াজ শুনে যা—
"বাঙলা আমার মাতৃভাষা, ঈশান বাঙলা মা!"

অতনু ভট্টাচার্য

কুকুর

আমি একটা কুকুর পুষতে চাই
আজ অনেক দিন থেকেই আমার এই দুর্বার ইচ্ছে

অথচ মনের মতো একটাও কুকুর আমি খুঁজে পাইনি
ঠিক যেরকম দরকার, সেই রকম একটা কুকুর
অথবা তার মালিকের সন্ধান

রং নিয়ে আমার ভাবনা নেই খুব
কালো অথবা চোখে না পড়ার মতো রং হলেই ভালো
তবে বিশ্বাসী হওয়াটা একান্তই প্রয়োজন

দেখলেই শত্রুকে চিনতে হবে তাকে
অরুণাচল থেকে পোরবন্দর
কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী তাকে দৌড়তে হবে

তার গরিমা স্পর্শ করবে নতুন দিল্লীর
সংসদভবন

আমার কবিতার সুহৃদ পাঠক!
আমি যে ঘরে থাকি, আপনিও সেই ঘরেই

আপনিও জানেন
আমার ঘরের ভিতরে বাইরে চোরের অবাধ রাজত্ব,
গলিতে গলিতে টেররিষ্ট।
আমার এলসেসিয়ান অথবা গ্রে-হাউণ্ড প্রয়োজন নেই
আমার কোনো স্পেনিয়ার্ড কুকুর অথবা বুলডগ চাইনা
আমার চাই ঘেউ ঘেউ করা
একটা নির্ভীক এবং সুস্থ সবল দেশী কুকুর

আমি সেরকম একটা দুর্দান্ত কুকুর পুষতে চাই।

বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য

এখনো দিন অনেক বাকি

(রাণা চট্টোপাধ্যায়কে)

তোমার খুব যাবার তাড়া হল
এখনো দিন অনেক বাকি
তারপরে তো রইল সারা রাতও
রাত পোহালে অন্য সকাল হবে।

অন্যসকাল অন্যজনের জানি
তোমায় আমি করব না তো মানা
এখনো দিন হয়নি গোনার মতো
কোথাও রাত করে কি কানাকানি!

দিন তো গেল গেল যে মিছে কাজে
রাতেরই যত ক্লান্তিবিহীন মায়া
জেগে জেগে দীর্ঘ করো তাকে
গভীর রাতে পড়ে না কোন ছায়া।

তোমার এত যাবার তাড়া কেন
খুঁজছ কেবল নাই-পাখি যে তাকে
এই আঁখি তার পাবে না সন্ধান
দিনের আলো অনেক বাকি জেনো।

হরি,দিন তো গেল, গেল না দিন তবু
দিনের আলো যেই ফুরোল কালোর যত খেলা
এবার একে একে দেখা, কত না প্রিয় মুখ
দিনের আলোয় যা ছিল ঢাকা, অথচ উন্মুখ।

দিন যদি যায় ঘোমটা খোল এবার
দু হাতে বাঁধো অধম অন্ধকারে
এবার দেখো যে পাখি আছে তাকে
সকাল হলে, অন্য সকাল হলে, সময় হবে যাবার
তখন যেয়ো চলি।

বিমল চৌধুরী
ডিসেম্বর, ১৯৭১

এখন বিশেষ বিশেষ খবরগুলি
আবার পড়ে শোনাচ্ছি ঃ
সাদাবাড়ি থেকে বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে
কনট্রাসেপ্‌টিভের মতো শান্তির ললিতবাণী,
মুঠোমুঠো আশরফি কুড়োতে কুড়োতে
মানুষ ভাবছে
আমরা চাঁদে যাচ্ছি।

একটা ট্রেঞ্চের পাশে এক র‍্যাপার জড়ানো বৃদ্ধ
জঙ্গি বিমানের ওড়াউড়ি দেখতে দেখতে
হাঁ করে রোদ পোহাচ্ছে,
অনিদ্রাগ্রস্থ হৃদয় নিয়ে গুটিকয় তরুণ চেঁচাচ্ছে
এক্ষুনি বিপ্লব চাই, আমরা সবাই যুদ্ধে যাব।

নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ এক দম্পতি
ঘুমন্ত পাখির ডানা নাড়ার শব্দ শুনতে শুনতে
ভাবছে, আজ নিশ্চয়ই একটা ভাল স্বপ্ন দেখব
আর সেটা অবশ্যই ফলবে।

স্মৃতি পালনাথ

মাতৃভাষা ও সত্তা

এখনও আসে রাজার অশ্বারোহী
ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যায়
কুশিয়ারা কলংমার কূলে
মাতৃভাষার বন্দনায় হেঁটে যায় পৃথিবী
শহিদের স্মৃতিকথায় উদ্বেল গ্রাম, শহর,
পথ, গাছ-গাছালি।
আমি উনিশে মে,
একষট্টির বিপ্লবী রক্ত
আমি সেদিনের অগ্নিগর্ভ শহর শিলচর।

আমার চর জেগে ওঠেছে
বাংলায়
আমার নৌকাগুলি... ...
ভাটিয়ালি রক্তে রাঙানো, শহিদের রক্তে
আমার এক একটি বীজ, এক একটি প্রদীপ
বনস্থলী, আমার নাম না জানা ঝরণাগুলি
এক একটি পাখি চিনিয়েছে— ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯শে মে, ২১শে জুলাই
আমার পাহাড়ে মূল্যবান কিসব গাছ, পাখি ডাকছে
শাল, দেবদারু, দারুচিনি, সেগুনেরা গুন্‌গুন্‌ করে উঠছে।

চুপি চুপি কেউ ফসল কাটছে
আমার ফসল
আমি ছেঁড়াফুল আর অপমানগুলো
একসঙ্গে জড়ো করে রাখছি
আমি নিজের জ্যামিতি জানি না
ভাষা শহিদের রক্তস্রোত যার বুকে।
রাজার সৈন্যরা, এ ওর দিকে তাকায়
টগবগ করে ফুটে আমার রক্ত
শহিদের রক্ত
আমার বর্ণমালা পতাকা হাতে হেঁটে যায় দীর্ঘসড়ক... ...।

আসাদ চৌধুরী
কালো ঝংকার

শেষ-সংযোগ ছিন্ন হয়েছে; ভাবি
হয়নি ছিন্ন, অথচ আমার দাবি
আমি আছি সব সংলাপে, আর
উচ্চারণের কালো ঝংকার
তোমার আমার জড়তা খোলার চাবি।

সমবেত স্বরে আমার কণ্ঠস্বর
মেশাতে পারলে গ'লে যাবে পাথর
অথচ আমার কণ্ঠ একাকী
বাঁধতে গিয়েছে কোরাসের পাখি
হায়রে চালাকি সর্বদা তৎপর।

গাছের সবুজ স'রে যায় চোখ থেকে
আনাড়ি উড়াল গতিকে রেখেছে ঢেকে।
পুরোনো কবির সাবেকি উপমা
খাটে না ব'লেই অভিধানে জমা
লিখতে গেলেই স'রে যায় কাঁধ থেকে।

কিছু কথা থাকে; সময়ের রূপকথা
সহসুরে তারে জড়ায় স্বর্ণলতা।
উপমা বদলে লেখাটা কঠিন;
লিখতেই হবে — সময়ের ঋণ
কাঁদে বারবার; অসহ্য নীরবতা।

বেলাল চৌধুরী
স্বদেশ

আমি আছি ব্যাপ্ত হয়ে তোমার রৌদ্রছায়ায়
এই তো তোমার ঘামে গন্ধে তোমার পাশাপাশি
তোমার ছায়ার মতো তোমার শরীর জুড়ে
তোমার নদীর কুলকুল স্রোতে ;

তোমার যেমন ইচ্ছে, আছি আমি —
ঝিরিঝিরি পাতার ভেতর ভেতর হাওয়ার নাচে
রাত্রিদিন তোমার ধানের ক্ষেতে
উদাসী বাউল;   ভাটিয়ালি গান ভেসে
যায় কোন্ নিরুদ্দেশে;   আছি আমি
বেলা শেষের রোদের মতো
গড়িয়ে তোমার পায়ে পায়ে
আছি আমি তোমার ধানের দুধে
তোমার আঁচল ছোঁয়া নীলাম্বরি মেঘে
আছি আমি এই তো তোমার
নাকছাবিটির মুক্তো যেমন
জ্বলছে কেবল জ্বলছে কেবল।

সৈয়দ শামসুল হক
কবিতা ৫৭৭ (অংশ)

.......এবং মাত্র গতকাল জনতার আকাশ থেকে খসে পড়া
কয়েকটি তারা আমি দেখলাম বিপ্লবের শহরে। কিংবা আশা নামক
ভাস্করের জ্যোর্তিময় হাতুড়ি ও ছেনিতে আবেগের প্রস্তরখণ্ডে কয়েকটি
কাজ।
আমি জিগ্যেস করলাম, তোমরা কার আদলে নির্মিত?
তারা বললো, তোমার, তোমার এবং তোমার।
জিগ্যেস করলাম, নাম?
বলল, আমি।
বাসস্থান?
চৈতন্যে।
স্থায়ী ঠিকানা?
ইতিহাস।
উচ্চতা?
স্বাধীনতার সমান।
বর্ণ?
জিগ্যেস করো মাটিকে।

বিশেষ চিহ্ন?
ভ্রূ যুগলের মাঝখানে তৃতীয় একটি চোখ।
আর গন্তব্য? তোমার গন্তব্য আমাকে বলো।
হৃদয়ে।
আমি তাদের রেখে এলাম এখানে এবং ওখানে।
এখন বিস্মিত হয়ে দেখি, তারা এখানেও নেই কিংবা ওখানেও।
তারা সর্বত্র।

আহসান হাবীব
উৎসবের আগের দিন

এসো আমরা উৎসবের কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে দি।

পৃথিবীর সমান অতিকায় সেই পাথর
এখন তার দীর্ণ বুক মেলে দিয়েছে
প্রতিটি ফাটল এখন রক্তাক্ত
এখন সমবেত হওয়ার সময়
আবহমান শোভাযাত্রায় এখন পা মেলাবার সময়।

সার্কাসের সুসজ্জিত অশ্ব এখন ক্লান্ত,
ক্লাউন তার হাতের খড়্গ
নিজের বুকে বিঁধিয়ে দিয়েছে, দেখো
বর্ণাঢ্য পোশাকের নীচে তার সমস্ত অবয়ব
গলে গলে যাচ্ছে
তার সারা মুখের প্রতারক বিভা এখন জ্বলে জ্বলে যায়
এখন আমাদের সময়
এসো আমরা উৎসবের কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে দি।

তার হৃৎপিণ্ডে হাজার বছরের ধুলো
তার রোগশয্যার মুখোমুখি আমরা,

এখন তার কবল থেকে
চাবি ছিনিয়ে নেবার সময়।

জমিন এবং জাহাজের মাঝখানে
তোমাদের ঘিরে
দেখো কি তুমুল আলোড়ন, এসো
অসহায় ক্লান্ত নাবিকেরা এসো,
বেবিলনের শূন্যোদ্যান ছুঁড়ে ফেলে মুক্তকাঁধ
এসো আমরা বিনষ্টির মুখোমুখি দাঁড়াই
এসো আমরা সমবেত কণ্ঠে উচ্চারণ করি — না!
হনন এবং আত্মহনন-পদ্ধতির পরীক্ষা থেকে
এসো আমরা গবেষণাগার মুক্ত করি।

মাতার আলিঙ্গন আর পিতার বরাভয় থেকে বিচ্ছিন্ন আমরা
ঘৃণা আতঙ্ক এবং বিদ্বেষের বিষে
নিঃশেষিত হওয়ার আগে
এসো দীর্ণবুক মৃত্তিকার রক্তরেখায় পা চালিয়ে
আমরা আমাদের পরিত্যক্ত বাসভূমির দিকে ফিরে যাই।

ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা

মদনমোহন তর্কালঙ্কার
প্রভাত

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।।
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর।
পাতায়-পাতায় পড়ে নিশির শিশির।।
ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল।।

গগনে উঠিল রবি সোনার বরণ।
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন।।
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।।
উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।।

দীনবন্ধু মিত্র
প্রভাত

রাত পোহাল ফর্সাহল
ফুটল কত ফুল।
কাঁপিয়ে পাখা নীল পতাকা
জুটল অলিকুল।।
ঘরের চালে পালে পালে
ডাকছে কত কাক।
পূজা বাটিতে জোর কাঠিতে
বাজছে যেন ঢাক।।
কত কুমারী সারি সারি
দুলছে কানে দুল।
কানন হতে কচুর পাতে
আনছে তুলে ফুল।।
তাড়ি বগলে ছেলের দলে

পাঠশালাতে যায়।

পথে যেতে কোঁচড় হতে

খাবার কিনে খায়।।

এই বেলা সকাল বেলা

পাঠে দিলে মন।

বৈকালেতে গৌরবেতে

রবে যাদুধন।।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বালিকাদের গান

ধানের ক্ষেতে, ঢেউ উঠেছে, বাঁশতলাতে জল।
আয় আয় সই, জল আনিগে, জল আনিগে চল।।
ঘাটটি জুড়ে, গাছটি বেড়ে, ফুটল ফুলের দল।
আয় আয় সই, জল আনিগে, জল আনিগে চল।।
বিনোদ বেশে মুচকে হেসে, খুলব হাসির কল।
কলসি ধরে, গরব করে বাজিয়ে যাব মল।।
আয় আয় সই, জল আনিগে জল আনিগে চল।।
গহনা গায়ে, আলতা পায়ে, কল্কাদার আঁচল।
ঢিমে চালে, তালে তালে, বাজিয়ে যাব মল।
আয় আয় সই, জল আনিগে, জল আনিগে চল।।
যত ছেলে, খেলা ফেলে, ফিরছে দলে দল।
কত বুড়ি, জুজুবুড়ি, ধরবে কত ছল।
আমরা মুচকে হেসে, বিনোদ বেশে বাজিয়ে যাব মল।
আয় আয় সই, জল আনিগে, জল আনিগে চল।।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

পারিব না

'পারিব না' একথাটি বলিও না আর,
কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার।
পাঁচজনে পারে যাহা,

তুমিও পারিবে তাহা,
পার কিনা পার কর পরখ তাহার,
একবার না পারিলে দেখ শতবার।

'পারিব না' বলে মুখ করিও না ভার
ও কথাটি মুখে যেন শুনি না তোমার।
অলস অবোধ যারা,
কিছুই পারে না তারা,
তোমায় তো দেখিনাক তাদের আকার,
তবে কেন 'পারিব না' বল বারবার।

জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতার,
হাঁটিতে শিখে না কেহ, না খেয়ে আছাড়,
সাঁতার শিখিতে হলে,
আগে তবে নাম জলে,
আছাড়ে করিয়া হেলা হাঁট আর বার,
পারিব বলিয়া সুখে হও আগুসার।

শিবনাথ শাস্ত্রী
দাদামশায়ের সাধের নাতি

দাদামশায়ের সাধের নাতি ফড়িংবাবু নাম।
চুয়াল্লিশ নম্বর রসা রোড, ভবানীপুর ধাম।
তালপত্রের সিপাই ভায়া লিকলিকে শরীর
চলেন যদি ওড়েন যেন পা দুটি অস্থির।
কি যে করেন, কোথায় যে যান হয় না সে নির্ণয়।
বুদ্ধিশুদ্ধি গজাবে যে হয়নি সে সময়;
লেখাপড়ায় মন বসে না, বইকে লাগে ডর।
পড়াশোনা শিকেয় তোলা কেবল খেলায় ভর,
বাড়ির লোকে পাগলপারা এক ফড়িং -এর চোটে,
কি হবে যে তাদের গতি আর এক যদি জোটে?

রাজকৃষ্ণ রায়
অতুলের গাড়ি

গড় গড় গড় কাঠের গাড়ি
টানছে অতুল তাড়াতাড়ি
খানিক দূরে দৌড়ে গিয়ে
ঠেকল চাকা ইটে;
আর চলে না গাড়িখান,
তবু অতুল মারে টান
পুরো জোরে ভরটা দিয়ে
ডান-পা, কোমর, পিঠে।
খুকি বসে গাড়ির খোলে,
পুতুল খোকা ঘুমোয় কোলে;
থামল গাড়ি দেখে খুকি
কাঁদো মুখে কয়; —
'ও বও-দা! গায়ি তানো
চুপতি কোয়ে দাঁয়িয়ে কেনো
দেগে উতে কাঁদবে থেলে
তাইতো আমাল ভয়।'

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
কাজের লোক

"মৌমাছি, মৌমাছি,
কোথা যাও নাচি' নাচি',
দাঁড়াও না একবার ভাই!"
"ওই ফুল ফুটে বনে,
যাই মধু আহরণে,
দাঁড়াবার সময় ত নাই।"

"ছোট পাখী, ছোট পাখী,
কিচি-মিচি ডাকি' ডাকি'

কোথা যাও, বলে যাও শুনি?"
"এখন না ক'ব কথা,
আনিয়াছি তৃণলতা,
আপনার বাসা আগে বুনি।"

"পিপীলিকা, পিপীলিকা,
দল-বল ছাড়ি একা,
কোথা যাও শুনি যাও বলি।"
"শীতের সঞ্চয় চাই,
খাদ্য খুঁজিতেছি তাই,
ছয় পায় পিল্ পিল্ চলি।"

আগমনী

বর্ষা গেল আকাশ ধুয়ে, ফর্সা হলো দিক্।
কেঁদে কেটে, হেসে ধরা উঠলো যেন ঠিক্।।

সকালবেলা চারিদিকে শিশির-ভিজা ঘাস।
শিউলি-তলা ছেয়ে পড়ে শিউলিফুলের রাশ।।

পুকুর-ডোবার জল থৈ-থৈ, কানায় কানায় উঠে।
শালুক সুঁদি রক্তকমল ভাস্ছে তাতে ফুটে।।

ক্ষেতে আকের গাছ বেড়েছে, ঝুল্ছে শশা গাছে।
খাল-বিল আর নদী ভরে গেছে নূতন মাছে।।

নবীন নধর সবুজ ধানে ভরে গেছে মাঠ।
বসুন্ধরা বসিয়ে যেন দেছে শোভার হাট

বর্ষাকালের মেঘে ঢাকা স্যাঁৎসেঁতে সেই প্রাণ।
ফর্সা ফিকে রোদ দেখে আজ উঠ্ছে গেয়ে গান।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হাট

কুমোর-পাড়ার গোরুর গাড়ি—
বোঝাই করা কল্‌সি হাঁড়ি।
গাড়ি চালায় বংশীবদন,
সঙ্গে যে যায় ভাগ্নে মদন।
হাট বসেছে শুক্রবারে
বক্‌শিগঞ্জে পদ্মাপারে।
জিনিস-পত্র জুটিয়ে এনে
গ্রামের মানুষ বেচে কেনে।

উচ্ছে বেগুন পটল মুলো,
বেতের বোনা ধামা কুলো,
সর্ষে ছোলা ময়দা আটা,
শীতের র‍্যাপার নক্‌শা-কাটা।

ঝাঁঝরি কড়া বেড়ি হাতা,
শহর থেকে সস্তা ছাতা।
কল্‌সি-ভরা এখো গুড়ে
মাছি যত বেড়ায় উড়ে।

খড়ের আঁটি নৌকো বেয়ে
আনল ঘাটে চাষীর মেয়ে।
অন্ধ কানাই পথের 'পরে
গান শুনিয়ে ভিক্ষে করে।

পাড়ার ছেলে স্নানের ঘাটে
জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটে।

সমব্যথী

যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম কুকুর ছানা —
তবে পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিতে যাই ভাতে
তুমি করতে আমায় মানা ?
সত্যি করে বল্,
আমায় করিস নে মা, ছল —
বলতে আমায় "দূর দূর দূর,
কোথা থেকে এল এই কুকুর ?"
যা মা, তবে যা মা,
আমায় কোলের থেকে নামা।
আমি খাব না তোর হাতে।
আমি খাব না তোর পাতে।
যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম তোমার টিয়ে —
তবে পাছে যাই মা, উড়ে
আমায় রাখতে শিকল দিয়ে ?
সত্যি করে বল্,
আমায় করিস নে মা, ছল —
বলতে আমায় "হতভাগা পাখি
শিকল কেটে দিতে চায় রে ফাঁকি
তবে নামিয়ে দে মা,
আমায় ভালোবাসিস নে মা।
আমি রব না তোর কোলে,
আমি বনেই যাব চ'লে।

মাকাল

গৌরবর্ণ নধর দেহ, নাম শ্রীযুক্ত রাখাল,
জন্ম তাহার হয়েছিল সেই যে-বছর আকাল।
গুরুমশায় বলেন তারে,
'বুদ্ধি যে নেই একেবারে;
দ্বিতীয়ভাগ করতে সারা ছ'মাস ধরে নাকাল।
রেগেমেগে বলেন, বাঁদর, নাম দিনু তোর মাকাল।

নামটা শুনে ভাবলে প্রথম বাঁকিয়ে যুগল ভুরু;
তার পরে সে বাড়ি এসে নৃত্য করলে শুরু।
হঠাৎ ছেলের মাতন দেখি
সবাই তাকে শুধায়, এ কী,
সকলকে সে জানিয়ে দিল, নাম দিয়েছেন গুরু—
নতুন নামের উৎসাহে তার বক্ষ দুরুদুরু।

কোলের 'পরে বসিয়ে দাদা বললে কানে কানে,
গুরুমশায় গাল দিয়েছেন, বুঝিস নে তার মানে!
রাখাল বলে, কখ্‌খোনো না,
মা যে আমায় বলেন সোনা
সেটা তো গাল নয় সে কথা পাড়ার সবাই জানে;
আচ্ছা, তোমায় দেখিয়ে দেব, চলো তো ওইখানে।
টেনে নিয়ে গেল তাকে পুকুরপাড়ের কাছে,
বেড়ার 'পরে লতায় যেথা মাকাল ফ'লে আছে।
বললে, 'দাদা সত্যি বোলো,
সোনার চেয়ে মন্দ হল?
তুমি শেষে বলতে কি চাও, গাল ফলেছে গাছে?
মাকাল আমি ব'লে রাখাল দু হাত তুলে নাচে।

দোয়াত কলম নিয়ে ছোটে, খেলতে নাহি চায়,
লেখাপড়ায় মন দেখে মা অবাক হয়ে যায়।
খাবার বেলায় অবশেষে
দেখে ছেলের কাণ্ড এসে—
মেঝের 'পরে ঝুঁকে প'ড়ে খাতার পাতাটায়
লাইন টেনে লিখছে শুধু— মাকালচন্দ্র রায়।

রাজার বাড়ি

আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সে তো;
সে বাড়ি কি থাকত যদি লোকে জানতে পেত।
রুপো দিয়ে দেয়াল গাঁথা, সোনা দিয়ে ছাত,
থাকে থাকে সিঁড়ি ওঠে সাদা হাতির দাঁত।
সাত-মহলা কোঠায় সেথা থাকেন সুয়োরানী,
সাত রাজার ধন মানিক-গাঁথা গলার মালাখানি।
আমার রাজার বাড়ি কোথায় শোন্ মা, কানে কানে—
ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে যেইখানে।

রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা সাত সাগরের পারে,
আমি ছাড়া আর কেহ তো পায় না খুঁজে তারে।
দু হাতে তার কাঁকন দুটি, দুই কানে দুই দুল,
খাটের থেকে মাটির' পরে লুটিয়ে পড়ে চুল।
ঘুম ভেঙে তার যাবে যখন সোনার কাঠি ছুঁয়ে
হাসিতে তার মানিকগুলি পড়বে ঝ'রে ভুঁয়ে।
রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা শোন্ মা, কানে কানে—
ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে যেইখানে।

তোমরা যখন ঘাটে চল স্নানের বেলা হলে
আমি তখন চুপিচুপি যাই সে ছাদে চলে।
পাঁচিল বেয়ে ছায়াখানি পড়ে মা, যেই কোণে
সেইখানেতে পা ছড়িয়ে বসি আপন মনে।
সঙ্গে শুধু নিয়ে আসি মিনি বেড়ালটাকে,
সেও জানে নাপিত ভায়া কোন্‌খানেতে থাকে।
জানিস নাপিত পাড়া কোথায়? শোন্ মা, কানে কানে—
ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে যেইখানে।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
মজার মুল্লুক

এক যে আছে মজার দেশ, সব রকমে ভালো,
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ, দিনে চাঁদের আলো।
আকাশ সেথা সবুজ বরণ গাছের পাতা নীল;
ডাঙ্গায় চরে রুই কাত্‌লা জলের মাঝে চিল;

সেই দেশেতে বেড়াল পালায় নেংটি ইঁদুর দেখে
ছেলেরা খায় 'ক্যাস্টর-অয়েল'-রসগোল্লা রেখে!
মণ্ডা-মিঠাই তিতো সেথা, ওষুধ লাগে ভালো;
অন্ধকারটা সাদা দেখায়, সাদা জিনিস কালো!
ছেলেরা সব খেলা ফেলে বই নে বসে পড়ে;
মুখে লাগাম দিয়ে ঘোড়া লোকের পিঠে চড়ে!
ঘুড়ির হাতে বাঁশের লাটাই, উড়তে থাকে ছেলে;
বঁড়শী দিয়ে মানুষ গাঁথে, মাছেরা ছিপ্ ফেলে!
জিলিপি সে তেড়ে এসে, কামড় দিতে চায়;
কচুরি আর রসগোল্লা ছেলে ধরে খায়!
পায়ে ছাতি দিয়ে লোকে হাতে হেঁটে চলে;
ডাঙ্গায় ভাসে নৌকা-জাহাজ গাড়ী ছোটে জলে!
মজার দেশের মজার কথা বলবো কত আর;
চোখ খুল্‌লে যায় না দেখা মুদ্‌লে পরিষ্কার!

অতুলপ্রসাদ সেন

হিন্দু মুসলমান

দেখ্ মা এবার দুয়ার খুলে।
গলে গলে এল্ মা, তোর
হিন্দু মুসলমান দু'ছেলে।
এসেছি মা, শপথ করে,
ঘরের বিবাদ মিটবে ঘরে,
যাবনা আর পরের কাছে
ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ হলে।
অনুগ্রহে নাহি মুকতি,
মিলন বিনা নাই শকতি,
এ কথা বুঝেছি দোঁহে —
থাকবো না আর স্বার্থে ভুলে।।
থাকবে না আর রেষারেষি —

কাহার অল্প কাহার বেশি,
দু'ভাইয়ের যা আছে জমা
সঁপিব তোর চরণতলে।
দু'জনেই বুঝেছি এবার —
তোর মতো কেউ নেই আপনার;
তোরই কোলে জন্ম মোদের,
মুদব আঁখি তোরই কোলে।

প্রিয়ম্বদা দেবী

আকাঙ্খা

জীবন আমার কর আলোকের মত
সুন্দর নির্মল,
যেথায় যখন রব সে স্থান নিয়ত
করিব উজ্জ্বল।
ওগো দয়াময় তুমি থাক সাথে সাথে
আলো করি আমার জীবন,
সুদিনে দুর্দিনে কিবা অন্ধকার রাতে
চিরজ্যোতি, থাক অনুক্ষণ।

জীবন আমার কর ফুলের মতন
শোভার আধার,
পবিত্র সুগন্ধে যেন সবাকার মন
তুষি অনিবার।

ওগো দয়াময়, তুমি থাক সাথে সাথে
শোভা করি আমার জীবন,
শরৎ, হেমন্ত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, বর্ষাতে
হে সুন্দর থাক অনুক্ষণ।

অন্ধের যষ্টির মত কর গো আমারে

দুঃখীর নির্ভর,
প্রাণপণে আমি যেন দুঃখী অনাথারে
সেবি নিরন্তর।

ওগো দয়াময়, তুমি থাক সাথে সাথে
প্রাণে বল কর হে বিধান,
আমার এ জীবনের সন্ধ্যায় প্রভাতে
কাছে থাক সর্বশক্তিমান।

কুসুমকুমারী দাশ

আদর্শ ছেলে

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে?
কথায় না বড়ো হ'য়ে কাজে বড় হবে;
মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন,
'মানুষ' হইতে হবে, —এই তার পণ।

বিপদ আসিলে কাছে, হও আগুয়ান,
নাই কি শরীরে তব রক্ত, মাংস, প্রাণ?
হাত, পা সবারি আছে, মিছে কেন ভয়,
চেতনা রয়েছে যার, সে কি পড়ে রয়?

সে ছেলে কে চায় বল? — কথায় কথায়,
আসে যার চোখে জল, মাথা ঘুরে যায়।
সাদা প্রাণে হাসি মুখে কর এই পণ —
'মানুষ' হইতে হবে, মানুষ যখন।

কৃষকের শিশু কিংবা রাজার কুমার,
সবারি রয়েছে কাজ, এ বিশ্বমাঝার,
হাতে প্রাণে, খাট সবে, শক্তি কর দান,
তোমরা 'মানুষ' হলে, দেশের কল্যাণ।

সুখলতা রাও
তালপাতার সেপাই

তালপাতার এক সেপাই ছিল
বলছি শোন গল্প —
হাত-পা ছিল পাতার কাঠি
ওজন ছিল অল্প।
ঠেলা দিলেই ঠল্টে পড়ে
এমনি পালোয়ান;
চলতে গিয়ে কাঁপতে থাকে
এমনি সে জোয়ান।
বৈশাখী ঝড় বইল যেমন
উড়িয়ে নিল ফুরফুর
তালপাতার সে হাল্কা দেহ
কেউ জানে না কত দূর।

সুকুমার রায়
সৎপাত্র

শুনতে পেলুম পোস্তা গিয়ে —
তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে?
গঙ্গারামকে পাত্র পেলে?
জানতে চাও সে কেমন ছেলে?
মন্দ নয় সে পাত্র ভালো—
রং যদিও বেজায় কালো;
তার উপরে মুখের গঠন
অনেকটা ঠিক প্যাঁচার মতোন।
বিদ্যে বুদ্ধি? বলছি মশাই
ধন্যি ছেলের অধ্যবসায়!
উনিশটিবার ম্যাট্রিকে সে
ঘায়েল হয়ে থামল শেষে।
বিষয় আশয়? গরীব বেজায়—

কষ্টে সৃষ্টে দিন চলে যায়।
মানুষ তো নয় ভাইগুলো তার
একটা পাগল একটা গোঁয়ার;
আর একটি সে তৈরি ছেলে,
জাল করে নোট গেছেন জেলে।
কনিষ্ঠটি তবলা বাজায়
যাত্রা দলে পাঁচ টাকা পায়।
গঙ্গারাম তো কেবল ভোগে
পিলের জ্বর আর পাণ্ডুরোগে।
কিন্তু তারা উচ্চ ঘর,
কংসরাজের বংশধর!
শ্যাম লাহিড়ি বনগ্রামের
কি যেন হয় গঙ্গারামের।
যা হোক এবার পাত্র পেলে,
এমন কি আর মন্দছেলে।

ভয় পেয়ো না

ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মারবো না —
সত্যি বলছি কুস্তি ক'রে তোমার সঙ্গে পারবো না।
মনটা আমার বড্ড নরম, হাড়ে আমার রাগটি নেই,
তোমায় আমি চিবিয়ে খাবো এমন আমার সাধ্যি নেই,
মাথায় আমার শিং দেখে ভাই ভয় পেয়েছ কতই না —
জানো না মোর মাথার ব্যারাম, কাউকে আমি গুঁতোই না?
এসো এসো গর্তে এসো, বাস করে যাও চারটি দিন,
আদর করে শিকেয় তুলে রাখবো তোমায় রাত্রি দিন।
হাতে আমার মুগুর আছে তাই কি হেথায় থাকবে না?
মুগুর আমার হালকা এমন মারলে তোমায় লাগবে না।
অভয় দিচ্ছি, শুনছো না যে? ধরবো না কি ঠ্যাং দুটা?
বসলে তোমার মুণ্ডু চেপে বুঝবে তখন কাণ্ডটা!
আমি আছি, গিন্নী আছেন, আছেন আমার নয় ছেলে —
সবাই মিলে কামড়ে দেবো মিথ্যে অমন ভয় পেলে।

নিঃস্বার্থ

গোপালটা কি হিংশুটে মা! খাবার দিলেম ভাগ করে,
বল্লে নাকো মুখেও কিছু, ফেল্লে ছুঁড়ে রাগ করে।
জ্যেঠাইমা যে মেঠাই দিলেন, 'দুই ভায়েতে খাও বলে' —
দশটি ছিলো, একটি তাহার চাখতে দিলেম ফাও বলে,
আর যে নটি, ভাগ করে তায় তিনটে দিলেম গোপালকে—
তবুও কেবল হ্যাংলা ছেলে আমার ভাগেই চোখ রাখে।
বুঝিয়ে বলি, কাঁদিস কেন? তুই যে নেহাৎ কনিষ্ঠ,
বয়স বুঝে, সামলে খাবি, তা নৈলে হয় অনিষ্ঠ,
তিনটি বছর তফাৎ মোদের, জ্যায়াদা হিসাব শুনতি তাই,
মোদ্দা আমার ছয় খানি হয়, তিন বছরে, তিনটি পাই।''
তাও মানে না কেবল কাঁদে, —স্বার্থপরের শয়তানি,
শেষটা আমার মেঠাইগুলো খেতেই হলো সবখানি।

কাজী নজরুল ইসলাম
মটকু মাইতি বাঁটকুল রায়

মটকু মাইতি, বাঁটকুল রায়
ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে যায়,
বেঁটে খাটো নিটপিটে পায়—
ছেতরে চলে কেতরে চায়।
মটকু মাইতি বাঁটকুল রায়।।
পায়ে পরে গাবদা বুট আর পট্টি,
গড়াই চলে যেন গাঁটরি ও মোটটি,
হনুলুলু সুরে গায় গান উদ্ভটি,
হাঁটি-হাঁটি পা-পা ডাইনে বাঁয়।
মটকু মাইতি বাঁটকুল রায়।।
রাস্তায় তেড়ে এল এঁড়ে এক দামড়া —
ঢুঁস খেয়ে বাঁটকুর ছিঁড়ে গেল চামড়া —
ভয়ে মটকুর চোখ হয়ে গেল আমড়া
সে উলটিয়ে সাতপাক ডিগবাজি খায়।
মটকু মাইতি বাঁটকুল রায়।।

খুকী ও কাঠ্‌বেরালি

কাঠ্‌বেরালি! কাঠ্‌বেরালি! পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবি নেবু? লাউ?
বেড়াল-বাচ্চা? কুকুর ছানা? তাও? —

ডাইনী তুমি হোঁৎকা পেটুক,
খাও একা পাও যেথায় যেটুক!
বাতাবি-নেবু সকলগুলো
একলা খেলে ডুবিয়ে নুলো!

তবে যে ভারি ল্যাজ উঁচিয়ে পুটুস্ পাটুস্ চাও?
ছোঁচা তুমি! তোমার সঙ্গে আড়ি আমার! যাও!

কাঠ্‌বেরালি! বাঁদ্‌রীমুখী! মার্‌বো ছুঁড়ে কিল?
দেখ্‌বি তবে? রাঙাদা'কে ডাক্‌বো? দেবে ঢিল!

পেয়ারা দেবে? যা তুই ওঁচা!
তাইতে তো তোর নাকটি বোঁচা!
হুত্‌মো-চোখী! গাপুস্-গুপুস্
এক্‌লাই খাও হাপুস্-হুপুস্!

পেটে তোমার পিলে হবে! কুড়ি-কুষ্টি মুখে!
হেই ভগবান! একটা পোকা যাস্ পেটে ওর ঢুকে!
ইস্! খেয়োনা মস্তপানা ঐ সে পাকাটাও!
আমিও খুবই পেয়ারা খাই যে! একটি আমায় দাও!

কাঠ্‌বেরালি! তুমি আমার ছোড়্‌দি হবে? বৌদি হবে? হুঁ!
রাঙা দিদি? তবে একটা পেয়ারা দাওনা! উঃ!

এ রাম! তুমি ন্যাংটা পুঁটো?
ফ্রক্‌টা নেবে? জামা দুটো?
আর খেয়োনা পেয়ারা তবে,
বাতাবি নেবু ও ছাড়্‌তে হবে!

দাঁত দেখিয়ে দিচ্ছো যে ছুট? অ'মা দেখে যাও! —
কাঠ্‌বেরালি! তুমি মর! তুমি কচু খাও!!

সুনির্মল বসু

দেহাতি ছড়া

এল রে ওই ঘূর্ণিঝড়—
বাঁশের বনে ঝরল পাতা—
বাবলা গাছের নড়ল মাথা—
কাঁপছে যেন বালুর চর;
ছোট্ট টিয়ে উড়তে গিয়ে
আছড়ে পড়ে ছটফটিয়ে
আন্ ত খাঁচা —শীঘ্র কর;
টিয়ের ছানা কোথায় এটা
আরে ছি, ছি, চামচিকেটা
ধুঁকছে শুয়ে ধুলোর পর।

এমন কি আর খাই

তোমরা... যাই বলোনা ভাই,
এমন কি আর খাই!
আস্ত পাঁঠা হলেই পরে—
ছোট্ট আমার পেট্‌টা ভরে,
যদি... তার সঙ্গে ফুল্‌কো-লুচি
গণ্ডা বিশেক পাই,—
এমন কি আর খাই।

চপ্-কাটলেট্ পড়লে পাতে,
আপত্তি আর নাইকো তাতে,
আর... কোপ্তা-কাবাব-কালিয়াতে
অমত্ আমার নাই;
এমন কি আর খাই।

হয় না হজম এখন দাদা,
খাওয়া-দাওয়ায় অনেক বাধা,
এখন... তাই তো অনেক বুঝে-সুঝে

খাবার খেতে চাই;
এমন কি আর খাই।

সের পাঁচ-ছয় রাবড়ি-দধি
তোমরা আমায় খাওয়াও যদি
কষ্ট করে' এই বয়সেও
খেতেও পারি তাই,
এমন কি আর খাই।

প্রেমেন্দ্র মিত্র
হঠাৎ যদি

আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা,
করি গোটা কয়েক আইন জারি
দু'এক জনায় খুব ক'ষে দিই সাজা।

মেঘগুলোকে করি হুকুম সব,
ছুটি তোদের, আজকে মহোৎসব।
বৃষ্টি-ফোঁটার ফেলি চিকন চিক
ঝুলিয়ে ঝালর ঢাকি চতুর্দিক,
দিলদরিয়া মেজাজ ক'রে কই
বাজগুলো সব স্ফূর্তি ক'রে বাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা!
হাওয়ায় বলি 'হল্লা ক'রে চল'
তারার বাতি নিভিয়ে দলে-দল,
অন্ধকারে সত্যি কথার শেষে
রাজকন্যা পদ্মাবতীর দেশে।
ঘুমের ঘোরে সেপাইগুলো ঢোলে,
তাদের ধ'রে খুব কষে দিই সাজা।

আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

সুপ্তিমগন পদ্মাবতীর পুরে
মহল বেড়াই টহল দিয়ে ঘুরে।
ধীরে গিয়ে বসি শিয়র দেশে
একটি মালা পরায়ে দিই কেশে,
হৃদয়খানি জোর ক'রে নিই কেড়ে;
বুকে বেঁধে দিই তাহারে সাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।
ওলট-পালট করি বিশ্বখানা
ভাঙি যেথায় যত নিষেধ মানা;
মনের মতো কানুন করি ক'টা
রাজা হওয়ার খুব ক'রে নিই ঘটা।
সত্য, তা সে যতই বড় হোক
কঠোর হ'লে দিই তাহারে সাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

হারিয়ে

কোনো দিন গেছ কি হারিয়ে
হাট-বাট নগর ছাড়িয়ে
দিশাহারা মাঠে,
একটি শিমূল গাছ নিয়ে
আকাশের বেলা কাটে?
সেখানে অনেক পথ খুঁজে
পৃথিবী শুয়েছে চোখ বুঁজে
এলিয়ে হৃদয়।
শিয়রে শিমূল শুধু একা
চুপ ক'রে রয়।
পথ খুঁজে যারা হয়রান
কোনদিন সেই ময়দান

তারা পেয়ে যায়।
হঠাৎ অবাক হয়ে
আশে পাশে ওপরে তাকায়।
কোন পথ যেখানেতে নেই
সেখানেই মেলে এক খেই
আরেক আশার।
সব পথ পারাবার পর
বুঝি খোঁজ মেলে আপনার।
একদিন যেও না হারিয়ে
চেনা মুখ শহর ছাড়িয়ে
অজানা প্রান্তরে
একটি শিমূল আর আকাশ যেখানে
মুখোমুখি চায় পরস্পরে।

অশোকবিজয় রাহা

মায়াতরু

এক-যে ছিলো গাছ,
সন্ধে হ'লেই দু-হাত তুলে জুড়তো ভূতের নাচ।
আবার হঠাৎ কখন
বনের মাথায় ঝিলিক মেরে মেঘ উঠতো যখন
ভালুক হ'য়ে ঘাড় ফুলিয়ে করতো সে গরগর
বৃষ্টি হ'লেই আসতো আবার কম্প দিয়ে জ্বর।
এক পশলার শেষে
আবার যখন চাঁদ উঠতো হেসে
কোথায় বা সেই ভালুক গেলো, কোথায় বা সেই গাছ,
মুকুট হ'য়ে ঝাঁক বেঁধেছে লক্ষ হীরার মাছ।
ভোরবেলাকার আবছায়াতে কাণ্ড হ'তো কী-যে
ভেবে পাইনে নিজে,
সকাল হ'লো যেই
একটিও গাছ নেই,
কেবল দেখি প'ড়ে আছে ঝিকির-মিকির আলোর
রুপালি এক ঝালর।

নরেশ গুহ

রুমির ইচ্ছা

আমি যদি হই ফুল, হই ঝুঁটি-বুলবুল হাঁস
মৌমাছি হই একরাশ,
তবে আমি উড়ে যাই, বাড়ি ছেড়ে দূরে যাই,
ছেড়ে যাই ধারাপাত, দুপুরের ভূগোলের ক্লাস।
তবে অমি টুপটুপ, নীল-হ্রদে দিই ডুব রোজ
পায় না আমার কেউ খোঁজ।
তবে আমি উড়ে-উড়ে ফুলেদের পাড়া ঘুরে
মধু এনে দিই এক ভোজ।
হোক আমার এলো চুল, তবু আমি হই ফুল লাল।
ভরে দিই ডালিমের ডাল।
ঘড়িতে দুপুর বাজে; বাবা ডুবে যান কাজে;
তবু আর ফুরোয় না আমার সকাল।

অন্নদাশঙ্কর রায়

খুকু ও খোকা

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?

ভাঙছ প্রদেশ ভাঙছ জেলা
জমিজমা ঘরবাড়ী
পাটের আড়ৎ ধানের গোলা
কারখানা আর রেলগাড়ী!
তার বেলা?

চায়ের বাগান কয়লাখনি
কলেজ থানা আপিস ঘর

চেয়ার টেবিল দেয়ালঘড়ি
পিয়ন পুলিশ প্রোফেসর।
তার বেলা?

যুদ্ধ জাহাজ জঙ্গী মোটর
কামান বিমান অশ্ব উট
ভাগাভাগি ভাঙাভাঙির
চলছে যেন হরির লুট।
তার বেলা?

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
বাঙলা ভেঙে ভাগ করো।
তার বেলা?

ভেল্‌কি

চণ্ডীচরণ দাস ছিল
পড়তে পড়তে হাসছিল
হাসতে হাসতে হাঁস হলো
হায় কী সর্বনাশ হলো।

নন্দগোপাল কর ছিল
ডুব দিয়ে মাছ ধরছিল
ধরতে ধরতে মাছ হলো
হায় কী সর্বনাশ হলো।

বিশ্বমোহন বল ছিল
ঘাসের উপর চলছিল
চলতে চলতে ঘাস হলো
হায় কী সর্বনাশ হলো।

বন্দে আলি খান্‌ ছিল
গাছের ডাল ভাঙছিল।
ভাঙতে ভাঙতে গাছ হলো
হায় কী সর্বনাশ হলো।

বিষ্ণু দে

বুড়ো-ভোলানো ছড়া

আয় বৃষ্টি হেনে
ছাগল দেব মেনে,
বোমা যাবে ডুবে
ডাকাতের দল উবে।

সুন্দর বনে ভীষণ বাঘ
তাদের চোখে দেশের রাগ
নখে তাদের বেজায় ধার,
খাঁড়ার মতোই দাঁতের সার।

আয় বৃষ্টি হেনে,
ধান বিছালি মেনে
জবাব দেব বোমায়
ডাকাত যেথা ঘুমায়।

মরা গাঙেও যা কুমির,
নৌকা হবে চৌচির,
গোখরো সাপের দেশ রে ভাই
মারবে শেষে ফণার ঘা-ই।

আয় বৃষ্টি হেনে,
চরকা দেব মেনে,
বোমা যাবে ফেঁসে,
এ দেশ সর্বনেশে।
সূর্যে আছে অগ্নিবাণ
হিমালয়ের কঠিন গান,
সাগরঘেরা বালির বাঁধ,
হাতের দড়ি চোখের চাঁদ।

আয় বৃষ্টি হেনে,
পরমায়ু দিই মেনে
কামান দাগার বাজে
চোরা পালায় লাজে।

উড়ো জাহাজের নোঙর তোল্,
ডাকাত ডিঙির ফাটুক খোল,
এগিয়ে চলি হুঁশিয়ার
তিরিশ কোটির হাতিয়ার।

দুনিয়া দেখে অবাক আজ,
তিরিশ কোটি তীরন্দাজ,
সঙ্গে আছে নানান দেশ,
ঘরের খেয়ে বনেই শেষ।

ঘরের ছেলে ঘরেই যা,
দো-দো-আনা ভাত ঘরেই খা।
দু'পণ ছ' কড়ি
নিয়ে পালায় বুড়ি।
বৃষ্টি আসে হেনে
সব দিয়েছি মেনে।।

সুকান্ত ভট্টাচার্য
সুচিকিৎসা

বদ্যিনাথের সর্দি হল কলকাতাতে গিয়ে,
আচ্ছা ক'রে জোলাপ নিল নস্যি নাকে দিয়ে।
ডাক্তার এসে, বল্ল কেশে, "বড়ই কঠিন ব্যামো,
এসব কি সুচিকিৎসা? — আরে আরে রামঃ।
আমার হাতে পড়লে পরে 'এক্সরে' করে দেখি,
রোগটা কেমন, কঠিন কিনা— আসল কিংবা মেকি।
থার্মোমিটার মুখে রেখে সাবধানেতে থাকুক,
আইস-ব্যাগটা মাথায় দিয়ে একটা দিন তো রাখুক।
'ইনজেক্শান' নিতে হবে 'অক্সিজেন'টা পরে
তারপরেতে দেখব এ রোগ থাকে কেমন ক'রে।"
পল্লীগ্রামের বদ্যিনাথ অবাক হল ভারী,
সর্দি হলেই এমনতর? ধন্য ডাক্তারী।।

রেশন কার্ড

রঘুবীর একদিন দিতে গিয়ে আড্ডা,
হারিয়ে ফেলল ভুলে রেশনের কার্ডটা;
তারপর খোঁজাখুঁজি এখানে ও ওখানে,
রঘু ছুটে এল তার রেশনের দোকানে,
সেখানে বলল কেঁদে, হুজুর, চাই যে আটা —
দোকানী বলল হেঁকে, চলবে না কাঁদা-কাটা,
হাটে মাঠে ঘাটে যাও, খোঁজো গিয়ে রাস্তায়
ছুটে যাও আড্ডায়, খোঁজো চারিপাশটায়;
কিংবা অফিসে যাও এ রেশন এলাকার,
আমার মামার পিসে, কাজ করে ছেলে তার,
তার কাছে গেলে পরে সবই ঠিক হয়ে যাবে,'
ছ'মাসের মধ্যেই নয়া এক কার্ড পাবে।
রঘুবীর বলে কেঁদে, ছ'মাস কি করব?
ছ'মাস কি উপবাস ক'রে ধুঁকে মরব?
আমি তার করব কী? — দোকানী উঠল রেগে —
যা খুশি তা করো তুমি — বলল সে অতি বেগে;
পয়সা থাকে তো খেও হোটেলে কি মেসেতে,
নইলে সটান্ তুমি যেতে পারে দেশেতে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পারাপার

আমরা যেন বাংলাদেশের
চোখের দুটি তারা
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে —
থাকুক গে পাহারা।
দুয়ারে খিল।
টান দিয়ে তাই
খুলে দিলাম জান্‌লা

ওপারে যে বাংলাদেশ
এপারেও সেই বাংলা।

রঞ্জন ভাদুড়ি

অদ্ভুতুড়ে

চালতা গাছে আলতাপাটি
শিম ধরেছে — দাঁতকপাটি
খাচ্ছে বুড়ো কাণ্ড দেখে।

খসখসিয়ে ডাইরি লেখে:
অদ্ভুতুড়ে ব্যাপার একি!
শিমটা আসল? কিম্বা মেকি?

দেখছে চোখে বাইনোকুলার,
মাথায় টুপি শিমুলতুলার।

গৌরী ধর্মপাল

পায়রাপুর

একতলার ঐ পায়রাপুরে
কাল দেখেছি রাত দুপুরে
পায়রা-বাবার পায়জামা
দিচ্ছে তালি পায়রা-মা।
লালকালিতে দিচ্ছে দাগ
পায়রা-খুকু প্রথম ভাগ।
পায়রা-খোকার উস্‌কানিতে
নাচছে ফড়িং ফুলদানিতে।
পায়রা-দিদি ছাই-শাড়িতে
গেইশা সিলোয় দুই সারিতে।
চশমা-চোখে পায়রা-দাদা
ঝাড়ছে বই-এর নোংরা-কাদা।
শুকনো রোগা পায়রা-চাকর
বকছে একা বকর বকর।

আলগা-পালক পায়রা-ঝি
ঘুরিয়ে দেখে আয়নাটি।
পায়রা-দাদুর ফুলধুতিতে
চার নাতি আর তিন পুতিতে
আঁকছে কাগের বগের ঠ্যাং
পায়রা-জামাই চিৎপটাং।
হঠাৎ দেখি শোন না দাদা
মেঘের ফাঁকে পায়রা-চাঁদা
পায়রা-মাঠে পায়রা-হরিণ
জোড়ায় নাচে তিড়িং বিড়িং
আকাশ মাটি একাকার
পায়রা-ধুালোয় ধুলোক্কার।
পড়ল ধুলো চোখ দুটোতে
পায়রা-বাঁশির এক ফুটোতে
ভাঁজতে ভাঁজতে পায়রা-সুর
মিলিয়ে গেল পায়রাপুর।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

খোকার ইচ্ছে

উঠতে-বসতে বাবা হাঁকেন
'বলব তোকে কী আর,
তুই হবি এই দেশটা গড়ার
শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার।'
মা তা-ই শুনে কন, 'খোকা, তুই
আমার কথা রাখ্,
ডাক্তারিতে হয় যেন তোর
দেশজোড়া নামডাক।'
দাদু বলেন, 'কী হবি তুই
আমিই সেটা জানি,
তুই হবি এক নোবেল-জয়ী
বিখ্যাত বিজ্ঞানী।'

একইসঙ্গে সবাই বলেন,
'এই প্রতিজ্ঞা কর,
সব পেপারেই তুলবি এবার
সব-সেরা নম্বর।'
আমার ইচ্ছে, ঘুড়ি ওড়াই,
লাট্টু ঘোরাই, আর
ক্রিকেট খেলি, ডুব-সাঁতারে
পুকুর করি পার।
কিন্তু সে-সব করতে গেলেই
সবাই আসেন তেড়ে,
সবাই বলেন, 'বই নিয়ে বোস্‌
এক্ষুনি সব ছেড়ে।'
কী আর বলব, এখন আমার
অবস্থাটা এই,
লেখাপড়ায় দিন কেটে যায়,
কিচ্ছু খেলা নেই।
এক-এক জনের এক-এক ইচ্ছে,
সবাই দিচ্ছে তাড়া,
তার ফলে ভাই আমার নিজের
ইচ্ছে গেছে মারা।

বাবুর বাজার

ভুঁড়িদার বাবুটির চুড়িদার জামা,
পিছনে ভৃত্য চলে, ঘাড়ে তার ধামা।
বাবু যান ষষ্ঠীর বাজারের তরে,
কেনাকাটা করবেন পাইকিরি দরে।
নানাবিধ মাছ চাই, মাংসও চাই,
তৎসহ সবজি ও হরেক মিঠাই।
চিনিপাতা দই চাই অবশ্য, আর
ল্যাংড়া গোলাপখাস বেগমবাহার
এত সব মনে রাখা মোটে নয় সোজা,

পকেটে রয়েছে তাই ফর্দটি গোঁজা।
ভৃত্যটি মনে-মনে করে হায়-হায়,
ধামার ভারে না তার ঘাড় ভেঙে যায়।

জামাইষষ্ঠী আজ, সেই পারনের
ঠেলায় বাজারে নেই তিলধারণের
মতন জায়গাটুকু, ভুঁড়িদার বাবু
জনতার কনুয়ের গুঁতো খেয়ে কাবু।
গুঁতোগুঁতি, ঠেলাঠেলি, প্রাণ যায় যায়,
গলা তুলে সপ্তমে সবাই চেঁচায়।
ঢুকেছে পকেটমারও গোটা তিন-চার,
আজকে তাদেরও হবে ভাল রোজগার।
বেছে নিয়ে তারা সেরা খদ্দেরটিকে
চোখ রাখে ভুঁড়িদার বাবুটির দিকে।
হাতের এমন খেলা, পকেট তো ফাঁকা,
নিমেষে হাপিস হল ফর্দ ও টাকা।

ভঁড়িদার বাবু ওই করে হায়-হায়,
জরিপাড় ধুতি তাঁর মাটিতে লুটায়।
পকেট গড়ের মাঠ, বিলকুল ধুধু,
পরনে রয়েছে ছেঁড়া পাঞ্জাবি শুধু।
জামাইষষ্ঠী আজ, জামাই কী খাবে,
গিন্নির চোটপাটে প্রাণ তাঁর যাবে।
যা ছিল বাবুর টাকা, সেই টাকাটাই
লাগাবে বিশাল ভোজে চোরের জামাই।
ভাবতেই প্রাণ তাঁর হু-হু করে ওঠে,
আটকায় নিশ্বাস কান্নার চোটে।
হাসে শুধু ভৃত্যটি, সে ভাবছে আর
বইতে হবে না আজ বাবুর বাজার।

শঙ্খ ঘোষ

মিথ্যে কথা

লোকে আমায় ভালোই বলে, দিব্যি চলনসই—
দোষের মধ্যে, একটু নাকি মিথ্যে কথা কই।
ঘাটশিলাতে যাবার পথে ট্রেন ছুটেছে যখন
মায়ের কাছে বাবার কাছে করছি বকম্ বকম্
হঠাৎ দেখি মাঠের মধ্যে চলন্ত সব গাছে
এক-একরকম ভঙ্গি ফোটে এক-একরকম নাচে
'ও মা, দেখো, নৃত্যনাট্য' — যেই বলেছি আমি
মা বকে দেয় 'বড্ড তোমার বেড়েছে ফাজলামি।'

চিড়িয়াখানায় নাম জানো তো আমার সেজোমেসোর?
আদর করে দেখিয়েছিলেন পশুরাজের কেশর।
কদিন পরে চুনখসানো দেয়াল জুড়ে — এ কী
ঠিক অবিকল সেইরকমই মূর্তি যেন দেখি?
ক্লাসের মধ্যে যেই বলেছি সুরঞ্জনার কাছে
'জানিস? আমার ঘরের মধ্যে সিংহ বাঁধা আছে'—
শুনতে পেয়ে দিদিমণি অম্‌নি বলেন 'শোনো,
এসব কথা আবার যেন না-শুনি কক্ষনো!'

বলি না তাই সেসব কথা, সামলে থাকি খুব,
কিন্তু সেদিন হয়েছে কী — এঁম্‌নি বেয়াকুব—
আকাশপারে আবারও চোখ গিয়েছে আট্‌কে
শরৎমেঘে দেখতে পেলাম রবীন্দ্রনাথকে।

দিন ফুরোলে

সূয্যি না কি সত্যি নিজের ইচ্ছেয়
ডুব দিয়েছে? সন্ধ্যে হলো? দুচ্ছাই।

আকাশ জুড়ে এক্ষুনি এক ঈশ্বর
চমকে দেবেন লক্ষ রঙের দৃশ্যে।

লক্ষ, বা তা হতেও পারে একশো—
কেই-বা খুলে দেখছে রঙের বাক্স!

আমরা কি আর দেখতে পাব ভাবছ?
বাপমায়েরা যাবেন তবে মুচ্ছো !

পাখির সারি যেমন ধানের গুচ্ছে
আঁধার ফেলে ঘরের দিকে উড়ছে।

তেমনি এবার ফিরতে হবে সত্যি
নিজের নিজের মনখারাপের গর্তে।

বলবে বাবা ঃ এইটুকু সব বাচ্চা—
দিন ফুরোলেও মাঠ ছাড়ে না? আচ্ছা!

মা বলবে ঃ ঠ্যাংদুটো কী কুচ্ছিৎ!
একগঙ্গা জল দিয়ে তাই ধুচ্ছি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
আমার বাবার ঠাকুরদাদা

আমার বাবার ঠাকুরদাদা
এক শুক্কুরবারে
হঠাৎ যেন বদলে গেলেন
বসে নদীর ধারে।
আমার বাবার ঠাকুরদাদা
দারুণ স্বাস্থ্যবান,
একটি ধামা মুড়ির সঙ্গে
দশটা লঙ্কা খান।
গায়ের রঙটি কালো হলেও
রাগলে পরেই লাল
তন্ত্রমন্ত্র জানেন অনেক
নাচান কঙ্কাল!
সেই তিনি এক দুপুরবেলা

ঝামরে মাথার চুল
বললেন, ওঃ, জীবনখানাই
মস্ত বড় ভুল!
একই বাড়ি, একই উঠোন,
মানুষজনও চেনা
প্রত্যেকদিন সব কিছু এক,
আর তো ভাল্লাগে না।
শুয়ে শুয়ে দেয়াল দেখা
দেয়াল নয় তো খাঁচা
খাইদাই আর বগল বাজাই
এর নাম কি বাঁচা?
এই না বলে নৌকো খুলে
জোয়ার-জলে ভেসে
আমার বাবার ঠাকুরদাদা
গেলেন নিরুদ্দেশে।
কোথায় গেলেন, কোথায় গেলন
কেউ জানে না আর
সবাই বলে গেছেন তিনি
তিন সাগরের পার।
নতুন কোনো দ্বীপের মধ্যে
বানিয়ে নিজের দেশ
তিনিই রাজা, তিনিই প্রজা
একলা আছেন বেশ।
কেউ বা বলে গেছেন তিনি
কিউবা, হনলুলু
এখন নতুন নাম হয়েছে
কার্ভালো কোভুলু।
এক পাদ্রি ছবি দেখেই
বললেন, কে ইনি
সুবিখ্যাত ভূপর্যটক
বিলক্ষণ চিনি!
রাশিয়াতেই দেখেছি শেষ
মাথায় পাগড়ি বাঁধা
লেনিন-সাহেব আদর করে
ডাকেন 'ঠাকুরদাদা'।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন
পৃথিবী খান খান,
তিনিই হিটলারের গোঁফে
মেরেছিলেন টান।
বৃদ্ধ তিনি হননি মোটেই
মন্ত্র-তন্ত্র বলে,
অমর হয়ে আজও ঘোরেন
সারা ভূমণ্ডলে।
এমনটিও হতেই পারে
হঠাৎ মনের সাধে
তিনিই প্রথম পা দিয়েছেন
মঙ্গলে আর চাঁদে।
স্বপ্নে আমি দেখেছি সেই
আজব মানুষটি কে
কেমন যেন অবাক চোখে
তাকাল আমার দিকে।
ফিসফিসিয়ে বলেন, ওরে
ঘরবন্দি খোকা
আরাম করে ব্যারাম করিস
এমন তোরা বোকা?
সারা জীবন কাটিয়ে যাবি
নরম বিছানায়?
এই দুনিয়া দেখবি যদি
আমার সঙ্গে আয়।
লাফিয়ে উঠি, কেউ নেই তো,
শুধুই অন্ধকার,
বাতাসে তবু ফিস্‌ফিসানি
শুনি বারংবার।

সেদিন থেকে বনে পাহাড়ে
নানান নদীর বাঁকে,
পায়ের তলায় সর্ষে আমার
খুঁজে বেড়াই তাঁকে।

ছোট্ট রবি

বাবামশাই সিমলা যাবেন বেজায় হুলুস্থুলু
রাত জেগে মা বাক্স সাজান, চক্ষু ঢুলু ঢুলু
শীতের জামা চাদর ছাতা লিষ্টি অতি বৃহৎ
মৌরী ভাজা, সুঁচ-সুতো চাই এবং উপনিষৎ!
খাজাঞ্চি ও গোমস্তারা যাবেন জনা বারো
এবং রবি? মা বলছেন, 'তুমিও যেতে পারো'।
রবির এখন ন্যাড়ামাথা, তাই নিয়ে খুব লজ্জা
জ্যোতিদাদা পরিয়ে দিলেন যুদ্ধে যাওয়ার সজ্জা।
জোড়াসাঁকোর পালকি এলো গঙ্গানদীর ধারে,
পাহাড় চূড়ায় যাবে এবার সোজা ইস্টিমারে।

সামসুল হক
মা

অবুঝ রাজার মেলায় গিয়ে আনবো সবুজ পাখি,
সাতশো ক্রোশের বেশি হবে অবুঝ রাজার গাঁ কি?
না যদি হয়, তোর কপালে সাতশো চুমো দিতে
ঐটুকু পথ ফুরিয়ে যাবে হঠাৎ আচম্বিতে।

হাসান-রাজার মেলায় কিনবো ভাসান-ভাসান নদী,
পাষাণপুরীর সাতশো ক্রোশের বেশি না হয় যদি,
ঐটুকু পথ ফুরিয়ে যেতে কতক্ষণ বা লাগে!
পথ ফুরোবে তোমার হাসির সাতশো রঙের আগে।

দুঃখ রাজার মেলায় কিনবো দুধ-পাথরের পাহাড়,
সাতশো ক্রোশের দূর হবে কি রাজ্য শাহেনশাহার?
চোখের জলে সাতশো কমল তাদের ঝিকিমিক্
তোলার আগে ঐটুকু পথ পৌঁছে যাব ঠিক।

পাহাড় হলো, বইলো নদী, মেললো ডানা পাখি,
আমি ওদের মাথার উপর আকাশ হয়ে থাকি।
পাহাড় পাখি আকাশ নদী — রইলো একটা বাদ,
সোনামনি তুমিই হবে ঐ আকাশের চাঁদ।

সরল দে

আপ্যায়ন

আসুন আসুন বসুন বসুন
হেলান দিয়ে সোফায়।
ময়লা কেন জামা-কাপড়,
দেয়নি কেচে ধোপায়?

দোহাই দাদা, দাগ না লাগে
সামলে নিয়ে বসুন।
খবর-টবর ভালো তো সব?
কেমন আছে প্রসূন?

পায়ের ধুলো দিতে এলেন?
বড্ড ধুলো ও পায়!
দুঃখ পাবো ভুলেও পাটা
তোলেন যদি সোফায়।

ডবলডেকার বাসে এলেন?
ভীড় কি ছিল ভারি?
বলেন কি ভাই,বাসের সিটে
ছারপোকা একর্কাড়ি!

এই রে খেলে, উঠুন উঠুন
পালান পালান,পালান,
বাসের থেকে সোফায় যদি
ছারপোকা হয় চালান।

এই যা, বড় ভুল যে হল,
চলবে না কি চা-টা?
নেহাৎ যদি যাবেন, দাদা,
আচ্ছা তবে টা-টা।।

জুতো পালিশ

ফুটপাথে সে ঘুমোয় যদি
কে দেয় তাকে বালিশ?
না দিক তবু কারুর কাছে
করবে না সে নালিশ।

আকাশছোঁয়া আপিস বাড়ি
তার নীচে ফুটপাথে—
সেই ছেলেকেই রোজ দেখা যায়
জুতো-বুরুশ হাতে।

কাজ ফেলে সে দুপুরবেলা
লটকেছে এক ঘুড়ি।
ঠিক যেন সেই দুষ্টু খোকা—
তেম্‌নি হুড়োহুড়ি।

ফুটপাথে সে ঘুমোয় যদি
কে দেয় তাকে বালিশ?
রোজ সে দেখি বলছে ডেকে—
পালিশ জুতো পালিশ।

অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী

হাইটেক হাইটেক

লিখত চিঠি বাবা-কাকা লিখত চিঠি মাসি
লিখত চিঠি ছেলে-বুড়ো আটের থেকে আশি।

নিকট-দূরে থাকেই যারা মস্ত আপনজন
আজকে চিঠি কেউ লেখে না সবাই করে ফোন।

আগে তারাই লিখত চিঠি ভাব রসেতে ভরা
বন্ধ এখন চিঠির ঝাঁপি এখন সেথা খরা।

সংক্ষেপেতে সারছে সবাই ফোনটাকে দেয় ছেড়ে
বেশি কথা বললে ফোনে মূল্য যাবে বেড়ে।

হ্যালো হ্যালো, কেমন আছ? আমরা ভাল আছি—
ফোনটা কানে তুললে ভাবি আছিই কাছাকাছি।

এই পৃথিবী ছোট্ট হয়ে ঢুকেই গেল ঘরে
তাইতো সবাই ভুগছে এখন বিশ্বায়নের জ্বরে।

করছে তাড়া ছুটছে সবাই খাচ্ছে বসে কেক
ফোন-মোবাইল-ইন্টারনেট — হাইটেক হাইটেক।

অশোক কুমার মিত্র

সুর নিয়েছি রঙ নিয়েছি

গাছ বললে ডালকে ডেকে
পারিস দিতে কুঁড়ি?
ডাল বললে ফুটিয়ে দেব
কুসুম ঝুড়ি ঝুড়ি।
রাত বললে আকাশটাকে
আনতে পারিস ভোর?
বললে আকাশ সোনালী ভোর
ক'খানা চাই তোর।
বনের পাখি বললে ডাকি
গাইতে পারি সুরে,
রামধনু রঙ মাখিয়ে রাখা
আকাশখানা জুড়ে।

কেমন করে এসব পরি?
বললে ওরা ডেকে—
সুর নিয়েছি রঙ নিয়েছি
রবীন্দ্রনাথ থেকে।

মেঘের ছবি

নীল আকাশে যাচ্ছে ভেসে দুধ সাদা এক নৌকো,
নৌকো ভেঙে উড়ল হাওয়ায় মস্ত ঘুড়ি চৌকো।
আবার হল হাতির সারি — একটা হাতি বাচ্চা,
ল্যাজ ঝুলিয়ে তাল ঠুকে সে বললে — বহোৎ আচ্ছা।
কোথায় হাতি? আকাশ দেখি পেঁজা তুলোয় ঢাকা,
এক কোণে তার লাল সুজ্জি — পটের ছবি আঁকা।
মেঘ ভেঙে ফের তৈরি হল রাবণ রাজার সিঁড়ি।
কে সাজালো আকাশ জুড়ে রং চিত্তির পিঁড়ি।
এমন ছবি ওলোট পালোট নীল আকাশের গায়
মেঘ দিয়ে কে বলতে পার টাঙিয়ে দিয়ে যায়?

কার্তিক ঘোষ

নদীর কাছে

আঁকন বাঁকন ছোট্ট নদী, গাঁ পেরিয়ে শেষে...
কার সঙ্গে যাবি রে তুই রুপ্‌লি ঝুরির দেশে।
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে তিরপূর্ণির ঘাট
শালুক ফোটা ঝিলের ধারে পানকৌড়ির হাট।
সঙ্গে যাবে কে?
মন বসে না পড়ায় খুকুর, একলা রয়েছে!
ইলিক ঝিলিক ও নদী তোর দিব্যি দেখি আজ...
পরে বালির সাজ
রামধনুকের দেশ পেরিয়ে ডুমুরতলির কাছে—
চলতে গিয়ে বাঁক নিয়েছিস, সেই যেখানে আছে
পাতায় ছাওয়া মাঝির বাড়ি, ঘাটে অথৈ ঢেউ...
তোর সঙ্গে আর কে যাবে দাঁড়িয়ে আছে কেউ?

আঁকন বাঁকন ও নদীরে ছিলি তো বেশ ভালো...
উঠলি ফুঁসে তাই তো খুকুর কাঁকন হারালো!
বাগান-টাগান ভাসলো, আমার চাঁপাতলির ঘর...

হারিয়ে গেল বুড়ো বাউল, পাতাকুড়ুনির বর।
একটা কুঁড়ে তা-ও...
ভাসিয়ে দিলি খুকুর আমার পুজোর জামাটাও!
উথাল পাথাল ও নদীরে ঝিনুক ডুবির বাঁকে
একটা ছেলে খুঁজছে যে তার হারিয়ে যাওয়া মাকে
তুই দেখেছিস না কি—
রাত-বিরেতে ভেসে কোথায় গেছে বুধন ঢাকি?
বল না নদী, এই ছড়াটা ছাড়াও কি কি নিবি...
তার বদলে খুকুর শুধু ফ্রকটা ফিরে দিবি।।

মাঠা মানে ছুট

মাঠ মানে কি মজাই শুধু
মাঠ মানে কি ছুটি,
মাঠ মানে কি অথৈ খুশির
অগাধ লুটোপুটি।
মাঠ মানে কি হল্লা শুধুই
মাঠ মানে কি হাসি,
মাঠ মানে কি ঘুম তাড়ানো
মন হারানো বাঁশি।
মাঠ মানে কি নিকেল করা
বিকেল আসা দিন,
মাঠ মানে কি নাচনা পায়ের
বাজনা তাধিন ধিন।
মাঠ মানে তো সবুজ প্রাণের
ঝিলমিলি এক দীপ,
মাঠ মানে ছুট এগিয়ে যাবার
পিপির পিপির পিপ।
ছুট মানে কি ছোটাই শুধু
ছুট মানে কি আশা,
ছুট মানে কি শক্ত পায়ের
পোক্ত কোনো ভাষা।

ছুট মানে কি সাহস শুধু
ছুট মানে কি বাচা,
ছুট মানে কি ছোট্ট পাখির
আগল ভাঙা খাঁচা।
ছুট মানে কি ছুটন্ত আর
ফুটন্ত সব প্রাণে,
সাতটি সবুজ সমুদ্দুরের
ঢেউকে ডেকে আনে।
ছুট মানে তো খুশির সকাল
ছুট মানে যে সোনা,
ছুট মানে কি ছুটেই দেখ
আর কিছু বলব না।

রূপক চট্টরাজ

সহজ উপায়

মা বললেন, কানটি মুলে
"পাজি হতচ্ছাড়া—
লেখাপড়া শিকেয় তুলে
কেবল আড্ডামারা।
নির্ঘাৎ তুই ফেল করবি
গোল্লা পাবি আরও,
একই ক্লাসে থাকলে বুঝি
বুদ্ধি খোলে কারও?"

'কান ছাড়ো মা, বলছি শোনো
এক্ষুনি সব খুলে—
পড়লে কিছুই রয় না মনে
মুখস্থ যাই ভুলে।
তার চেয়ে মা, মনে রাখার
দাও না সহজ মন্ত্র,
কিংবা মাথায় দাও বসিয়ে
কম্‌পিউটার যন্ত্র।"

সেই মেয়েটা

আজকে মাগো তোমায় একটা গল্প বলি
ইস্কুলের ওই সামনে যে এক ছোট্ট গলি
ছোট্ট মেয়ে দাঁড়িয়েছিল একা একা
কোঁচড়ে তার চাঁপা টগর যাচ্ছে দেখা
ইস্কুলটা যেই না আমার হল ছুটি
টিফিন খাওয়া হয়নি, ছিল দুটো রুটি
ফুলের লোভে কাছে গিয়ে বলি তাকে
ভয়েতে ও কোঁচড়খানি আগলে রাখে
দিলাম তাকে টিফিন-বাক্স উজাড় করে
চাঁপা টগর দিল আমায় দু-হাত ভরে
খাবার পেয়ে ফুলগুলো সব আমায় দিয়ে
সে খুব খুশি, বলল আমায়, 'বাড়ি গিয়ে
মাকে দেব, মায়ের অসুখ খারাপ মনও
কাল থেকে মা দেয়নি মুখে খাবার কোনও
আসলে মা খাবেই বা কী যায়নি কাজে
আমার মা যে আটটা বাড়ির বাসন মাজে।'
এসব বলেই ভাসিয়ে দিল চোখের জলে
সূর্য তখন মিলিয়ে যাচ্ছে অস্তাচলে।

শ্যামলকান্তি দাশ
খেলার মাঠ

মাঠটা ছিল দেখার মতো
সবুজ ঘাসে ঢাকা
মাথার ওপর মস্ত আকাশ
ছবির মতো আঁকা।
চতুর্দিকে গাছগাছালি
চোখ জুড়িয়ে যেত,
সকাল বিকেল কত যে লোক

হাওয়াবাতাস খেত।
পাড়ার যত ছেলেরা সব
আসত দলে দলে,
সারা বিকেল থাকত মজে
ক্রিকেট ও ফুটবলে।
খেলতে খেলতে কতরকম
ঝগড়া মারামারি,
হাততালিতে কান পাতা দায়
'ওভার বাউণ্ডারি।'
ক্যাংলা পেনোর পায়ে কী জোর
শব্দ ওঠে 'গোল',
খেলার মাঠে বিকেল বেলা
তুমুল কলরোল।
সেই মাঠে আর হয় না খেলা
বাড়ির পাশে বাড়ি,
সকাল বিকেল দাঁড়িয়ে থাকে
প্রোমোটারের গাড়ি।
মাঠের ওপর রঙিন আকাশ
ধোঁয়ায় ধুলোয় ঢাকা,
খেলার মাঠে দাপিয়ে বেড়ায়
টাটা সুমোর চাকা।

প্রমোদ বসু
ফার্স্ট হতে হয়

ছোটদের ফার্স্ট হতে হয়।
ছোটদের ফার্স্ট হতে হয়।
সাঁতারে, চিত্রকলায়
ব্যায়ামে, পদ্যবলায়
ছোটদের ফার্স্ট হতে হয়,
ছোটদের ফার্স্ট হতে হয়।
কোচিঙে, বিদ্যালয়ে
শাসনের জন্যে ভয়ে

ছোটদের ফার্স্ট হতে হয়,
ছোটদের ফার্স্ট হতে হয়।
গানে আর তবলা-তালে,
ক্রিকেট ও দাবার চালে
ছোটদের ফার্স্ট হতে হয়,
ছোটদের ফার্স্ট হতে হয়।
বড়দের মান বাঁচাতে,
দিনরাত এই খাঁচাতে
ছোটদের ফার্স্ট হতে হয়,
ছোটদের ফার্স্ট হতে হয়।

অভীক বসু
ভাষাবিদ

বাবা বললেন কৃষ্ণ কহ
কাকু বললেন রাধে
খাঁচার ভিতর বন্দী তোতা
পড়ল কি ফ্যাসাদে,
ছাপড়া জেলার তাগড়া ঠাকুর
মুগুর ভাঁজার ফাঁকে
তুলসী ভজন শিখিয়ে যে যায়
অবুঝ তোতাটাকে।
ইংরেজিটা আমি শেখাই
থ্যাঙ্ক ইউ আর টাটা
পিটির পিটির তাকায় তোতা
নেই কো মুখে রা টা
যে যাই বলুক মাতৃভাষায়
তোতার কিন্তু জিদ
চিকির চিয়া চ্যাঁচায় খালি
নয় সে ভাষাবিদ
অবশেষে তিক্ত হয়ে
বলল তোতা রাধে
আর পারি না ক্লান্ত আমি
এক পেয়ালা চা দে।

অপূর্ব দত্ত

বাংলা-টাংলা

অ্যানুয়ালের রেজাল্ট হাতে
বাড়ি ফিরল ছেলে,
মা বলল — কোন পেপারে
কত নাম্বার পেলে?
হিস্ট্রিতে, মম, এইট্টি ফোর
ম্যাথসে নাইন জিরো—
মা বলল — ফ্যানটাস্টিক,
জাস্ট লাইক আ হিরো,
সায়েন্সে, ড্যাড, নট সো ফেয়ার
ওনলি সিক্সটি নাইন,
ইংলিশে জাস্ট নাইনটি টু
অলটুগেদার ফাইন।
জিয়োগ্রাফির পেপারে তো
হান্ড্রেডে হান্ড্রেড
ডুবিয়ে দিল বেংগলিটাই,
ভেরি পুয়োর গ্রেড।
ছেলের মাথায় হাত রেখে মা
ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে—
নেভার মাইণ্ড, বেংগলিটা
না শিখলেও চলে।
বাবা বলল— বেশ বলেছ
বঙ্গমাতার কন্যে
বাংলা-টাংলা আমার মত
অশিক্ষিতের জন্যে।
বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ
নেহাৎ ছিলেন বোকা
না হলে কেউ শখ করে হয়
বাংলা বইয়ের পোকা!
মা বলল — চুপ করো তো
ওর ফল্টটা কীসে,
স্কুলে কেন বেংগলিটা
পড়ায় না ইংলিশে?

বীর পুরুষের খোকা

খোকা বলল সেই ছড়াটা শোনাও না মা আবার
সেই যেটা খুব প্রিয় ছিল তোমার এবং বাবার।
মা বলল, তুই তো দেখি জ্ঞানের বটবৃক্ষরে,
কার লেখা, কী নাম ছড়াটার বলতো আগে ঠিক করে।
ঐ যে গো মা, যে ছেলেটা রাঙা ঘোড়ায় চড়ে
মা কে নিয়ে ঘুরত বিদেশ দিকে দিগন্তরে।
সন্ধেবেলা সুয্যি ঠাকুর যেই বসল পাটে
হঠাৎই সে পৌঁছে যেত জোড়া দিঘির মাঠে।
মাগো তুমি বলতে পারো জায়গাটা ঠিক কোথায়
সত্যি কি মা ভয় চলে যায় মরা নদীর সোঁতায়?

আচ্ছা ধরো তুমি যাচ্ছ পালকি চেপে একা
পথঘাট সব মনিষ্যি হীন, পাখিরও নেই দেখা;
গাছের মাথায় ঘনান্ধকার, দেখা যায়না ভালো,
ভাবো হঠাৎ দিঘির পাড়ে দেখতে পেলে আলো।
আর তখুনি শুনতে পেলে হারে-রে-রে-রে-রে।
ধরো তুমি সিঁটিয়ে ভয়ে পালকিরই এক কোণে
চুপটি বসে আমার কথা ভাবছ মনে মনে!
আমি তখন সেই ছড়াটার বীরপুরুষের মতো
তলোয়ারের ঘায়ে ডাকাত মারছি অবিরত
আমার রণ মূর্তি দেখে তোমার সে কী কষ্ট
রক্ত লেগে স্কুল ড্রেসটাও একেবারে নষ্ট।

ব্যাপারটা কী রোমাঞ্চকর ভাবা যায় না মোটে।
ভাগ্যে যদি এমন সুযোগ একবারটি জোটে
সবাইকে মা দেখিয়ে দেব একশো বছর পরেও
'রবিঠাকুর' 'বীর পুরুষ' ঠিক আছে তোমার ঘরেও।
ঐ যা! দেখো, বলে ফেললাম কোন ছড়া কার লেখা
দোষ কিছু নেই! সবই তো মা, তোমার কাছেই শেখা।

সুধীন্দ্র সরকার
সভাপতি

একটি বছর পরে এলুম
চিনতে পারেন দাদা?
সাধ্যমতো দিন না যা হোক
কালীপুজোর চাঁদা।
বাজেট এবার কম করেছি
দুর্মূল্যের বাজার তো,
ক্লাব ঘরটা করব পাকা
খরচ কুড়ি হাজার তো।
দরমা বেড়ার ঘরটা ভেঙ্গে
ভাবছি পুজোর পরে,
রাতারাতি গাঁথনি দিয়ে
উঠব নতুন ঘরে।
এ পাড়াতে জমির মূল্য
নয়ত দাদা কমই,
কী থেকে কী হয়ে যাবে
দখল করা জমি!
আপনাকে চাই নতুন ক্লাবের
সভাপতির পদে,
ক্লাবের ছেলেই বাঁচায় দাদা
বিপদে আপদে।
সভাপতির পদ পেতে তাই
পড়ার লোকের লাইন,
সভাপতির চাঁদা তো নেই?
এটাই ক্লাবের আইন।
হেঁজি পেঁজি মানুষ কী আর
সভাপতি হন?
কজন বলুন দিতে পারে
পাঁচশো ডোনেশন?

বলব কী আর

পিঠের ওপর বইয়ের বোঝা
কী করে যে দাঁড়াই সোজা?
শুনবে না কেউ কথা!
তিন বছরে পা-টি দিয়ে
ইস্কুলেতে বসছি গিয়ে,
বুঝছে না কেউ ব্যথা!

এছাড়া ফের আছে কত
প্রতিযোগিতা যেথায় যত,
সেখানেতেও যাব।
গল্প বলা, আবৃত্তিতে,
বসে আঁকো কী সঙ্গীতে;
সার্টিফিকেট পাব।

মা তখনি হেসে হেসে
বলবে আমায় ভালবেসে,
কাগজটা খুব দামি!
আমার তখন ঘুম পেয়ে যায়
পেটে ইঁদুর ডিগবাজি খায়;
বুঝবো কী-তা আমি?
ইস্কুলে যেই পরীক্ষা হয়,
বাবা-মায়ের মনে কী ভয়!
পরীক্ষা কী ওদের?
আমার সঙ্গে পড়তে বসেন
খাতা খুলে অঙ্ক কষেন,
বলব কী আর তোদের!

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার
রঙ-বদলের ব্যাপার-স্যাপার

দিল্লী থেকে বিল্লী এলেন দুধের মতন সাদা
কলকাতার এক কালো-বেড়াল বললে তাকে, দাদা!
আসুন-বসুন, কেমন আছেন? বাড়ির খবর ভালো?
সাদা-বেড়াল বললে, তোমার রঙটা কেন কালো?

কালো-বেড়াল বললে ঃ শুনুন, রাখুন আগে 'বেডিং'
আমি যখন জন্মেছিলাম, চলছিল 'লোডশেডিং'।

কুচবিহারের রাজার ছিল একটা কালো-হাতি
যখন-তখন সেই হাতিটাই করতো মাতামাতি।
একদিন তার কাণ্ড দেখেই চমকে গেল পিলে
পাঁচটা কাপড়-কাচা সাবান ফেললো হাতি গিলে।
পরদিন কি ঘটলো ব্যাপার, বলছি শোনো দাদা
সাবান খেয়েই কালো-হাতির বাচ্চা হলো সাদা।

রামুর সাথে দামুর সেদিন হঠাৎ হলো দেখা
বললে দামুঃ শোন্‌রে রামু, চললি কোথায় একা?
ন'মাস বাদে দেখা হলো, কেমন আছিস? ভালো?
আগে তো বেশ ফর্সা ছিলি, এখন কেন কালো?
বললে রামু, কেমন ক'রে রঙ হল শোন্ ময়লা
আগে বেচতাম ময়দা আমি, এখন বেচি কয়লা।

সেদিন ভোরে বললে ভোঁদা, বল্ তো ভেবেই হাঁদা
রাত্রে-ফোটা ফুলগুলো সব হয় কিভাবে সাদা?
বললে হাঁদাঃ হায়রে গাধা, এ তো সবাই জানে
অবাক হয়েই তাকিয়ে কেন থাকিস আমার পানে?
রাত্রে-ফোটা ফুলগুলো না ঘুমিয়ে জেগে থেকে
হয় সাদা রোজ সারা দেহেই জ্যোৎস্না মেখে-মেখে।

রথের মেলা

পথের মোড়ে রথের মেলা
বসলো-রে ভাই বিকেলবেলা,
হরেক রকম খেলনা খেলা
নয়কো কিছুই হেলাফেলা।।

মাটির পুতুল রাশিরাশি
কাঠের গাড়ি, পাতার বাঁশি,
দিলেন কিনে মেজো মাসি
খুকুর মুখে ফুটলো হাসি।।

মজার ম্যাজিক নাগরদোলা
ইস্ কী দারুণ, যায় না ভোলা,
বইখাতা আজ শিকেয় তোলা
হাঁক দিয়ে যায় ঘুগনিওলা।

ফুচকা-বাদাম-পাঁপড় ভাজা
আজকে খোকন সত্যি রাজা,
লেখাপড়ার নেইকো সাজা
জোরসে খুশীর বাজনা বাজা।।

রথ ছুটেছে দারুণ জোরে
বন্-বন্-বন্ চাকা ঘোরে,
পথের ধারে যাওনা স'রে
দাঁড়াও উঠেই বাড়ির দোরে।।

সময় এবার বাড়ি যাবার
সঙ্গে নিয়েই খাবার-দাবার,
ঘরে ফিরেই করবো সাবাড়
উল্টো রথে আসবো আবার।।

দীপ মুখোপাধ্যায়

পরচুলো

সেই লোকটা সত্যি ভীষণ ভুলো
ভিড় বাসে তার যায় চুরি পরচুলো

এই কারণে পুলিশ রাশি রাশি
করছে পাড়ায় চিরুনি তল্লাশী।

ঘামায় মাথা তুখোড় গোয়েন্দারা
এমন চুরি করতে পারে কারা?

সব মিলিয়ে নীল-নক্শা বানায়
বিশেষ প্রতিনিধি রাখেন থানায়।

নোংরা ফেলার ডাস্টবিনে যে তালা
অ্যারেস্ট হলেন শিশিবোতল ওয়ালা

খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ কোথায় সে পরচুলো
আকুল হলেন ব্যাকুল মানুষগুলো

ন্যাংলাপানা একটা ফুটের ছেলে
দৌড়ে এল সমস্ত কাজ ফেলে

পরচুলোটা এখন কাকের বাসা
কারণ হলেও বারণ যে তার হাসা।

এই ছড়াটার একটুখানি বাকি
কাক যে এখন কর্পোরেশন পাখি

সাত চুরি মাফ সবার মতামতে
পরচুলোটার কেল্লা হ'ল ফতে!

সুদেব বক্সী

যা ভূত

ফরসা কি নয় ভূত কখনও? ভূত কি শুধু কালো?
ভূত কি শুধু রাতেই বেরোয়, চায় না দিনের আলো?
ভূত কখনও হয় না খুশির? ভূত কি শুধু ভয়ের?
ভূত কি শুধুই ভীতুর? ভূত হয় না কি নির্ভয়ের?
ভূত কি শুধু দূরের, আপন হয় না এলে কাছে?
মধুর স্বরে কয় না কথা, ভূত কি শুধু হাঁচে?
ভূত কি শুধু ঘোরেফেরে বাড়ির কোণে কোণে?
মঞ্চে উঠে নাচ দেখাবার ইচ্ছে কী নেই মনে?
ভূতের সঙ্গে ভাব জমাতে কষ্ট কি খুব বেশি?
ভূত কি তবে ধার ধারে না খুচরো মেশামেশির?
ভূতকে ডাকি আপন ক'রে — আয় না আমার বাড়ি
সহজ হয়ে জল্‌দি পায়ে আয় না তাড়াতাড়ি।
অতিথিকে আপ্যায়নের রাখব না ভুল ত্রুটি
খেতে দেব কোফতা-কাবাব আর রুমালি রুটি
যা দরকার সবই দেব, বল কী কী তুই নিবি—
স্নো-পাউডার আর টুথপেস্ট, টু-ইন-ওয়ান, টিভি?

গদিমোড়া সোফা দেব বসবি তাতে এসে
বন্ধু হয়ে বলবি কথা সহজ হাসি হেসে
না যদি তুই আসিস তবে বুঝব যে তুই ভুয়ো—
আসবি না তুই, যা যা তবে, যা ভূত দুয়ো দুয়ো।

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

নেই আনন্দ

পুতুল-টুতুল নেই আমাদের, নেই পুতুলের বিয়ে,
বর আসে না ছাদনাতলায়, মাথায় টোপর দিয়ে!
কোথায় গেল কানামাছি, কোথায় রুমাল-চোর,
যুগটা কেমন বদলে গেছে, ভাল্ লাগে কি তোর?
লাট্টুলেত্তি হারিয়ে গেছে, ডাঙ্গুলি নেই, গুলি,
হাইরাইজের খুপরিবাসি, পড়তে বসে ঢুলি!
ব্যালকনিতে একলা-একা, দাঁড়িয়ে থাকি ঠায়।
রঙচঙে সেই ছেলেবেলা নেই আমাদের হায়!
কেমন যেন যন্ত্র হয়ে কীসের পিছু ছুটি,
চোখ টানে না শিশির-ঘাসে আলোর লুটোপুটি
স্টিকার কিনি, ক্যাটবেরিখোর এবং বাবলগাম
ড্রইং -সাঁতার, ক্রিকেট ক্লাব, ঝরতে থাকে ঘাম!
শুকনো মুখে নেই আনন্দ, দুঃখ শুধু পাই
পিঠে মস্ত বইয়ের বোঝা, ইস্কুলে রোজ যাই।

আমার আছে আকাশ

মাথার ওপর ধু-ধু আকাশ, আকাশ আমার আকাশ,
কি ভেবেছিস সবাই তোরা, চোখ দু'খানা পাকাস।
রঙচঙে নেই পোশাক-আশাক, মানায় ওসব আমায়?
ভীষণ জোরে ছুটতে পারি, কার ক্ষমতা থামায়।
ছুটবি কবে— আর কত কাল কাটিয়ে দিবি হামায়?

ভয় করি না যতই তোরা রক্তচোখে তাকাস্,
তোদের আছে মস্ত বাড়ি, আমার আছে আকাশ।

অমনভাবে তাকাস্ কেন — চোখের ভুরু বাঁকাস,
খিদের জ্বলায় জ্বলতে থাকি — দিস্ কখনো যা খাস্?
আকাশ আছে বাতাস আছে, বাতাস আমার বাতাস,
প্রাণে আনিস্ খুশির জোয়ার, এই আমাকে মাতাস্।
রোদের আমি পাই করুণা এবং বিষ্টিধারার,
আয় দেখে যা ছুটছি কেমন, নয় ছেলে যে হারার।

শমীন্দ্র ভৌমিক

ভুল

এই সারাদিন কোনটা ভালো
কোনটা খারাপ কোনটা আলো
প্রশ্ন করো নিজের কাছে প্রশ্ন করো একা
দেখবে তুমি তোমার কাছেই তোমার পাবে দেখা।
দেখবে তুমি কতটা ভুল
নিজের কাছে নিজে
একটা ভুলের জন্যে তোমার চোখ উঠেছে ভিজে
ভুলটা যদি বোঝাই যেতো! ভুল করে কেউ
ফূর্তি পেতো?
ভুলের আগেই তাইতো তাকে করতো সবাই সাবাড়
ভুলটা বড়োই বে-আক্কেলে, বিচ্ছিরি এক খাবার।
তাই বলি কেউ ভুল কোরো না, ভুলের জন্য ভুল কোরোনা
হঠাৎ যদি ভুল হয়ে যায় তখন যাবে দেখা।
দিন পেরিয়ে দিনের শেষে রাতের তারা উঠলে ভেসে
প্রশ্ন করো প্রশ্ন করো নিজের কাছে একা।

বললে না তো?

কোন্‌খানে বোম ফাটলো, তুমি
বললে না তো?
কেমন করে ফাটলো বোমা?
ফট্ ফট্ ফট্ ফটাশ করে—
বললে না তো?

তুমি মা বললে না তো?
বোমগুলো সব দেখতে কেমন? অ্যা — ত্তো বড়?
ঠিক আমাদের বলের মতো?
গড়িয়ে দিলে ছড়িয়ে যাবে—
জলের মতো?
উড়তে পারে?
ঘুর ঘুর ঘুর ঘুরতে পারে?
ইচ্ছে হলে গান-টানও কি জুড়তে পারে?
ঠিক আমাদের দলের মতো?
আমরা যেমন—
কালবৈশাখীর হাওয়ায় নেচে গাইতে থাকি;
ধিন তেরে কেট, তা তেরে কেট্...
ঝিলের বুকে নাইতে থাকি—
বললে না তো?
তুমি মা বললে না তো?
আমরা কি খুব বীর বাহাদুর? শক্তিশালী?
বলছিল আজ অর্চি, শ্রেয়া, বাবর আলি।
হাসি হাসি সবার হাসি—
মুচ্‌কি হাসি
বুচ্‌কিহাসি
টুস্‌কি হাসি
ফুস্‌কি হাসি
বোম ফাটিয়ে ঘুম ভুলেছে ভারতবাসী!
পাকিস্তান মা খুব কি দূরে?
বিরাটি, না হৃদয়পুরে?
তারাও নাকি বোম ফাটিয়ে—
চোখ পাকিয়ে, নাক বেঁকিয়ে
হুংকারিয়ে ভয় দেখিয়ে
বলছে, এবার এমন বোমা ফাটিয়ে দেবো—
পাহাড়-নদী-আকাশ-বাড়ি
সব কিছুকেই সাব্‌ড়ে দিয়ে
গ্রহান্তরে পাঠিয়ে দেবো!
তুমি মা বললে না তো?
আমার সঙ্গে দাদার যেমন
বাবার সঙ্গে কাকুর যেমন
তোমার সঙ্গে পিসির যেমন
লেগেই আছে ঝগড়াঝাঁটি—
খেলনা বাটি। খেলনা বাটি!

আমরা যেন সবাই মিলে
খেলছি এখন খেলনা বাটি।
তুমি মা বললে না তো?
খুব হয়েছে
ঘুম পেয়েছে
বেড়াল কি আজ
দুধ খেয়েছে?
আয় ঘুম ঘুম, আয় ঘুম ঘুম'
বাবর আলির চোখে
অর্চি, অবাক, শ্রেয়া এবং
এলো-মেলোর চোখে।
দেখতে দেখতে ফুল ফুটল, চাঁদ উঠল ভেসে
এ কলকাতার মেঘ উড়ে যায় সিন্ধুনদের দেশে।

নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
পঁচিশে বৈশাখে

একটা গাছে
রোজ সকালে ঠিক দু'খানা ফুল
একটা গাছে
রোজ সকালে হিসেবটা নির্ভুল।
ঠিক দু'খানা ফুল
জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণে আশ্বিনে
অঘ্রাণে আর কার্তিকে বা
ভাদ্রমাসের দিনে।
কিন্তু ধরো, হঠাৎ যদি
পঁচিশে বৈশাখে,
সেই সে গাছে ফুল দু'টো নয়,
তিনটে ফুটে থাকে?
সুদর্শনা, উর্বশী তার
ভাগ করছে ঠিক
একটা দু'টো তিনটে ফুলই
রবীন্দ্রনাথ নিক।

মন্দাক্রান্তা সেন

নকল সায়েব

শোনো শোনো সবাই একটা মজার কথা শোনো
ব্যাপারখানা রহস্যময় সন্দেহ নেই কোনো

বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সকল ছেলে-মেয়ে
হঠাৎ এমন খেপল কেন সায়েব হতে চেয়ে?

বাঙালি বাপ-মায়ের শিশু, যখন গেল স্কুলে
অন্য ভাষার চাপে নিজের ভাষাই গেল ভুলে!

ইংরিজি আর হিন্দি জানে, জানে না কেউ বাংলা
শিক্ষিত কি বলে এদের? এদের বলে হ্যাংলা।

অন্যলোকের নকল করে, নকল করেই ধন্য
আমাদের তো লজ্জা পাওয়া উচিত ওদের জন্য।

এই ভাষাতেই রবিঠাকুর লেখেন গীতাঞ্জলি
নোবেল পাওয়া সেই ভাষাতেই আমরা কথা বলি।

এমন বিরাট মর্যাদা আর ক'টা ভাষার আছে?
আমরা কেন বিকিয়ে যাব অন্য ভাষার কাছে?

তাইতো বলি, আপত্তি নেই অন্য ভাষা শিখতে
আপত্তি নেই হিন্দি বলায়, ইংরাজিতে লিখতে।

কিন্তু যারা নিজের ভাষা বাংলা গেছে ভুলে
তোমরা তাদের কানটি দিও আচ্ছা করে মুলে।

অংশুমান চক্রবর্তী

অমল

বন্ধু, তোমরা চিনতে পারছো?
আমি হলাম সেই অমল,
তোমারা আমায় সঙ্গে নেবে?
কোথায় যাচ্ছ ছেলের দল?

কিন্তু বাইরে যাওয়া বারণ
কবিরাজের এই হুকুম,
মালীর মেয়ে, সেই যে—সুধা
আমায় বলে, 'এখনো ঘুম?

ঘুরতে যাবে? ফুল কুড়োতে?'
সুধা আমার বন্ধু হয়,
ও আমাকে ভুলবে না
ওকে ভোলাও সহজ নয়।

ভোলা কঠিন—সত্যি কথা
কিন্তু আমার ভোলাই কাজ
কী কথা কাল বলেছিলুম
সে সব কথা ভুলছি আজ।

ভুলে যাচ্ছি প্রহরীকে
পিশেমশাই, ফকির, আর—
ভুলে যাচ্ছি মোড়লকেও
কোথায় বাড়ি দইওলার।

ভুলতে ভুলতে আকাশ-পাড়ায়
যখন ঘুরি ঠিক তখন
হারানো সব মুখগুলোকে
খুঁজে নিচ্ছে আমার মন।

বন্ধু, আমায় পড়ছে মনে?
বছর আসে, বছর যায়
আজও আমি একলা বসে
রাজার চিঠির অপেক্ষায়...

অনিল সরকার

নাতিন মনু পুতিন মনু

নাতিন মনু পুতিন মনু
মধ্যিখানে ঘর
সেই ঘরেতে বসত করেন

দাদন রাজার চর।

এক পয়সায় নুন নিলাম
তিন পয়সার ধান
কেমন পশু মহাজন রে
রক্ত করে পান।

জমিন খায় জিরেত খায়
মনুষ্যি নয় বাঘ
ঘুমোস নে বোন ঘুমোস নে ভাই
অতন্দ্র রাত জাগ।

নাতিন মনু পুতিন মনু
মধ্যিখানে কে?
সোদর ভাই জন্ম নিল
ব্যাঘ্র মারিতে।

অপরাজিতা রায়

প্রাণটা চায়

(সুকুমার রায়কে নিবেদিত)

চাঁদিম হিম
কী নিঃসীম
নীল আকাশের বুক ভরা,
নিবিয়ে বাতি
তাকিয়ে থাকি
যদ্দুর যায় চোখ জোড়া।
ছোট্ট বেলার
সঙ্গী খেলার
তোমার লেখা সব ছড়া,
হাসির মেঘে
মুখটি ঢেকে
পালিয়ে যেত দুঃখরা।

আজকে যখন
ক্ষুব্ধ এমন
কষ্টে ভীষণ কান্না পায়,
তোমার ছড়ার
স্রোতের ধারায়
হালকা হতে প্রাণটা চায়।

সুব্রত দেব
ভুলে-ভুলে

এক-যে ছিল ভুলোমানুষ
ভীষণ রকম ভুলো
চানের সময় সাবান ভেবে
মাখত গায়ে ধুলো!
পড়ার সময় একটি লাফে
হাজির হত মাঠে
খেলার সময় জবুথবু
থাকত শুয়ে খাটে!
খিদে পেলে গায়ের জোরে
নাচের সাথে গান
ঘুমের বেলা দুইটি হাতে
মলত নিজের কান!
মাঝে মাঝে নামটি নিজের
তা-ও সে যেত ভুলে
হাসি পেলে থাকত নিজে
নিমগাছেতে ঝুলে।
পানসুপারী কিনতে দিলে
আনত কিনে সাবু
ভুলে-ভুলে মা মণিকে
ডেকে বসত বাবু!

চুনী দাশ

মুঠো ভরা হাতি

কে রে যাস্, — কেনারাম?
বলি শোন্ ভাইরে —
মুঠো ভরা হাতি ছিল
খুলে দেখি নাই রে!

দাঁড়া, দাঁড়া, বাস আছে
ঘড়ির এই পকেটে!
চাঁদে যাবি; —ভরা আছে
বাঁ-পকেট রকেটে!

এ পকেটে সিংহরা
ছুটোছুটি করছে
সে পকেটে হনুমান
রেলগাড়ি চড়ছে!

আরে, আরে, কী করিস্?
আশি হাত দূর থাক!
চোরা-জেবে তিমিমাছ
করে আছে মুখ ফাঁক!

ভয় পেলি? খু-ব জোর?
তবে শোন্ বলছিঃ
বহুরূপী অ্যাকটিং
করে করে চলছি!
সিনেমায় নামব তো?
তাই এত ঝক্‌কি!
রাগ করে যাস্‌নে রে
কেনারাম লক্ষ্মী!!

শুভাশিস তলাপাত্র
একুশ শতক

সকালবেলায় ঢুলুস চোখে ধরতে হবে বাস
ড্রয়িং স্যারের খোলা খাতায় আমার নীল আকাশ।

একলা আমি একলা দুপুর একলা বিকেলবেলা
মাঠের খেলা টিভির ভিতর আমার ছেলেবেলা।

বোতাম টিপে এক ঝিলিকে ড্রাগন মারি সপাং
আগুনরাঙা আকাশ কোথায়—কালো গহীন গাং।

সপ্তডিঙা মধুপর্ণী — অচিন চাঁদ বণিক
বুক ভেসে যায় দুঃখে আমার ডুবলে টাইটানিক।

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে বাঁকা
একুশ শতক স্বপ্ন কোথায় মাথার ভিতর ফাঁকা।

অনিল কুমার নাথ
নয়নজুলির জন্যে

নয়নজুলি রাগ কোরো না
তোমার বাড়ি যাব।
আম আনারস কাঁঠাল লিচু
পেটটি পুরে খাব।

ছড়ার ধারে তোমার বাড়ি
পাহাড় ধোঁয়া কালো।
গাছমাথাতে জুম টং-ঘর
মনে রঙ ছড়ালো।

এগাছ ওগাছ সেগাছ করে
ছুটব পই পই।
হারিয়ে যাবে অঙ্ক ভূগোল
ইতিহাসের বই।

বানরগুলো মুখ ভেঙাবে
চুলকোবে পিঠ বুক।
কোথায় পাব এসব ছবি
আহা, কী যে সুখ!

বনবেড়াল আর খরগোসেরা
খেলবে লুকোচুরি।
বাবলা গাছে শালিখ চড়ুই
সে কী হুড়োহুড়ি!

সকাল দুপুর গড়িয়ে যাবে
কুয়োর জলে চান।
নরম নরম গরম ভাতে
গোদকের আঘ্রাণ।

মাসির চোখে অমল হাসি
মুক্তো খসে পড়ে।
ভুলবোনা তা ভুলবোনা তা
হাজার বছর পরে।

বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী

মেঘের সঙ্গে

মেঘটা এসে পাহাড় বানায় আকাশের ওই উচ্চে
পেছনে কে? মস্ত হাতি, একটা ইঁদুর পুচ্ছে
তার সে নিচে জল ভরা মেঘ দৌড়ে কাকে খুঁজছে?
ঝম্ ঝমিয়ে বৃষ্টি এসে মাঠটা কেবল ধুচ্ছে।

এসব ছবি বিকেল বেলার এসব ছবি ভোরের
মেঘরা সব ছাড়া পেয়ে নাড়লো কড়া দোরের
জেগে ওঠে বলছি কেরে, বাতাস পায়ের নূপুর
উত্তরে মেঘ বললো আমি মিষ্টি টাপুর টুপুর।

মিষ্টি সোনা লক্ষ্মীটি বোন কোথায় রে তোর বাড়ি
তুই কী শুধু বেড়াস ঘুরে চড়ে মেঘের গাড়ি?
বর্ষাকালে জাঁকিয়ে বসে শীতকালে যাস্ কই
নামতা পড়িস? অ. আ. ক. খ? ছড়া ছবির বই?

যেই না বলা অমনি আকাশ ভেঙে গুড়ু গুড়ু
যোগ বিয়োগের মাঝেই যেন গুণের নামতা শুরু
টাপুর টুপুর টাপুর টুপুর টাপুর টুপুর টুপ্
টাপুর টুপুর টাপুর টুপুর টাপুর টুপুর টুপ্।

রোবট

মা বললেন - না
নোট যা পাবি কাউকে দিবি না
স্যারও বলেন তাই
যা দিয়েছি লুকিয়ে রাখিস্ তাই
বাবাও বলেন অনেক হাবিজাবি
সবার সাথে মিশলে কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবি।

আমার সকাল এমনি করেই ঝাপসা হয়ে যায়
স্বার্থপর এক দৈত্যি এসে ঢুকলো আমার গা-য়।
মাঠ চিনি না হাট চিনি না আমতলা জামতলা
ট্যাংরা পুঁটি মাছ চিনি না শ্মশান কবরখলা
ধান চিনি না গম চিনি না সর্ষে পালং শাক
মা বললেন, 'ফেলনা এসব পড়ায় ডুবে থাক'।

আমার সকাল এমনি করেই ঝাপসা হয়ে যায়
স্বার্থপর এক দৈত্যি এসে ঢুকলো আমার গা-য়।
এমনি করেই যাচ্ছিল দিন এমনি করেই রাত
লেখায় পড়ায় বীর বাহাদুর করছি বাজিমাৎ
বাবা বলেন — সাবাশ ব্যাটা মা বললেন বেশ
তোর গর্বে হাসবো মোরা নাচবে সারা দেশ।

যোগ বিয়োগের অঙ্ক কষে ভাঙতে ভাঙতে সিঁড়ি
আমার ভেতর আমি কেমন হলাম রে বিচ্ছিরি।
খাচ্ছে মনন খাচ্ছে মেধা খাচ্ছে সবুজ মন
দত্যি আমার হাড় চিবিয়ে খাচ্ছে সারাক্ষণ।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে আয়নাতে ওই পাশে
দাঁড়িয়ে গেলাম শ্রীমান আমি একুশের বেশবাসে
আমায় দেখে হঠাৎ আমি ভিড়মি খেয়ে যাই
একটা রোবট স্থির দাঁড়িয়ে, আমার মতো, তাই।

জসীমউদ্দিন
ছড়া

কাতুর কুতুর ময়না,
কাল দেব তোর গয়না।
কাঁসার নূপুর দুই পায়ে,
নেচে বেড়াস সব গাঁয়ে
ঝুমকো কানে ঝুলবে
নাকে নোলক দুলবে।
সবই দেব কাল তোরে
আজকে কাছে আয় ওরে।
তাগ ধিনা ধিন ধিন তাগ ধিনা
সুরে সামাল পাচ্ছি না
একটুখানি গেয়ে গান
জুড়িয়ে যারে আমার প্রাণ।

রূপাই

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে, লম্বা মাথার চুল
কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কিসের রঙীন ফুল।
কাঁচা-ধানের পাতার মত কচি মুখের মায়া,
তা'র সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া!
জালি-লাউয়ের ডগার মত বাহু দু'খান সরু;
গা'খানি তা'র শাঙন মাসের যেমন তমাল তরু!
বাদল-ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজ্‌লী মেয়ে লাজে লুকায় ভুলিয়ে আলোর খেল্!
কচি ধানের তুল্‌তে চারা হয়ত কোন চাষী
মুখে তাহার ছড়িয়ে গেছে কতকটা তা'র হাসি।

কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি
কালো দ'তের কালি দিয়েই কেতাব কোরান লেখি।
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়;
চাষীদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়।
সোনায় যে-জন সোনা বানায় কিসের গরব তা'র,—
রঙ পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার।
কালোয় যে-জন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন,
তারি পদ-রজের লাগি, লুটায় বৃন্দাবন।
সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ,
কালো বরণ চাষীর ছেলে জুড়ায় যেন বুক।
যে-কালো তা'র মাঠেরি ধান, যে-কালো তাঁর গাঁও,
সেই কালোতে সিনান করি উজল তাহার গাও।

আখ্‌ড়াতে তা'র বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী
খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানাটানি।
'জারী'র গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
'শাল-সুন্দী' বেত যেন ও, সকল কাজেই লাগে।
বুড়োরা কয় — "ছেলে নয়, ও 'পাগাল' লোহা যেন।
রূপাই যেমন বাপের বেটা কেউ দেখেছ হেন?
যদিও রূপা নয়কো রূপাই, — রূপার চেয়ে দামী,
এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামী।"

শামসুর রাহমান
কবি

সেই ছেলেটা জানালা থেকে দেখত চেয়ে
পুকুরঘাটে বটের ঝুরি।
দেখত চেয়ে জলের ঘড়া, চিলের ওড়া—
কখনো ফের ইলশেগুঁড়ি।

সবাই যখন থাকত শুয়ে রাত দুপুরে
জড়িয়ে গায়ে ঘুমের কাঁথা,
সেই ছেলেটা একলা বসে শুনত শুধু
আঁধার ঘরে তারার গাথা।

সেই ছেলেটা রাতের শেষে দেখত শাদা
রাস্তা যেন চুলের ফিতা।
পুব আকাশে সূর্য এলে বলত হেসে,
"এইতো এল আমার মিতা।"
আর সকলে পড়ার ঘরে দুলত যখন
ধারাপাতের সুরে সুরে,
শুনত সে-যে ছুটির রাখাল কোথায় যেন
বাজায় বাঁশি বহু দূরে!
শুনত আরো নানান ধ্বনি, অচিন ঘাটে
শুনত খেয়া-মাঝির গলা।
লেপের গুহায় শুনত একা স্বপ্ন-নদীর
নিঝুম বুকে না'য়ের চলা।

পেন্সিলেরই রেখার মতো বৃষ্টি এলে
ঝমঝমিয়ে কালো ঘরে,
শুনত সে তো সারাবেলা মনের ঘাটে
জল পড়ে আর পাতা নড়ে।
মেঘ-মেঘালি, পাখ-পাখালি বলত তাকে,
বর্ষা তাকে বলত "রবি,
ঠাকুরবাড়ির ছেলে তোমায় বলুক লোকে
সবার তুমি আপন কবি।"

ফয়েজ আহ্‌মেদ
বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি

বৃষ্টি এলে ঘন্টা পড়ে ইস্‌কুলে
বৃষ্টি এলে দিস্ রে ছাতা দিস্ তুলে।
বৃষ্টি এলে বন্ধ থাকে বই পড়া
বৃষ্টি এলে পুকুর পাড়ে কই ধরা।
বৃষ্টি এলে ইলিশেগুঁড়ি বৃষ্টিতে
বৃষ্টি এলে ঝাপ্‌সা যে সব দৃষ্টিতে।
বৃষ্টি এলে সব জেলেরা কাশ চরে
বৃষ্টি এলে যাত্রী ভিজে বাস ধরে।
বৃষ্টি এলে নৌকোতে পার রাজপথে
বৃষ্টি এলে কৃষক বিদায় কাজ হতে।
বৃষ্টি এলে কিশোর নাচে উল্লাসে
বৃষ্টি এলে পুকুর-দীঘির কূল ভাসে।
বৃষ্টি এলে সব শিশুরা অন্তরে
বৃষ্টি এলে স্বপ্নে যেন সন্তরে।
বৃষ্টি এলে পথের শূন্য প্রান্ত যে
বৃষ্টি এলে বিশ্বটা হয় শান্ত যে।

আল মাহমুদ
পাখির মতো

আম্মা বলেন, পড়রে সোনা
আব্বা বলেন, মন দে;
পাঠে আমার মন বসে না
কাঁঠাল চাঁপার গন্ধে।

আমার কেবল ইচ্ছে জাগে
নদীর কাছে থাকতে,
বকুল ডালে লুকিয়ে থেকে
পাখির মতো ডাকতে।

সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে
কর্ণফুলির কূলটায়।
দুধ ভরা ঐ চাঁদের বাটি
ফেরেস্তারা উল্টায়।

তখন কেবল ভাবতে থাকি
কেমন করে উড়বো,
কেমন করে শহর ছেড়ে
সবুজ গাঁয়ে ঘুরবো!
তোমারা যখন শিখছো পড়া
মানুষ হওয়ার জন্য,
আমি না হয় পাখিই হবো,
পাখির মতো বন্য।

পাখির কাছে ফুলের কাছে

নারকেলের ঐ লম্বা মাথায় হঠাৎ দেখি কাল
ডাবের মতো চাঁদ উঠেছে ঠান্ডা ও গোলগাল।
ছিটকিনিটা আস্তে খুলে পেরিয়ে গেলাম ঘর
ঝিমধরা এই মস্ত শহর কাঁপছিলো থরথর।
মিনারটাকে দেখছি যেন দাঁড়িয়ে আছেন কেউ,
পাথরঘাটার গীর্জেটা কি লাল পাথরের ঢেউ?
দরগাতলা পার হয়ে যেই মোড় ফিরেছি বাঁয়
কোত্থেকে এক উটকো পাহাড় ডাক দিলো, আয় আয়।
পাহাড়টাকে হাত বুলিয়ে লাল দিঘিটার পার
এগিয়ে দেখি জোনাকিদের বসেছে দরবার।

আমায় দেখে কলকলিয়ে দিঘির কালো জল
বললো, এসো, আমরা সবাই না ঘুমানোর দল —
পকেট থেকে খোলো তোমার পদ্য লেখার ভাঁজ
রক্তজবার ঝোপের কাছে কাব্য হবে আজ।

দিঘির কথায় উঠলো হেসে ফুল পাখিরা সব
কাব্য হবে, কাব্য হবে — জুড়লো কলরব।
কি আর করি পকেট থেকে খুলে ছড়ার বই
পাখির কাছে, ফুলের কাছে মনের কথা কই।

নির্মলেন্দু গুণ
বৃষ্টি

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা
বাতাস জুড়ে বিষ্টি,
গাছের পাতা কাঁপছে আহা
দেখতে কি যে মিষ্টি।
কলাপাতায় বিষ্টি বাজে
ঝুমুর নাচে নর্তকী,
বিষ্টি ছাড়া গাছের পাতা
এমন তালে নড়ত কি?
চিলেকোঠায় ভেজা শালিখ
আপনমনে সাজ করে,
চঞ্চু দিয়ে গায়ের ভেজা
পালকগুলি ভাঁজ করে।
হাঁসেরা সব সদলবলে
উদাস করা দিষ্টিতে
উঠানটাকে পুকুর ভেবে
সাঁতার কাটে বিষ্টিতে।
আকাশ এতো কাঁদছে কেন
কেউ কি তাকে গাল দিলো?
ছিঁচকাঁদুনে মেঘের সাথে
গাছগুলি কি তাল দিলো?
সকাল গেল দুপুর গেল—
বিকেল হয়ে এল কী?
আচ্ছা মাগো তুমিই বলো
মেঘেরা আজ পেলো কী?

তুমি তোমার সখের শাড়ি
সাজিয়ে রাখো আনলাতে,
আমি কেবল দু'চোখ মেলে
তাকিয়ে থাকি জানলাতে।
আকাশ দেখি বিষ্টি দেখি
দেখি আমার চোখের জল
নিচে দূরের আকাশ পথে
যাচ্ছে ভেসে মেঘের দল।

সুকুমার বড়ুয়া
ছবির ছড়া

মাছের ছবি ধরতে গেলে
পালিয়ে কেন যায় না?
গরুর ছবি দাঁড়িয়ে থাকে
ঘাস কেন সে খায় না?
নদীর ছবি দেয় না কেন
ভিজিয়ে সকল পৃষ্ঠা?
পোকার ছবি বই কাটে না
কেমন তাদের নিষ্ঠা?
দাউ দাউ দাউ আগুন জ্বলে
কাগজ কেন পোড়ে না?
ছবির মাছি মারতে গেলে
ভয়ে কেন ওড়ে না!
সাপের পাশে ব্যাঙের ছবি
দেখায় কত ফুর্তি
কয় না কিছু — বাঘের কেন
এমন ভয়াল মূর্তি!

যন্ত্রগুলো চলছে তবু
হয় না কেন শব্দ,
উড়ন্ত সেই পক্ষীগুলো

কেমনে হলো জব্দ?
পড়ার ঘরে দাদার ছবি
শাসন যদি করতো,
সবাই মাথা নিচু করে
শান্তভাবে পড়তো।

এক পলকে এই পৃথিবী
দেখতে হলে পষ্ট,
মানচিত্র খুলে নিলে
হয় না তো আর কষ্ট।

এখ্‌লাশউদ্দিন আহ্‌মদ
তুন্‌তু বুড়ির ছড়া

এক পা যেতে
তিন পা টলে
দুই পা যেতে
ঝুঁপ!
তিন পা যেতে
এক পা টলে
পাঁচ পা যেতেই
চুপ!
ছয় পা যেতে
আর টলে না
কেবল হাঁটা
হাঁটি।
তেলের শিশি
উলটে ফেলে
ঘর সংসার
মাটি।
হাঁটি হাঁটি পা পা
যেখান খুশি সেখান যা।

আসাদ চৌধুরী
তিন তিনটে হুলো বেড়াল

তিন তিনটে হুলো বেড়াল
তিন তিনটে হুলো
ব্যায়াম করার নামে তারা
গায়ে মাখে ধুলো।

তিন তিনটে হুলো বেড়াল
তিন তিনটে হুলো
খিস্তি শুনে কানে গোঁজে
বস্তা তিনেক তুলো
সস্তা দরে কেনা বলেই
পিঠে চাপায় কুলো।

তিন তিনটে হুলো বেড়াল
তিন তিনটে হুলো
কাহিল হয়ে অবশেষে
ধুলোর প'রে শুলো।

সুজন বড়ুয়া
মহাশূন্যের ভূত

নীল আকাশে ফুটল সে এক
ধূসর কালো মুখ,
হঠাৎ করে হাজির হল
এ কোন আগন্তুক।

দুই পা বাড়ায় একটু দাঁড়ায়
কাঁপায় আকাশ-পাড়,
তিমিই বুঝি নীল সাগরে
দিচ্ছে ডুব-সাঁতার।

দেখছি আবার পালক যেন
ছড়ানো এক রাশ,
তবে কি পথ ভুলে এল
কোনো আলবাট্রাস।

কিন্তু এ কার পুচ্ছ আবার
তুলছে এমন ঢেউ,
বাতাসে চুল শুকোয় বুঝি
অশীতিপর কেউ!

চুল গেল কই? চুল নয় তো,
কেউ জ্বেলেছে ধূপ?
আকাশে আজ কে এল যার
হরেক রকম রূপ।

এ কোনো রেলগাড়ি নাকি
আজব কোনো সেতু?
ভাবছি যখন, মা বলে তার
নাম নাকি 'ধূমকেতু'।

ধূমকেতু কী? ধূমকেতু এই?
মন করে খুঁতখুঁত,
ধুত্তুরি না, ধূমকেতু নয়,
মহাশূন্যের ভূত।

পড়তে পড়তে

পড়তে পড়তে সকাল, আবার পড়তে পড়তে রাত,
'গীতাঞ্জলি' শিথান দিয়ে মাথায় রাখি হাত,
''সোনার তরী' ভাসিয়ে যখন হারিয়ে ফেলি কূল
''বিষের বাঁশী' 'অগ্নিবীণা' ফোটায় সুরের ফুল,
সুরের জালে জড়িয়ে গেলাম দূরের ঠিকানায়
ছায়ায় ঢাকা মায়াবী গাঁও ডাক দিলো আয় আয়,

"মাটির কান্না' শুনতে গিয়ে 'নক্সি কাঁথার মাঠ' —
পেরিয়ে দেখি 'হলদে পরীর দেশে' চাঁদের হাট,
চাঁদের হাটে 'ঝরা পালক' গায় শিশিরের গান
'সাতটি তারার তিমির' থেকে ভাসায় আলোর বান।

পড়তে পড়তে বিশ্বকবি হই আমি বার বার
কখনো বিদ্রোহী হয়ে সব করি তোলপাড়
কখনো রঙ শব্দে আঁকি নির্জনে নিশ্চুপ —
রোদ কুয়াশায় মুখ ঢাকা এই বাংলাদেশের রূপ,
বাংলাদেশের বাতাস মাটির গন্ধ অনাবিল —
পান করে হই পল্লী কবি, মাঠ পার ঝিলমিল।

কিন্তু পড়া শেষে যখন বই গুটিয়ে থামি
তখন দেখি আর কেউ নই, আমি তো সেই আমি।

ফারুক নওয়াজ

চৌকিদারের বউ

চৌগাছিয়ার চৌকিদারের
চৌকি আছে দুটো;
একখানা অর পায়া ভাঙা
আরেকখানা ফুটো।
ভাঙা-ফুটো চৌকিদুটো
আর আছে এক ক্যাসেট—
চৌকিদারের এ্যাসেট।

চৌকিদারের বউ কীসে কম!
তার আছে খুব বড়াই—
পেঁচিয়ে কাপড় চেঁচিয়ে বলে
'আমরা কাকে ডরাই!
চৌকি বেচে চরের হাটে

কিনবো ঢাকাই শাড়ি;
ক্যাসেট বেচে বাড়ি।
রঙিন রঙিন বাত্তি জ্বেলে
ঘর করবো আলো।'
পড়শিরা সব হেসেই বলে—
'তা ভালো, তা ভালো।'

রহীম শাহ
প্রমার ছবি আঁকা

প্রমার হাতে রঙের তুলি
আঁকবে বসে ফুল
ওমা দ্যাখো, ওমা দ্যাখো
কাণ্ড হুলুস্থূল।

ফুল আঁকতে পাখি আঁকে
পাখি আঁকতে গাছ
ওই যে দ্যাখো, গাছের তলে
হাজার ছায়ার নাচ।

ঢেউ গড়ানো নদী আঁকে
আঁকে বাউল কবি
ওমা দ্যাখো, ওমা দ্যাখো
বাংলাদেশের ছবি।

লুৎফর রহমান রিটন
মেঘে মেঘে রবীন্দ্রনাথ

টুকরো টুকরো মেঘের ভেলা
নীল আকাশে করছে খেলা।
মেঘের ভেলা যাচ্ছে ভেসে
দোল দিয়ে যায় বাতাস এসে।

মেঘের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে
হঠাৎ অন্য রূপ সে ধরে—
বিশাল পাহাড় পড়ল নুয়ে,
রবীন্দ্রনাথ আছেন শুয়ে!

আবার এল তুমুল হাওয়া
মেঘগুলোকে করল ধাওয়া।
মেঘের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে
আবার অন্য রূপ সে ধরে —
কী ভয়ানক দৈত্য নাচেন,
রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন!

ছুটল বাতাস উল্টোদিকে
শুভ্র আকাশ হঠাৎ ফিকে।
মঘের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে
অবার নতুন রূপ সে ধরে—
অবাক কাণ্ড! বাড়িয়ে দুহাত
বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ!

আহমেদ সাব্বির
দস্যি ছেলের ছড়া

ভাল্লাগেনা বন্দী জীবন
মন বসেনা পড়ায়
দস্যিপনা করেই আমার
সকাল বিকাল গড়ায়।

ভোর না হতে ফুল কুড়াতে
বকুল তলায় ছুটি
নগ্নপায়ে শুভ্র শিশির
খায় যে লুটোপুটি।

ঝলমলে রোদ উঠলে মনে
দুষ্টুমি দেয় হানা
বাবলা বনে দাবড়ে বেড়াই
গাঙশালিকের ছানা।

পিঁপড়ের ডিম ভাঙতে গিয়ে
মগডালেতে চড়ি
দুপুর বেলা পুকুরঘাটে
ছিপ দিয়ে মাছ ধরি।

বিকেল বেলা দুরন্ত মন
হারায় সবুজ মাঠে
আমার ঘুড়ি নীল আকাশে
চৈতি সাঁতার কাটে।

সন্ধ্যা হলেই পড়তে বসি
নইলে যে নেই ক্ষমা
ঠিক তখনই রাজ্যের ঘুম
দু'চোখে হয় জমা।

ঢুলুঢুলু চোখে কি আর
যায় কখনো পড়া?
অঙ্ক খাতায় তাইতো লিখি
দস্যি ছেলের ছড়া।

আহ্সান হাবীব
কাজ

মনা রে মনা কোথায় যাস্?
বিলের ধারে কাটবো ঘাস।
ঘাস কী হবে?
বেচবো কাল
চিকন সুতোর কিনবো জাল।
জাল কী হবে?
নদীর বাঁকে
মাছ ধরবো ঝাঁকে ঝাঁকে।
মাছ কী হবে?
বেচবো হাটে
কিনবো শাড়ী পাটেপাটে
বোনকে দেবো পাটের শাড়ী
মাকে দেবো রঙীন হাঁড়ি।

নাসরীন নঈম
ইচ্ছে

ভাল্লাগে না পড়তে আমার
ভাল্লাগে না লিখতে
ইচ্ছে করে মনের মতো
ছবি আঁকা শিখতে।

যেই ছবিটা একাত্তরে
মা খালারা আঁকতো
রঙের সাথে রঙ মিলিয়ে
ভালোবাসায় থাকতো।

সেই ছবিটা আঁকবো আমি
যেদিন বাবা আসবে;
যুদ্ধ ফেরৎ ভাইকে দেখে
মামনিটা হাসবে।

শাহাবুদ্দীন নাগরী
বহুরূপীর ছড়া

রাতে সাজেন চুনোপুঁটি
দিনে সাজেন কাত্‌লা,
দিনের বেলা মেদ জমে তার
রাতের বেলা পাতলা।

দিনের বেলা বক্তৃতা দেন
মাইকে গলা তপ্ত,
রাতের মেনি- বেড়াল হবার
ব্যাপারটা তার রপ্ত।

এদের চেনা দায়—
গাছের থেকেও পাড়ে এরা
তলার থেকেও খায়।

এম. আর. মনজু
কবি নজরুল

ডানপিটে দুখু মিয়া
সারা দিনমান
মুখে মুখে বলে যেতো
কবিতা ও গান।

লেলিহান শিখা ছিলো
লেখনীতে তাঁর
বুকভরা ভালোবাসা
জুড়ি মেলা ভার।
ফুটে আছে দেশময়
যেনো এক ফুল
তিনি আর কেউ নন
কবি নজরুল।

আনওয়ারুল কবীর বুলু
মায়ের চোখে

ভাইয়া বলে স্বাধীনতা
স্বাধীনতা ঠিক,
বুকের মাঝে দুঃখ তবু
হাঁটছে চতুর্দিক।

বুবু বলে স্বাধীনতা
স্বাধীনতা আছে,
স্বাধীনতা পাখি হয়ে
পুচ্ছ তুলে নাচে।

আম্মু বলে স্বাধীনতা
স্বাধীনতা এই—
ঘুম আসে না মায়ের চোখে
খোকন যে তার নেই।

মানসুর মুজাম্মিল
খাঁটি মানুষ

তারাই দেশের খাঁটি মানুষ
তারাই হলো ধন্য
যারা বুকের রক্ত দিলো
স্বাধীনতার জন্য।

স্বাধীন দেশের সুদিন ছাড়া
কিছুই যারা চায় না
তারাই দেশের খাঁটি গোলাপ
তারাই দেশের আয়না।

ফারুক হোসেন
লেজুড়

কেউ নিয়েছে পিছনে লেজ
কেউ হয়েছে লেজুড়,
লেজ দেখে যায় স্বভাব চেনা
যায় চেনা গোঁফ খেজুর

সিংহ বাঘের ডানপিটে লেজ
পাক দিয়ে পা বাড়ায়,
সব গরুরই লেজ জরুরী
মাকড়-মাছি তাড়ায়।

অলস গোছের লেজ রয়েছে
গাধা এবং হাতির,
নাচতে পটু লেজ ময়ূরের
মেঘের সঙ্গে খাতির।

লেজ হয়ে যায় ঐতিহাসিক
যোদ্ধা হনুমানের,
রাম রাবনের যুদ্ধে যে তার
ভয় ছিলো না প্রাণের।

আঠারশ' সাতান্নতে
লেজ হলো মীর জাফর,
তাই পলাশীর আমবাগানে
নামলো মহাফাঁপর।

কাজ ফুরালেই লেজ থাকে না
ফুরায় সকল ফিকির,
জিকির তালে লেজ খসে যায়
যেমনটি টিকটিকির।